NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EEC

PAPER 4

MODULES XIII - XVI

ELECTIVE ECONOMICS

HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ অর্থনীতি

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ **EEC : 04 : 13–16**

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 13	অধ্যাপক অম্বরনাথ ঘোষ	অধ্যাপক গৌতম কুমার সরকার
পর্যায় 14	ড. মণিকা নাগ	অধ্যাপক কানন কুমার মজুমদার
পর্যায় 15	অধ্যাপিকা শেফালী কর	অধ্যাপিকা বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জী
পর্যায় 16	অধ্যাপক তন্ময় ব্যানার্জী (চ্যাটার্জী)	অধ্যাপক বিকাশ সান্যাল

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EEC – 04

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
13

একক 49 □ জাতীয় আয় ও ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো 1–12

একক 50 □ ভারতের কৃষি 13–29

একক 51 □ ভারতের শিল্পোন্নয়ন 30–39

একক 52 □ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 40–49

পর্যায়
14

একক 53 □ পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি 50–67

একক 54 □ পরিকল্পনার মডেল বা নকশা ঃ দ্বিতীয়, চতুর্থ পঞ্চম এবং অষ্টম পরিকল্পনা 68–75

একক 55 □ দারিদ্র্য ও বেকারি 76–88

একক 56 □ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ ভারতীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গে উন্নয়ন ও জনসংখ্যা ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ 89–98

পর্যায়
15

একক 57 □ ভারতীয় কৃষির বিভিন্ন দিক ও সরকারি নীতি 99–124

একক 58 □ ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও গৃহীত ব্যবস্থা 125–155

একক 59 □ কর ব্যবস্থা, সরকারি ব্যয়, সরকারি ঋণ ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক — গৃহীত ব্যবস্থা 156–174

একক 60 □ ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ও অর্থসম্বন্ধীয় নীতি 175–185

একক 61 □ ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও তার সংস্কার 186–204

পর্যায়
16

একক 62 □ ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান সমস্যাবলী — স্থিতিশীলতা 205–219

একক 63 □ কাঠামোগত পরিবর্তন 220–253

একক 64 □ বেসরকারিকরণ 254–265

একক 65 □ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কার 266–275

একক ৪৯ □ জাতীয় আয় ও ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো

গঠন

৪৯.০ উদ্দেশ্য

৪৯.১ প্রস্তাবনা

৪৯.২ বিশ্বে ভারতের আপেক্ষিক অবস্থান

৪৯.৩ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি

৪৯.৪ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ও দারিদ্র্য

৪৯.৫ ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

৪৯.৬ জাতীয় উৎপাদনে বিভিন্ন বর্গের গুরুত্ব

৪৯.৭ সারাংশ

৪৯.৮ অনুশীলনী

৪৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি থেকে জানা যাবে :

- অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বে ভারতের অবস্থান কোথায়?
- প্রকৃত জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় কী হারে বেড়েছে?

- প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়ার সাথে সাথে দেশে দারিদ্র্য কীভাবে হ্রাস পেয়েছে?
- জাতীয় উৎপাদনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অনুপাত কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- জাতীয় উৎপাদনে প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

৪৯.১ প্রস্তাবনা

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই অনুন্নত ছিল। জাতীয় উৎপাদনের এক বিরাট অংশের উৎস ছিল কৃষি। স্বাধীনতার ঠিক আগের পঞ্চাশ বছর সময়কালে ভারতে মাথাপিছু কৃষির উৎপাদন তো বাড়েই নি বরং কমে যায়। ভারতের শিল্প ক্ষেত্রও ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং অনগ্রসর। মূলত কয়েকটি কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়েই গঠিত ছিল দেশের শিল্পক্ষেত্র। স্বাধীনতার আগের পঞ্চাশ বছরে শিল্পের উৎপাদনও প্রায় স্থির ছিল বললেই চলে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু হয় স্বাধীনতার পর। ১৯৫০ সাল থেকে পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগ শুরু হয়, ঐ বছরই গ্রহণ করা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এই স্বাধীনতা-উত্তর পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগে অর্থনৈতিক প্রগতি কী হারে হল? এই উন্নতি সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে এল? কীভাবেই বা পরিবর্তিত হল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো? এ সবেরই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই এককে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪৯.২ বিশ্বে ভারতের আপেক্ষিক অবস্থান

পৃথিবীর দেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত রাষ্ট্র। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি. ল্যাটিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের অন্তর্গত। আফ্রিকার অন্যান্য দেশ, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহকে পৃথিবীর দরিদ্র দেশ হিসাবে বর্ণনা করা চলে। ১৯৯২ সালে মার্কিন ডলারের অঙ্কে মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP per capita) ছিল ভারতের ৩১০ আর সুইজারল্যান্ডের ৩৬,০৮০। সারণি ১.১ থেকে বিশ্বে ভারতের আপেক্ষিক অবস্থানের কিছুটা ধারণা করা যাবে।

সারণী—১.১

মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন, ১৯৯২

(একক : মার্কিন ডলার)

উচ্চবিত্ত দেশ	মাথাপিছু উৎপাদন
বৃটেন	১৭,৭৯০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৩,২৪০
জাপান	২৮,১৯০
মধ্যবিত্ত দেশ	**মাথাপিছু উৎপাদন**
দক্ষিণ আফ্রিকা	২,৬৭০
ব্রাজিল	২,৭৭০
মেক্সিকো	৩,৪৭০
আর্জেন্টিনা	৬,০৫০
নিম্নবিত্ত দেশ	**মাথাপিছু উৎপাদন**
ভারত	৩১০
পাকিস্তান	৪২০
চীন	৪৭০
শ্রীলঙ্কা	৫৪০

৪৯.৩ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক সূচক আছে, যেমন জাতীয় আয়/উৎপাদন, মাথাপিছু জাতীয় আয় / উৎপাদন, সাক্ষরতার হার, শিশু মৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল (average life expectancy) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম দুটি সূচক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে জাতীয় আয় বা মাথাপিছু জাতীয় আয় থেকে আমরা দেশের সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্রটি পাই না। এটি পেতে গেলে জাতীয় আয় দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হচ্ছে তা-ও জানা দরকার। জাতীয় আয় বা মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জাতীয় আয়ের বণ্টন এমনভাবে বদলে যেতে পারে যাতে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের অবস্থা আগের তুলনায় খারাপ হয়ে যায়। তথাপি সময়ের সাথে সাথে জাতীয় পরিবর্তন থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কীভাবে

বদলাচ্ছে তার কিছুটা হদিস পাওয়া যায়। সারণি ১.২-এ চলতি দামে উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP at factor cost at current prices), স্থির দামে উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, (GDP at factor cost at constant prices), এবং স্থির দামে মাথাপিছু নীট জাতীয় উৎপাদন (per capita net national product at constant prices) সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সারণি থেকে দেখা যায় ভারতের জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৯৭-৯৮ সালে কীভাবে বেড়েছে। সারণি ১.৩ এ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

সারণি — ১.২

ভারতের জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়

বছর	উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদন		
	চলতি দামে (কোটি টাকা)	স্থির দামে (কোটি টাকা)	স্থির দামে মাথাপিছু নীট জাতীয় উৎপাদন
১৯৫০-৫১	৮,৯৭৯	৪২,৮৭১	১,১২৭
১৯৬০-৬১	১৫,২৫৪	৬২,৯০৪	১,৩৫০
১৯৭০-৭১	৩৯,৭০৮	৯০,৪২৬	১,৫২০
১৯৮০-৮১	১,২২,৪২৭	১,২২,৪২৭	১,৬৩০
১৯৯০-৯১	৪,৭৭,৮১৪	২,১২,২৫৩	২,২২২
১৯৯১-৯২	৫,৫২,৭৬৮	২,১৩,৯৮৩	২,১৭৫
১৯৯২-৯৩	৬,৩০,৭৭২	২,২৫,২৪০	২,২৪৩
১৯৯৩-৯৪	৭,৯৯,০৭৭	৭,৯৯,০৭৭	৭,৯০২
১৯৯৪-৯৫	৯,৪৩,৪০৮	৮,৬১,০৬৪	৮,৩৫৭
১৯৯৫-৯৬	১১,০৩,২৩৮	৯,২৬,৪১২	৮,৮১৯
১৯৯৬-৯৭	১২,৮৫,২৫৯	৯,৯৮,৯৭৮	৯,৩৭৭
১৯৯৭-৯৮	১৪,২৬,৬৭০	১০,৪৯,১৯১	৯,৬৬০

সারণি — ১.৩

উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী প্রকৃত নীট জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু প্রকৃত নীট জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার

পরিকল্পনাকাল	প্রকৃত নীট জাতীয় উৎপাদন	মাথাপিছু প্রকৃত নীট জাতীয় উৎপাদন
প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	৩.৬	১.৭
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	৩.৯	১.৯
তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	২.৩	০.১
তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯)	৩.৭	১.৪
চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)	৩.৩	০.৯
পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)	৪.৯	২.৬
বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮০)	−৬.০	−৮.২
ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৫.৪	৩.২
সপ্তম পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৫.৮	৩.৬
দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯২)	২.৫	০.৪
অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)	৬.৮	৪.৯

সারণি ১.৩ থেকে প্রতিভাত হয় যে ১৯৭৯-৮০ (দ্বিতীয়বার খনিজ তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির দরুণ) এবং ১৯৯০-৯২ (ভারতের বৈদেশিক লেনদেন তীব্র সঙ্কটের ফলে)-এই তিনটি ব্যতিক্রমী বছরগুলিকে বাদ দিলে পঞ্চম পরিকল্পনার সময় (১৯৭৪-৭৯) থেকেই জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্রমশই বেড়েছে। তবে, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ভারতের অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে এবং নবম পরিকল্পনার সময়কালে জাতীয়

উৎপাদনের বৃদ্ধির হার অষ্টম পরিকল্পনার তুলনায় কম হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই সবেরই কারণ নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের থেকে অনেক কম। এর কারণ হল জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

৪৯.৪ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি ও দারিদ্র্য

আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেই যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে তা ঠিক নয়। বস্তুত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়ের বণ্টনের বৈষম্য এমনভাবে বেড়ে যেতে পারে যে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল হবার বদলে খারাপ হয়ে যায়। ভারতের ক্ষেত্রে অন্তত ১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত এমনটা ঘটেনি বলে ধরে নেওয়া যায়। এদেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র্য সীমা (poverty line)-এর নীচে বাস করেন। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি এই দরিদ্র জনসাধারণের উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা সারণি ১.৩ ও ১.৪ থেকে পরিস্ফুট হবে।

সারণি ১.৪ থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের জনসংখ্যার ৫৪.৯ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করতেন। মোটামুটি এই সময় থেকেই ভারতের জাতীয় আয় উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে (সারণি ১.৩)। মূলত এই অর্থনৈতিক প্রগতি এবং বিশেষ দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলির প্রভাবে জনসংখ্যায় দরিদ্র মানুষের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩৬ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। যদিও দারিদ্র্য দূরীকরণে ভারতের এই সাফল্য প্রশংসার যোগ্য তবুও সারণি ১.৫ থেকে পরিস্ফুট হয় যে ভারতের এই সাফল্য অন্যান্য অনেক দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশের তুলনায় কম।

সারণি — ১.৪

ভারতের জনসংখ্যায় দরিদ্র মানুষের অনুপাত

(একক : শতাংশ)

বছর	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সমগ্র ভারত
১৯৭৩-৭৪	৫৬.৪	৪৯.০	৫৪.৯
১৯৭৭-৭৮	৫৩.১	৪৫.২	৫১.৩
১৯৮৩	৪৫.৭	৪০.৮	৪৪.৫
১৯৮৭-৮৮	৩৯.১	৩৮.২	৩৮.৯
১৯৯৩-৯৪	৩৭.৩	৩২.৪	৩৬.০

সারণি ১.৫ থেকে দেখা যায় যে চীন ও ইন্দোনেশিয়া দরিদ্র্য দূরীকরণে ভারতের থেকে অনেকটা এগিয়ে।

সারণি— ১.৫

ভারত এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে দারিদ্র্যের অনুপাত ও বৃদ্ধির হার

দেশ	দারিদ্র্যের অনুপাত (১৯৭৫)	দারিদ্র্যের অনুপাত (১৯৯৫)	দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক শতকরা হার (১৯৭৫-৯৫)
ভারত	৫৪.৯	৩৬.০	০.৯
চীন	৫৯.৫	২২.২	১.৯
ইন্দোনেশিয়া	৬৪.৩	১১.৪	২.৬
কোরিয়া	২৩.০	৫.০	০.৯
মালয়েশিয়া	১৭.৪	৪.৩	০.৭
ফিলিপিনস	৩৫.৭	২৫.৫	০.৫
থাইল্যান্ড	৮.১	০.৯	০.৪

৪৯.৫ ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। জাতীয় উৎপাদনের কতটা অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় তার উপর নির্ভর করে জাতীয় আয় বা উৎপাদনের প্রগতির হার। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, একটি দেশে জাতীয় উৎপাদনের যত বেশী অংশ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই দেশে অর্থনৈতিক প্রগতির হার তত বেশী। সারণি ১.৬ থেকে দেখা যায় যে মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (gross domestic investment) এবং মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (gross domestic saving) মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে ১৯৫০-৫১ সালে যথাক্রমে ১০.২ এবং ১০.৪ থেকে বেড়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে হয়ে দাঁড়ায় ২৪.৮ এবং ২৩.১।

সারণি — ১.৬

ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ)

বছর	মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়
১৯৫০-৫১	১০.২	১০.৪
১৯৬০-৬১	১৫.৭	১২.৭
১৯৭০-৭১	১৬.৬	১৫.৭
১৯৮০-৮১	২২.৭	২১.২
১৯৯০-৯১	২৭.৭	২৪.৩
১৯৯১-৯২	২৩.৪	২২.৯
১৯৯২-৯৩	২৩.৯	২২.০
১৯৯৩-৯৪	২২.৪	২১.৮
১৯৯৪-৯৫	২৫.৪	২৪.২
১৯৯৫-৯৬	২৫.৮	২৪.১
১৯৯৬-৯৭	২৫.৭	২৪.৪
১৯৯৭-৯৮	২৪.৮	২৩.১

সারণি ১.৩ এবং ১.৬ যুগপৎ বিচার করলে দেখা যায় যে, ১৯৮০'র দশক এবং ১৯৯০'র দশক— এই দুই দশকেই জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হার আগেই দশকগুলির তুলনায় অনেক বেশী ছিল এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে এই দু'টি দশকে জাতীয় উৎপাদনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অনুপাতও ছিল অনেকটাই বেশী।

সাম্প্রতিককালে পূর্ব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির হার চমকপ্রদ। এই দেশগুলি হল সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। প্রথম চারটি দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য এত বেশী ছিল যে এদেরকে 'এশিয়ার বাঘ' (Asian Tigers) বলা হত। সারণি ১.৭ থেকে দেখা যায় যে এই দেশগুলির জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হার এবং জাতীয় উৎপাদন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অনুপাত—দুই-ই ভারতের তুলনায় অনেকটা বেশী।

সারণি — ১.৭

দেশ	জাতীয় উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মোট জাতীয় উৎপাদনের হার (শতাংশ)		জাতীয় উৎপাদনে সঞ্চয়ের অনুপাত (শতাংশ)		জাতীয় উৎপাদনে বিনিয়োগের অনুপাত (শতাংশ)	
	১৯৭০-৮০	১৯৮০-৯২	১৯৭০	১৯৯২	১৯৭০	১৯৯২
ভারত	৩.৪	৫.২	১৬	২২	১৭	২৩
ইন্দোনেশিয়া	৭.২	৫.৭	১৪	৩৭	১৬	৩৫
থাইল্যান্ড	৭.১	৮.২	২১	৩৫	২৬	৪০
হংকং	৯.২	৬.৭	২৫	৩০	২১	২৯
সিঙ্গাপুর	৮.৩	৬.৭	১৮	৪৭	৩৯	৪১
মালয়েশিয়া	৭.৯	৫.৯	২৭	৩৫	২২	৩৪

৪৯.৬ জাতীয় উৎপাদনে বিভিন্ন বর্গের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদনের বিভিন্ন বর্গের (sector) গুরুত্বের পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয় আয়ের তিনটি প্রধান উৎস : প্রথম বর্গ (primary sector), দ্বিতীয় বর্গ (secondary sector), এবং তৃতীয় বর্গ (tertiary sector)। কৃষি এবং অন্যান্য প্রকৃতি-নির্ভর কাজকর্ম — পশুপালন, অরণ্যভিত্তিক কাজ (যেমন কাঠ কাটা), মাছ ধরা, খনি-সম্পর্কিত কাজ ইত্যাদি প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বর্গে থাকে সব রকমের শিল্প যাতে কাঁচামালের রূপান্তর করা হয় যন্ত্রাদির সহায়তায়, যেমন বড় কারখানাতে বা কুটির শিল্পে। তাছাড়া নির্মাণকার্য, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন এবং জল সরবরাহকেও এই বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় বর্গের মধ্যে পড়ে বাকি সব কাজ। এইসব ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য উৎপাদিত হয় না, হয় উৎপাদনে সাহায্যকারী বা এমন সব কাজ যার জন্য লোকে দাম দিতে প্রস্তুত। এই তৃতীয় বর্গে পড়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং

অন্যান্য পরিষেবামূলক কাজ। উন্নয়নের প্রথম স্তরে জাতীয় উৎপাদনে প্রথম বর্গের গুরুত্ব থাকে সর্বাধিক। অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে লোকের আয় বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে লোকের চাহিদায় শিল্পজাত দ্রব্য এবং বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার চাহিদা বাড়তে থাকে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসাবে জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক বর্গজাত দ্রব্যের অনুপাত কমে যেতে থাকে এবং অন্য দু'টি বর্গজাত দ্রব্যের অনুপাত বেড়ে যেতে থাকে। সারণি ১.৫ থেকে লক্ষণীয় যে ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের ৫৬.৫ শতাংশ প্রাথমিক বর্গে, ১৫.১ শতাংশ দ্বিতীয় বর্গে, এবং বাকীটা তৃতীয় বর্গে উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৯৭-৯৮ সালে এই অনুপাতগুলি ছিল যথাক্রমে ২৮.৭ শতাংশ, ২৪.৭ শতাংশ এবং ৪৬.৫ শতাংশ।

সারণি — ১.৮

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বিভিন্ন বর্গের অনুপাত

(একক : শতাংশ)

বছর	প্রথম বর্গ	দ্বিতীয় বর্গ	তৃতীয় বর্গ
১৯৫০-৫১	৫৬.৫	১৫.০	২৮.৫
১৯৬০-৬১	৫২.২	১৮.৭	২৯.১
১৯৭০-৭১	৪৫.৮	২৩.৩	৩১.৯
১৯৮০-৮১	৩৯.৬	২৪.৪	৩৬.০
১৯৯০-৯১	৩২.৯	২৮.০	৩৯.১
১৯৯৭-৯৮	২৮.৭	২৪.৭	৪৬.৬

১৯.৭ সারাংশ

এই এককে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমেই দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় ক্রমশঃ বেড়েছে। ১৯৫০-৭৪—এই সময়কালে প্রকৃত জাতীয় আয়ের শতকরা বৃদ্ধির হার কম থাকলেও পঞ্চম পরিকল্পনার সময় থেকে অর্থাৎ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকে। ষষ্ঠ এবং

সপ্তম পরিকল্পনার সময়কালে অর্থাৎ আশির দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫ শতাংশরও বেশী। অষ্টম পরিকল্পনার সময়কালে (১৯৯২-৯৭) এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৮ শতাংশে। নবম পরিকল্পনায় অবশ্য এই বৃদ্ধির হার অষ্টম পরিকল্পনার তুলনায় কমে যাবারই সম্ভাবনা প্রবল।

১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্যের পরিমাণও কমে যেতে থাকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট জনসংখ্যার ৫৩.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিলেন। ১৯৯৩-৯৪ সালে এই অনুপাত কমে দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশে। অর্থাৎ, ভারতে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত যে ধরনের অর্থনৈতিক প্রগতি হয় তার কিছু সুফল দেশের দরিদ্র জনসাধারণও ভোগ করেছিলেন।

বর্ধিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগই অর্থনৈতিক প্রগতি বা জাতীয় আয়ের বেড়ে যাওয়ার প্রধান উৎস। ভারতে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে জাতীয় আয়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারও বেড়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রেতাদের ভোগ্যবস্তুর চাহিদায় কৃষিজাত দ্রব্যের গুরুত্ব কমে যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার গুরুত্ব বেড়ে যেতে থাকে। এই কারণে অর্থনৈতিক প্রগতির অনুষঙ্গ হিসাবে জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক বর্গের অবদান কমে যায় এবং বেড়ে যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা পরিষেবা বর্গের অবদান। ভারতেও ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় উৎপাদনের ৫৬.৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছিল প্রাথমিক বর্গে, ১৫.০ শতাংশ দ্বিতীয় বর্গে, এবং ২৮.৫ শতাংশ তৃতীয় বা পরিষেবা বর্গে। ১৯৯৭-৯৮ সালে এই অনুপাতগুলি হয় যথাক্রমে ২৮.৭ শতাংশ, ২৪.৭ শতাংশ এবং ৪৬.৬ শতাংশ।

৪৯.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে জাতীয় উৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার কীরকম ছিল?

২। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বিশ্বে ভারতের অবস্থান কোথায়?

৩। ভারতে পরিকল্পনাকালে দারিদ্র্যের হার কীভাবে কমেছে।

৪। ভারতের জাতীয় আয়ে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অনুপাত কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

৫। জাতীয় উৎপাদনে বিভিন্ন বর্গের গুরুত্ব কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

বড় প্রশ্ন :

১। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

২। জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের সাথে এদেশে দারিদ্র্যের পরিমাণের এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কী সম্পর্ক লক্ষ্য করা গিয়েছে?

৪৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। *Economic Survey 2000-2001* : Ministry of Finance, Government of India.

২। ভবতোষ দত্ত — ভারতের আর্থিক উন্নয়ন : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

৩। ড. গৌতম কুমার সরকার — ভারতের আর্থিক বিকাশ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা-৯।

একক ৫০ □ ভারতের কৃষি

গঠন

৫০.০ উদ্দেশ্য

৫০.১ প্রস্তাবনা

৫০.২ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো

৫০.২.১ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ

৫০.২.২ স্বাধীনতা-উত্তর যুগ

৫০.৩ কৃষির বিকাশ (১৯৫০-৬৫)

৫০.৩.১ কৃষি-বেকারত্বের স্বরূপ

৫০.৩.২ খামারের আয়তন এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের সম্পর্ক

৫০.৩.৩ পরিকল্পিত কৃষি উন্নয়ন (১৯৫০-৬৫)

৫০.৪ সবুজ বিপ্লব

৫০.৪.১ সবুজ বিপ্লব (১৯৬৫-৮০)

৫০.৪.২ প্রজাসত্ত্ব ও ভাগচাষ প্রথা

৫০.৪.৩ কৃষি পরিকাঠামোয় সরকারী বিনিয়োগ

৫০.৪.৪ কৃষির বিকাশ (১৯৮০-৯০)

৫০.৪.৫ কৃষির বিকাশ (১৯৯১-১৯৯৯)

৫০.৫ আন্তঃবর্গীয় পণ্য বিনিয়োগের শর্ত

৫০.৬ সারাংশ

৫০.৭ অনুশীলনী

৫০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে অনুধাবন করা যাবে :

- আমাদের কৃষির অবস্থা এবং কৃষি কাঠামো স্বাধীনতার আগে কেমন ছিল?
- স্বাধীনতার পর কৃষি কাঠামোয় পরিবর্তন আনার জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ছিল এবং এগুলির দোষ ত্রুটি কী ধরনের ছিল?
- ভারতীয় কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব কি এবং সবুজ বিপ্লবকে কীভাবে দেশের সর্বত্র এবং সর্বশ্রেণির কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়?
- সরকারের নতুন কৃষিনীতির স্বরূপ এবং এই নীতি কৃষি-উন্নয়নে কতখানি সফল হবে?

৫০.১ প্রস্তাবনা

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি একাধিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কৃষি খাদ্য উৎপাদন করে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে ৩৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। খাদ্যই এদের প্রধান ভোগ্যবস্তু। খাদ্য অপ্রতুল হলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়। খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে এঁরাই বাধ্য হন খাদ্যের ভোগ কমিয়ে দিতে। অর্থাৎ খাদ্যের অপ্রতুলতাজনিত যে কষ্ট তার পুরোটারই সম্মুখীন হন এই দরিদ্র শ্রেণি।

শুধু তাই নয়, কৃষি আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষের বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর আয়ের প্রধান উৎস। কৃষির উৎপাদন কমে গেলে দেশের বেশীর ভাগ মানুষের আয় কমে যায়। এর ফলে দারিদ্র্যের পরিমাণ বাড়ে এবং শুধু খাদ্যের নয় অন্যান্য দ্রব্যেরও চাহিদা হ্রাস পায়। চাহিদা কমার কারণে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে মন্দাভাব দেখা যায়। ফলত এর দরুণ দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সঙ্কট আরো ঘণীভূত হয়।

উপরোক্ত কারণে ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে কৃষি উন্নয়ন কতটা হয়েছে, কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়গুলি কী কী, এবং কীভাবে এগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব— এ সবই এই এককে আলোচিত হয়েছে।

৫০.২ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো

৫০.২.১ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতীয় কৃষির কতটা উন্নতি হয়েছে এবং কৃষি-উন্নয়নের সমস্যাগুলিই বা কী— এ সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণা পেতে হলে স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের কৃষি কী অবস্থায় ছিল সে সম্পর্কে

কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রামাণ্য তথ্যের অভাব থাকলেও বলা যেতে পারে যে, এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে (১৯০০-১৯২৫) কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল প্রায় শূন্য, এবং পরবর্তী পঁচিশ বছরে (১৯২৫-১৯৫০) এই হার ছিল ঋণাত্মক। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় কৃষির এই দুর্দশাগ্রস্থা অবস্থার জন্য বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদই ঐ সময়কার কৃষির কাঠামোকেই দায়ী করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনের কারণগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কৃষির সঙ্গে জড়িত মানুষদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : জমিদার, কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক। জমিদাররা প্রচুর জমির মালিক ছিলেন। বস্তুত দেশের বেশীর ভাগ কৃষিযোগ্য জমি এঁদের মালিকানাধীন ছিল। চাষের প্রথা ছিল সামন্ততান্ত্রিক (feudal mode of production)। অর্থাৎ, জমিদাররা নিজেরা চাষ করতেন না। এঁরা নিজেদের জমি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে রায়তদের (tenants) ইজারা দিয়ে দিতেন। রায়ত বা কৃষকেরা এই জমি চাষ করতেন এবং জমিদারদের একটি নির্দিষ্ট খাজনা দিতেন। জমিদারদের বেশীর ভাগই থাকতেন শহরে। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। কৃষকদের জমির পরিমাণ ছিল এতই কম যে, তার থেকে উপার্জিত খাজনা গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। অতএব কৃষকদের নিজেদের জমি নিজেদেরই চাষ করতে হত। বস্তুত জীবন ধারণের জন্য অনেক কৃষককেই ভাগচাষী হিসাবে জমিদারদের জমি চাষ করতে হত। ভূমিহীন কৃষকদের অন্যের জমিতে শ্রমিক অথবা বর্গাদার হিসাবে চাষ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কৃষি কাঠামোয় এই ত্রিধা-বিভক্ত শ্রেণিবিন্যাস ইংরেজ সরকারের সৃষ্টি। ইংরেজরা ক্ষমতায় আসার আগে ভারতবর্ষে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না। ক্ষমতায় আসার পর দেশ শাসন করার জন্য ইংরেজদের অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কর সংগ্রহ করার মত লোকবল তখন তাদের ছিল না। এই জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা এক একজন লোককে বেছে নেয় যাদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকজনের কাছ থেকে কর আদায় করার ক্ষমতা ছিল। এঁদের উপরই ইংরেজ সরকার বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্ত জমির মালিকানা অর্পণ করে এবং এই ভাবে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির সঙ্গে জড়িত যে সব বিভিন্ন শ্রেণী তৈরী হয় তাদের কর্তব্য ও অধিকার সুনির্দিষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার নানা আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রকে করা হয় দেশের সমস্ত জমির সর্বোচ্চ মালিক। জমিদার, জায়গীরদার, তালুকদার ইত্যাদি উপস্বত্বভোগীদের করা হয় রাষ্ট্রের অধস্তন জমির মালিক। এঁরা এঁদের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। জমিতে বসবাস ও চাষ-আবাদকারী অন্যান্য মানুষ এই সব আইন অনুযায়ী হয়ে গিয়েছিলেন প্রজা বা ভাগচাষী। প্রজা বা রায়তদের জমিতে বসবাস ও চাষ করার অধিকারের বিনিময়ে জমিদারকে খাজনা দিতে হত। জমিদার ইত্যাদিরা যেহেতু তাঁদের মালিকানা রাষ্ট্রের থেকে পেয়েছিলেন সেহেতু একটা নির্দিষ্ট অর্থ তাঁদের সরকারকে দিতে হত রাজস্ব হিসাবে।

কালক্রমে ধীরে ধীরে জমিদার ও রায়ত — এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আরো অনেক উপস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল। এঁরা জমিদারদের মতোই চাষবাসে অংশগ্রহণ করতেন না, কিন্তু জমির থেকে উদ্ভূত আয়ের উপর এঁদের দাবি ছিল। বৃটিশ আমলে সরকারী দপ্তরে, বিচার-ব্যবস্থায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক নতুন পেশার

সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক জমিদার বা তাঁদের সন্তান সন্ততিরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে এই সব নতুন পেশায় যোগ দেন। গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার সময় তাঁরা অন্য লোকেদের হাতে জমি জমা দেখাশোনা করা এবং রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে আসেন। সময়ের সাথে সাথে এঁদেরও অনেকে শহরে চলে যান। এই ভাবে, কৃষি কাজের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত নয় অথচ জমির আয়ের উপর অধিকার আছে এই ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে। আসল চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর প্রভাব ছিল মর্মান্তিক। প্রথমত, কৃষিযোগ্য জমির তুলনায় প্রকৃত চাষীর সংখ্যা ছিল অত্যধিক। এর ফলে মালিক পক্ষের সঙ্গে খাজনার ব্যাপারে দর কষাকষির তেমন কোনো ক্ষমতাই প্রকৃত চাষীদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, কৃষিকাজের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু জমি থেকে উদ্ভূত আয়ের দাবিদার— এই ধরনের লোকের সংখ্যা ছিল অনেক। এই দুই কারণে স্বভাবতই প্রকৃত চাষিদের খুব বেশী হারে খাজনা দিতে হত। খাজনা দেবার পর তাঁদের হাতে যেটুকু আয় অবশিষ্ট থাকত তা দিয়ে কোনো রকমে জীবন ধারণ করতে হত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কৃষি মোটেই লাভজনক ছিল না। কৃষির থেকে যাঁরা খাজনা উপার্জন করতেন কৃষির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা অন্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের আয় হয় বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় ব্যয় করতেন, নচেৎ লগ্নী করতেন নতুন যে সব লাভজনক ব্যবসায়ের পথ ঐ সময় উন্মুক্ত হচ্ছিল সেই সব ক্ষেত্রে। কৃষিতে বিনিয়োগ এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লে লাভ হত প্রকৃত চাষিদের যাঁদের কৃষি ছাড়া রোজগারের অন্য কোনো পন্থা ছিল না। জমির উৎপাদন বাড়লে তাঁদের আয় বাড়ত এবং দারিদ্র্যের লাঘব হত। কিন্তু বিনিয়োগ করার মতো কোনো উদ্বৃত্ত আয়ই প্রকৃত চাষীদের ছিল না।

৫০.২.২ স্বাধীনতা-উত্তর যুগ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সরকার ভারতীয় কৃষি ও গ্রামীণ সমাজে বৈষম্যমূলক ও অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তন করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থাগুলির প্রধান অঙ্গ ছিল ভূমিসংস্কার (land reforms)। ভূমিসংস্কারের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য হল— (ক) অকৃষক মালিক শ্রেণীর হাত থেকে জমির মালিকানা অধিগ্রহণ করে প্রকৃত চাষির হাতে মালিকানা তুলে দেওয়া এবং (খ) জমির মালিকানার এমন পুনর্বণ্টন যাতে ক্ষুদ্র চাষী এবং ভূমিহীনরা কিছুটা জমির অধিকারী হন।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভূমিসংস্কারের দায়িত্ব রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে প্রায় সব রাজ্য সরকারগুলিই পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ভূমিসংস্কারের প্রথম উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য মধ্যস্বত্ব অবলোপ সংক্রান্ত আইনসমূহ প্রণয়ন করে। এইসব আইন অনুসারে রাজ্য সরকারগুলি যে ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে জমিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করে কৃষকদের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে।

জমিদারি-উচ্ছেদ আইনে পূর্বতন জমিদাররা তাঁদের ব্যক্তিগত চাষের আওতাধীন জমির উপর মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন। জমিদারের ব্যক্তিগত চাষের আওতাধীন জমি বলতে কেবলমাত্র যে জমি জমিদার নিজে হাতে

চাষ করেন সেই জমিই বোঝাত না; যে জমি জমিদাররা মজুর দিয়ে চাষ করাতেন সে জমিও বোঝাত। জমিদাররা যখন শুনলেন সরকার জমিদারি উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন তখন ওঁরা বর্গাদারদের বাধ্য করলেন সরকারের খাতায় নিজেদের বর্গাদার হিসাবে নয়— মজুর হিসাবে নথিভুক্ত করতে। যাঁরা রাজি হলেন না, জমিদাররা তাঁদের উচ্ছেদ করলেন। যেহেতু আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগ খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেহেতু জমিদাররা এইসব করার জন্য যে সময় দরকার তা পেয়ে গেলেন। এইভাবে জমিদাররা জমির উপর তাঁদের মালিকানা জমিদারি-উচ্ছেদ আইন সত্ত্বেও অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

ভূমিসংস্কারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য অর্থাৎ জমির ন্যায্য পুণর্বণ্টনের জন্য রাজ্য সরকার প্রণয়ন করেন জমির ঊর্ধ্বসীমা (cciling) আইন। এই আইন অনুসারে একজন ব্যক্তির জমির মালিকানার উপর একটি সর্বোচ্চ সীমা বা সিলিং নির্ধারণ করা হয়। কোনো ব্যক্তির এই সিলিং-এর থেকে বেশী জমি থাকলে সেই উদ্বৃত্ত জমি এই আইনের বলে সরকার অধিগ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এই আইনও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হয়নি। তার প্রধান কারণ হল, এই আইন একটি পরিবারের জমির মালিকানার উপর নয়—ব্যক্তির জমির মালিকানার উপর সিলিং আরোপ করেছিল। এর ফলে জমিদাররা তাঁদের উদ্বৃত্ত জমি পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে হস্তান্তরিত করে সিলিং আইনকে এড়াতে পেরেছিলেন। তাছাড়া, জমির ঊর্ধ্বসীমা ও পুনর্বণ্টনের ফলে জমি পেয়ে যাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ভূমিহীনদের মোট সংখ্যার খুব ক্ষুদ্রাংশ। অর্থাৎ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে যেটুকু জমি পাওয়া সম্ভব হয় তা দারিদ্র্য নিরসনের প্রেক্ষিতে সামান্য। আবার পুনর্বণ্টিত অনেক জমিই চাষের উপযোগী ছিল না। সব মিলিয়ে, ভূমিসংস্কারের যে চেষ্টা সরকার করেছিলেন তা কৃষির কাঠামোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

৫০.৩ কৃষির বিকাশ (১৯৫০-১৯৬৫)

ভারতবর্ষের কৃষি উন্নয়নের ইতিহাসে এই সময়টিকে 'প্রাক্-সবুজ বিপ্লব' যুগ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই সময়টি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীন। এই সময় কৃষির উন্নয়নের জন্য যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে হলে ভারতীয় কৃষির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৫০.৩.১ কৃষি-বেকারত্বের স্বরূপ

ভারতবর্ষে দুই ধরনের পদ্ধতিতে চাষ হয়। ছোট চাষী ও ভাগ চাষীরা তাঁদের নিজেদের জমি অথবা জমিদারদের থেকে বর্গায় নেয়া জমি নিজেরা এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যরা মিলে চাষ করেন। একে বলে পারিবারিক পদ্ধতিতে চাষ। এই ধরনের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বলা যেতে পারে পারিবারিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান।

অন্য দিকে, অনেক বড় চাষী নিজেদের জমি চাষ করেন মজুর দিয়ে। একে বলে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ এবং এই ধরনের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বলা চলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা খামার। সাধারণভাবে, ভারতীয় কৃষিতে বড় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ধনতান্ত্রিক খামার এবং ছোট উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি পারিবারিক খামার।

পারিবারিক খামারগুলি এমনভাবে উৎপাদন করে যাতে পারিবারিক আয় সর্বাধিক হয়। বর্গাদারদের হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য, নয়তো উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ খাজনা হিসাবে দিতে হয়। অতএব, ছোটচাষী ও ভাগচাষী উভয়ের ক্ষেত্রেই পারিবারিক আয় সর্বাধিক হয় কৃষি উৎপাদন সর্বাধিক হলে। আলোচনার সরলীকরণের জন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চাষ হয় মূলত শ্রম দিয়ে। এই অবস্থায় উৎপাদন সর্বাধিক করতে হলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা যতক্ষণ পর্যন্ত ধনাত্মক (positive), ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যে শ্রমনিয়োগের স্তরে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হবে সেই শ্রমনিয়োগের স্তরে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) হবে শূন্য। রেখা চিত্র ২.১ থেকে এটি পরিস্ফুট হবে।

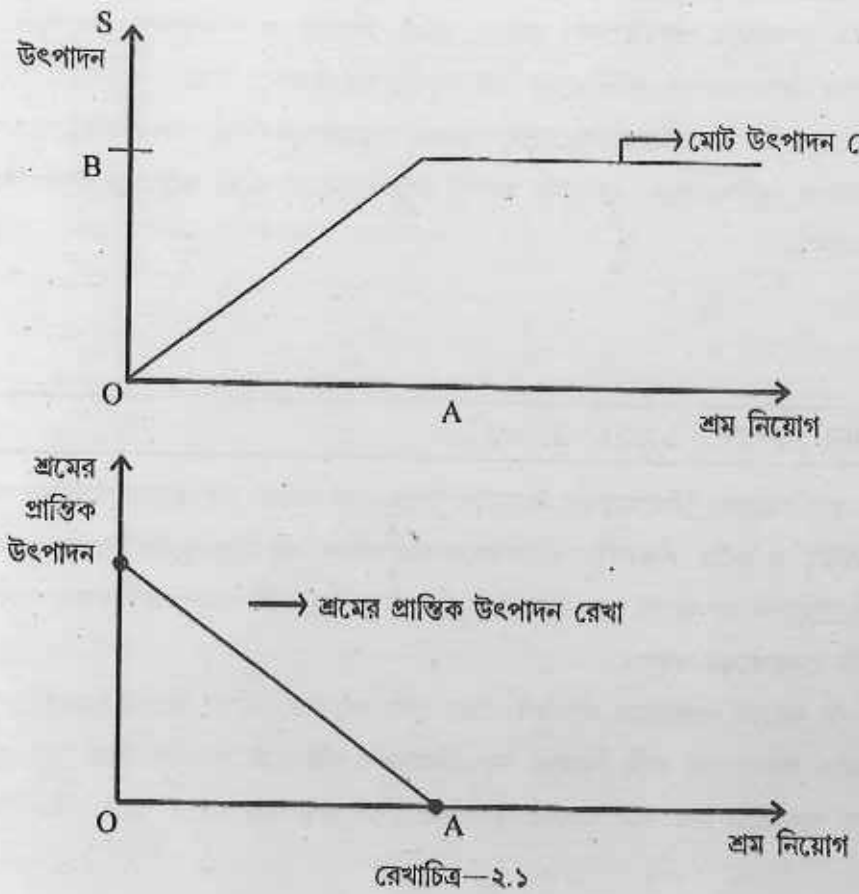

রেখাচিত্র—২.১

রেখাচিত্র ২.১ থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদন সর্বাধিক হয় যখন শ্রমনিয়োগের পরিমাণ OA।

অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক চাষীর আয় সর্বাধিক হয় ধনতান্ত্রিক খামারের মুনাফা সর্বাধিক হলে। মুনাফা সর্বাধিক হবে তখনই যখন শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত মজুরির হারের সাথে সমান। ব্যাপারটি রেখাচিত্র ২.২-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

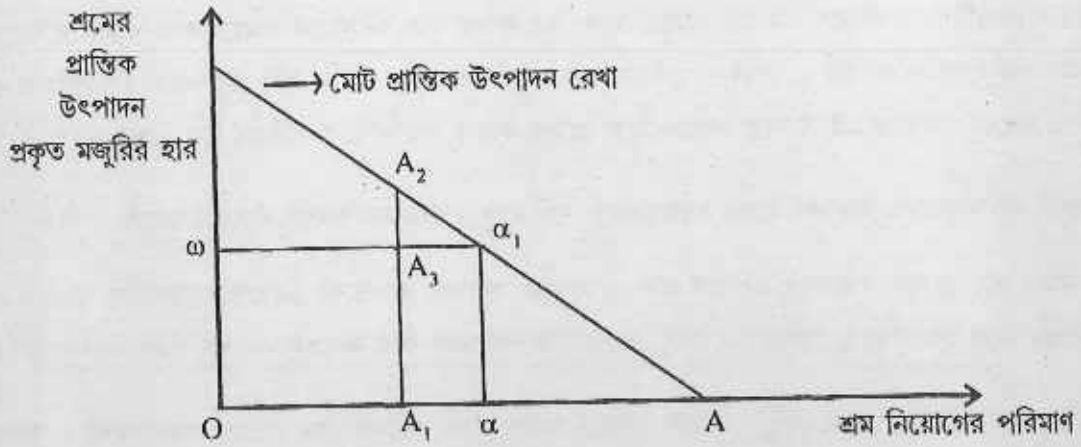

রেখাচিত্র—২.২

শ্রমনিয়োগ Oα হলে প্রকৃত মজুরির হার ω, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা $\alpha\alpha_1$-এর সাথে সমান হয় এবং এই পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত হলে মুনাফাও সর্বাধিক হয়। ধরা যাক, শ্রমনিয়োগের পরিমাণ $OA_1 < O\alpha$। এখানে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন $A_1A_2 > \omega = A_1A_3$। অর্থাৎ, শ্রমনিয়োগের পরিমাণ যদি এক একক বাড়ানো হয় তাহলে উৎপাদন বাড়বে A_1A_2 পরিমাণ, কিন্তু ব্যয় বাড়বে মাত্র A_1A_3। অতএব, মুনাফা বাড়বে $(A_1A_2 - A_1A_3) = A_2A_3$। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন প্রকৃত মজুরির হারের থেকে বেশি, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমনিয়োগের পরিমাণ বাড়ালে মুনাফা বাড়বে। একইভাবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন যদি প্রকৃত মজুরির হারের থেকে কম হয়, তাহলে শ্রমনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে মুনাফা বাড়ানো যাবে।

রেখচিত্র ২.১ ও ২.২ থেকে দেখা যায় যে, কোনও এক একক জমিতে বড় ধনতান্ত্রিক চাষীর তুলনায় একজন ছোট চাষী বা ভাগচাষী অনেক বেশী শ্রম প্রয়োগ ও উৎপাদন করবেন। এছাড়া, এই রেখাচিত্রগুলির সাহায্যে ভারতীয় কৃষির বেকারত্বের প্রকৃতি সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষের কৃষিতে প্রকাশ্য বেকারত্ব (open unemployment) (অর্থাৎ, সমর্থ, কাজ করতে ইচ্ছুক লোক কোনো অর্থকরী কাজ না করে বসে আছেন এমনটা) বিশেষ দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রকৃত কৃষক পরিবারেই হয় নিজের না হয় বড় জমিদারদের কাছ থেকে বর্গায় নেওয়া কিছুটা জমি থাকে। পরিবারের যে সব সদস্য ধনতান্ত্রিক খামারে কাজ পান না তাঁরা প্রত্যেকেই এই বর্গায় নেওয়া জমি চাষ করেন। এই জমিতে এঁদের সকলের পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ না থাকলে

যেটুকু কাজ থাকে সেটুকু এঁরা সবাই ভাগ করে করেন। অতএব, এঁদের কাউকেই বেকার বলা যায় না। কিন্তু পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত খামারে প্রয়োজনের তুলনায় সব সময়েই কিছু বেশী লোক নিযুক্ত থাকে। এই বাড়তি লোককে কাজ থেকে সরিয়ে নিলেও উৎপাদনের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। একে প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকারত্ব (disguised unemployment) বলা হয়। ব্যাপারটি রেখাচিত্র ২.১-এর সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক্, একটি পরিবারের নিজের বা বর্গায় নেওয়া জমির উৎপাদনের অবস্থাই রেখাচিত্র ২.১-এ দেখানো হয়েছে। এই পরিবারটি OA পরিমাণ শ্রম এই জমিতে দেবে। আরো ধরা যাক্, ধনতান্ত্রিক খামারে কাজ পাননি পরিবারের এমন সদস্যদের সংখ্যা হল x, এবং যে কোনো সদস্য পূর্ণ সময় কাজ করলে কৃষি উৎপাদনে 1^* পরিমাণ শ্রম দিতে পারেন। অতএব এই সদস্যরা সকলে মিলে প্রয়োগ করতে পারেন $x1^*$ পরিমাণ শ্রম। এখন, $x1^* > OA$ হলেই এই সদস্যদের অনেকেই হবেন প্রচ্ছন্ন বেকার। যদি $x1^* > OA$ হয় তাহলে এঁদের প্রত্যেকে $\frac{OA}{x}(<1^*)$ পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করবেন। এর অর্থ হল, x সংখ্যক সদস্যের প্রত্যেকেই নিজের পারিবারিক খামারে শ্রম দিচ্ছেন বলে প্রকাশ্যভাবে বেকার নন, কিন্তু এঁরা কেউই পূর্ণ সময় কাজ করছেন না। পূর্ণ সময় কাজ করে OA পরিমাণ শ্রম দিতে পারেন $\frac{OA}{1^*}$ সংখ্যক সদস্য। অর্থাৎ, OA পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করার জন্য x সংখ্যক সদস্যের প্রয়োজন নেই। যদি $\left(x-\frac{OA}{1^*}\right)$ সংখ্যক সদস্য পারিবারিক খামার থেকে সরে যান তাহলে বাকী $\frac{OA}{1^*}$ সংখ্যক সদস্য পূর্ণ সময় কাজ করে OA পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করবেন এবং উৎপাদন একই থাকবে। অতএব এখানে বেকারত্ব প্রকাশ নয়— প্রচ্ছন্ন, এবং প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা $\left(x-\frac{OA}{1^*}\right)$।

৫০.৩.২ খামারের আয়তন এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের সম্পর্ক

খামারের আয়তন ও জমির উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে সবুজ বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ খামারের আয়তন যত বড়, তার জমির উৎপাদনক্ষমতাও ছিল তত কম। এই সম্পর্কটিও রেখাচিত্র ২.১ ও ২.২-এর সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ছোট খামারগুলি প্রায় সবই পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত। এই খামারগুলিতে হয় ছোট চাষী তাঁর নিজের জমি, অথবা বর্গাদার তাঁর বর্গায় নেওয়া জমি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চাষ করেন। অন্য দিকে, বড় খামারগুলি সবই ধনতান্ত্রিক যেখানে বড় চাষী মজুর দিয়ে জমি চাষ করান। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পারিবারিক খামারে ধনতান্ত্রিক খামারের তুলনায় একর পিছু অনেক বেশী শ্রম নিয়োজিত হয় এবং তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হয়। এছাড়াও, খামারগুলি যতই বড় হয়, শ্রমের

প্রান্তিক উৎপাদন রেখাও ততই নীচের বা বাম দিকে থাকে। (রেখাচিত্র ২.১ ও ২.২)। অর্থাৎ, খামার যত বড় হয়, একক প্রতি জমিতে শ্রমনিয়োগ ও উৎপাদন তত কম হয়।

এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম খামার যত বড় হবে, উৎপাদন ও শ্রমিক পরিচালনার কাজ হবে ততই কঠিন ও শ্রমসাধ্য। দ্বিতীয়ত, খামার যত বৃহদায়তন হবে তার মালিক ততই ধনী হবে এবং আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal utility) ও তাঁর কাছে তত কম হবে। এতএব, তিনি উৎপাদন ও শ্রমিক পরিচালনার কাজে সময় তত কম দেবেন এবং বেশী পরিমাণে অবসর উপভোগ করবেন। অন্যদিকে, পারিবারিক খামার যতই ছোট হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক কৃষক পরিবার হবে ততই দরিদ্র। সুতরাং, জমির থেকে যথা সম্ভব বেশী উৎপাদন করার প্রয়োজনও তাঁদের তত বেশী হবে। এই দুই কারণেই খামার যতই বড় হবে, একক প্রতি জমিতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (marginal productivity) রেখা ততই বাম দিকে থাকবে। অর্থাৎ, একর পিছু শ্রমনিয়োগ ও উৎপাদন বৃহত্তর খামারে ক্ষুদ্রতর খামারের তুলনায় কম হবে (রেখাচিত্র ২.১ এবং ২.২)।

তবে খামারের আয়তন এবং জমির উৎপাদনশীলতার মধ্যে এই বিপরীতমুখী সম্পর্ক সব সময়ে এবং সব জায়গায় বিদ্যমান নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে এই ধরণের সম্পর্ক ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে পরিলক্ষিত হয়ছিল, কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে এর পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ, সবুজ বিপ্লব-উত্তর যুগে নানা কারণে বড় খামারের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও খামারের আয়তন এবং একরপিছু শ্রম নিয়োগের হার ছোট খামারে বরাবরই বেশী থেকেছে।

কৃষকদের খাদ্যশস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত (marketable surplus) এবং খামারের আয়তনের সম্পর্ক নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে খামারের আয়তন বাড়লে খাদ্যশস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের শতকরা অনুপাত বাড়ে। কারো কারোর মতে আবার বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের অনুপাত সব আয়তনের খামারেই সমান। বর্তমানে প্রায় সব ভারতীয় অর্থনীতিকদের ধারণা এই যে, ছোট খামারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ঋণাত্মক (negativc), কারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অনেককেই বেশ কিছুটা খাদ্যশস্য কিনে সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করতে হয়— বাজারে ছাড়ার মতো উদ্বৃত্ত ফসল তাঁদের তেমন কিছুই থাকে না।

৫০.৩.৩ পরিকল্পিত কৃষি উন্নয়ন (১৯৫০-৬৫)

এই সময়ে (১৯৫০-১৯৬৫) পরিকল্পনাকারদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন করা। আগেই বলা হয়েছে, ভূমিসংস্কারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাঁরা নিজের হাতে জমি চাষ করেন না তাঁদের কাছ থেকে প্রকৃত চাষীর হাতে মালিকানা তুলে দেওয়া। এই নীতি কার্যকর হলে দেশে বড় ধনতান্ত্রিক খামার থাকত না; চাষ হত ছোট ছোট পারিবারিক খামারে, এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং কৃষির মোট উৎপাদন অনেকখানি বেড়ে যেত।

ভারতীয় কৃষির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বহু অঞ্চল জমির মালিকের মালিকানাধীন জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত এবং এই খণ্ডগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়ান। এটি ভারতীয় কৃষিতে বিনিয়োগের একটি বড় অন্তরায়। ভূমিসংস্কারের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল জমির বিনিময় বা কৃষক সমবায় গঠনের মাধ্যমে খণ্ডীকৃত জোতের বদলে অখণ্ড জোত তৈরী করা। কৃষিতে অনেক ধরনের বিনিয়োগ শুধুমাত্র শ্রম দিয়ে করা যায়। যেমন জলসেচের জন্য কূপ খনন করা, প্রধান জলসেচ খাল থেকে বা প্রধান রাস্তা থেকে জমি পর্যন্ত শাখা খাল বা কাঁচা রাস্তা তৈরী করা। ছোট্ট এক খণ্ড জমির জন্য এই ধরনের বিনিয়োগ করা লাভজনক হয় না। পরিকল্পনাকাররা ভেবেছিলেন যে প্রকৃত চাষীর হাতে জমির মালিকানা তুলে দিলে এবং অখণ্ড জোত তৈরী করলে কৃষক পরিবাররা তাঁদের যে সব সদস্য প্রচ্ছন্ন বেকার তাঁদের দিয়ে এই ধরনের বিনিয়োগ করবেন এবং এর ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে কৃষি উন্নয়নের এই ছিল পরিকল্পিত নীতি।

ভূমিসংস্কারের কোনো উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ সফল হয়নি এবং কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পিত নীতি ভালভাবে বাস্তবায়িত করা যায় নি। তা সত্ত্বেও এই প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় কৃষির উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল ৩.৪ শতাংশ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের তুলনায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির এই উল্লেখযোগ্য উন্নতিকে আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি : প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে শিল্পে স্থিতাবস্থা ছিল; শিল্পের উৎপাদন বাড়েনি বললেই চলে। শিল্পক্ষেত্রের আয়তনও ছিল খুব সীমিত। এর ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা বা বাজার ছিল সঙ্কীর্ণ এবং স্থবির। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে এই সময় দ্রুত গতিতে শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। উৎপাদনের সাথে সাথে শিল্পে শ্রমনিয়োগও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্পে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় এবং শিল্প শ্রমিকরা খাদ্যশস্য ক্রয় করেন। অতএব, এই সময় শিল্পের অধিক উৎপাদন ও শ্রমনিয়োগের অনুষঙ্গ হিসাবে কৃষিপণ্যের চাহিদা বা বাজারও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে, কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো লাভজনক হয়। যে সব জমির মালিক প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বহু কৃষিযোগ্য জমি অব্যবহৃত রেখেছিলেন তাঁরা এই সব জমির মালিক প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বহু কৃষিযোগ্য জমি অব্যবহৃত রেখেছিলেন তাঁরা এই সব জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে এসে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে থাকেন। তবে, কৃষির প্রযুক্তির এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি এই সময় হয়নি।

অনুশীলনী

১। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের কৃষিকাঠামো কেমন ছিল?

২। ভারতের কৃষিকাঠামো পরিবর্তন করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়? এই ব্যবস্থাগুলি সফল হয়নি কেন?

৩। ভারতের কৃষিতে বেকারত্বের স্বরূপ কী?

৪। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে খামারের আয়তন ও জমির উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক ছিল তা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৫। ১৯৫০-৬৫—এই সময়কালে ভারতে পরিকল্পিত কৃষি-উন্নয়নের প্রকৃতি কী ছিল?

৬। ১৯৫০ ও ১৯৬৫ সালের ব্যবধানে ভারতে কৃষি উৎপাদন কী হারে বেড়েছিল? এই বৃদ্ধির হারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৫০.৪ সবুজ বিপ্লব

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে নতুন জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ দ্রুত গতিতে কমে আসতে থাকে। এর ফলে কৃষির উৎপাদনের বৃদ্ধির হারও আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। পরিকল্পনাকাররা এই সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষিপ্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে জমির উৎপাদনক্ষমতা না বাড়াতে পারলে কৃষি উৎপাদনের হারকে সন্তোষজনক মাত্রায় ধরে রাখা যাবে না। এই কারণেই ১৯৬৫ সালে সরকার ভারতীয় কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজ (High yielding variety of seeds)-এর ব্যবহার প্রবর্তন করেন। এই বীজের উৎপাদনক্ষমতা সাধারণ বীজের থেকে অনেক বেশী ছিল। এই বীজ প্রবর্তন করার পর ভারতীয় কৃষিতে উন্নয়নের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয় তাকেই বলা হয় সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লবের প্রথম পনেরো বছরকে (১৯৬৫-১৯৮০) বলা চলে সবুজ বিপ্লবের প্রারম্ভিক কাল। ১৯৮০-র পরের সময়টিকে বলা চলে সবুজ বিপ্লবের পরবর্তী কাল।

৫০.৪.১ সবুজ বিপ্লব (১৯৬৫-১৯৮০)

প্রারম্ভিক কালে সবুজ বিপ্লব বড় একটা সাফল্য লাভ করে নি। এই সময় কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল ২.৪ শতাংশ যেটা সবুজ বিপ্লবের আগের সময়ের বৃদ্ধির হারের তুলনায় এক শতাংশ কম। অবশ্য এই নতুন বীজ ও তার আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি ভারতীয় কৃষিতে প্রবর্তন না করা হলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার হয়তো শূন্যতে এসে দাঁড়াত। প্রারম্ভিক কালে সবুজ বিপ্লব কেন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি তার দু'টি মূল কারণ আছে— (১) প্রজাস্বত্ব প্রথা এবং (২) কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগের অপ্রতুলতা।

৫০.৪.২ প্রজাস্বত্ব ও ভাগচাষ প্রথা

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ি পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লবের সাফল্য সীমিত হবার কারণ হিসাবে কৃষিকাঠামোকে বা আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, প্রজাস্বত্ব প্রথা ও উৎপাদনের উপাদানের বাজারগুলির অন্তর্বন্ধন (tenurial arrangement and interlocking of factor markets) কে দায়ী করেছেন। ভারতবর্ষে দু'রকম

প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা দেখা যায়; স্থিরখাজনা (fixed rent tenancy) এবং ভাগচাষ (share tenancy)। প্রথম ব্যবস্থায় খাজনার একটি স্থির পরিমাণ নির্ধারিত থাকে যার উৎপাদনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় খাজনার পরিমাণ উৎপাদনের একটি স্থির ভগ্নাংশ বা ভাগ হিসাবে নির্ধারিত থাকে। ভারতীয় কৃষিতে এই দ্বিতীয় ধরনের প্রজস্বত্বেরই আধিপত্য দেখা যায়। প্রজা (tenant) অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাঁদের কোন সঞ্চয় ক্ষমতা নেই। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির বছরে জীবন ধারণের জন্য তাঁদের ঋণের প্রয়োজন হয়। যাঁর জমি ইজারায় নিয়েছেন একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই এই ঋণ প্রজারা পেতে পারেন। এর কারণ হল অন্য কারুরই এঁদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এঁদের মূল্যবান কোন কিছু বন্ধক দেবার সামর্থ্যও নেই। এই কারণেই ভারতীয় কৃষিতে জমির ইজারায় বাজার এবং ঋণের বাজার পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

যেহেতু ভাগচাষীরা নিজেদের জমিদারদের কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে ঋণ পান না এবং ঋণের উপর যেহেতু তাঁরা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল সেহেতু জমিদাররা অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দেন। এই সুদের হার এমনই যে জমিদারদের খাজনা এবং সুদ দেওয়ার পর ঋণ ফেরত দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই ভাগচাষীদের থাকে না। অতএব ভারতীয় কৃষিতে রায়তরা চিরজীবন জমিদারদের কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকেন। ভাদুড়ি বলেছিলেন যে এই অবস্থায় কৃষিতে যদি কোনো উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হয় তাহলে জমিদাররা সেই প্রযুক্তি ব্যবহার নাও করতে পারেন। এর কারণ জমিদারের আয়ের দু'টি উৎস— খাজনা ও সুদ। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে জমির উৎপাদন বেড়ে যায়। ভাগচাষের ক্ষেত্রে এই বাড়তি উৎপাদনের একটা অংশ খাজনা হিসাবে জমিদাররা পান। বাকিটা ভাগচাষীদের কাছে থেকে যায়। ভাগচাষীরা এই বাড়তি আয় ব্যবহার করতে পারেন ঋণের বোঝা কমানোর জন্য। এবং কালক্রমে তাঁরা তাঁদের ঋণ সম্পূর্ণভাবে শোধ করে দিতে পারেন। এতএব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে জমিদারদের খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু সুদের পরিমাণ কমে বা শূন্য হয়ে তাঁদের মোট আয় কমে যেতে পারে। এই কারণেই ভাদুড়ির মতে জমিদাররা কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন নি। তার ফলেই সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে নি এবং আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হল এই যে, ভাদুড়ির মতে উৎপাদনের খাজনার ভাগ বা সুদের হার বহুদিনের প্রচলিত প্রথা দিয়ে নির্ধারিত হয়। অতএব, জমির উৎপাদন বেড়ে গেলেই খাজনার হার বা সুদের হার বাড়িয়ে সমস্ত বাড়তি উৎপাদনটুকুই আত্মসাৎ করা জমিদারদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ভারতীয় কৃষিতে ভাগচাষ প্রথা এবং অক্ষিক উন্নতির মধ্যে যে সম্পর্ক অধ্যাপক ভাদুড়ির তত্ত্বে বিবৃত হয়েছে তা পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে আহৃত প্রাথমিক তথ্যগুলির দ্বারা সমর্থিত হয় নি। জমির মালিকরা প্রায়শই ভাগচাষীদের উৎপাদন ঋণ দেন, বীজ ও সার ইত্যাদির খরচের অংশ বহন করেন, উৎপাদনের উপকরণের ব্যবহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেন এবং সাধারণভাবে ভাগচাষের ভিত্তিতে সংগঠিত খামারে মূলধন বিনিয়োগে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। এ সবই অধ্যাপক ভাদুড়ির তত্ত্বের বিরোধী। অধ্যাপক অশোক রুদ্র এবং প্রণব বর্ধনের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পূর্ব ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও অন্তবর্ন্ধনের অস্তিত্ব খুবই কম।

বস্তুত ভাগচাষের প্রকৃতি এবং কৃষিতে অঙ্গিক প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে ভাগচাষের ফলে ভারতের কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু অনেকেই এই মতের ঘোর বিরোধী। সম্প্রতি কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ভাগচাষীরা স্বপরিচালিত খামারের মালিকদের তুলনায় নতুন কৃষি আঙ্গিক (যেমন রাসায়নিক সার) ব্যবহারে পিছিয়ে নেই। তবে ব্যাঙ্কগুলির অনীহা এবং প্রশাসনিক সমস্যার দরুন নথিভুক্ত বর্গাদারদের মোট সংখ্যার একটা ছোট অংশকেই স্বল্পকালীন ঋণ ব্যবস্থার আওতায় আনা গিয়েছে।

৫০.৪.৩ কৃষি পরিকাঠামোয় সরকারী বিনিয়োগ

অনেক অর্থনীতিবিদের মতে কৃষি পরিকাঠামোয় সরকারী বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় হারে না হবার ফলেই সবুজ বিপ্লব প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এই মতটিকে বুঝতে হলে উচ্চফলনশীল বীজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই বীজগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ বীজের তুলনায় বেশী। তবে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে এই বীজগুলির সঙ্গে রাসায়নিক সার ও যথোপযুক্ত (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত) জলসেচ একান্ত আবশ্যক। এর অর্থ হল যে সব অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে সে সব অঞ্চলে এই বীজ প্রয়োগ করার জন্য দরকার গভীর নলকূপ। শুষ্ক অঞ্চলে এই বীজ প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন খালজল সেচব্যবস্থা। এই নতুন বীজসঞ্জাত গাছগুলির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণ গাছগুলির তুলনায় অনেক কম। সেই কারণে এই বীজগুলি থেকে কাঙ্ক্ষিত হারে ফসল পেতে হলে নিয়মিত সঠিক পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করাও আবশ্যক। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহজলভ্য না হলে চাষীদের পক্ষে বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, নলকূপ ইত্যাদি কেনা বা ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কঋণ সহজলভ্য হলে ভাদুড়ি যে সমস্যার কথা বলেছেন সে সমস্যাও থাকবে না। বর্গাদাররা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে জমিদারের ঋণ শোধ করে দেবে। জমিদারদের খাজনা ছাড়া অন্য কোনো আয়ের উৎস থাকবে না, সুতরাং তাঁরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উৎসাহী হবেন। এছাড়া, এই প্রযুক্তিতে যেহেতু শিল্পজাত দ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি কিনতে অর্থের প্রয়োজন হয়, সেহেতু এই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদনের একটি অংশ বাজারে বিক্রী করতেই হবে। অতএব, চাষীরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আগ্রহী হবে কেবলমাত্র যদি উৎপাদনক্ষেত্র এবং কৃষিপণ্যের প্রধান বাজারগুলির মধ্যে যথোপযুক্ত রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে।

যখন নতুন জমি চাষের আওতায় আনা আর সম্ভব নয় তখন কৃষির উৎপাদন কি হারে বৃদ্ধি পাবে তা স্বভাবতঃই নির্ভর করবে নতুন প্রযুক্তির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার হারের উপর। আবার এই প্রযুক্তি কি হারে ছড়িয়ে পড়বে তা নির্ভর করবে পরিকাঠামোগুলি অর্থাৎ, রাস্তাঘাট, ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, শুষ্ক অঞ্চলে খালসেচ

ব্যবস্থা এবং অধিক বৃষ্টিশীল অঞ্চলে বন্যানিরোধক এবং জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা কি হারে প্রসারিত হয় তার উপর। স্পষ্টতই এই পরিকাঠামোগুলির ব্যবস্থা মূলত সরকারকেই করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ এই পরিকাঠামোগুলির অনেকগুলিই যেমন খালজলসেচ ব্যবস্থা, রাস্তা ইত্যাদি খুব ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। অতএব, বেসরকারী সংস্থাগুলি এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে খুব একটা আগ্রহী হবে না।

১৯৬৫ সালের পর সরকার কিছু সময়ের জন্য (দশ বছরের মতো) কৃষিতে বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে দেন। ১৯৬৯-এর পর থেকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা বাড়তে থাকে অত্যন্ত দ্রুত হারে। কিন্তু যেহেতু এই ব্যবস্থাগুলি গড়ে তুলতে অনেক সময় লাগে এবং যেহেতু কৃষিপরিকাঠামোয় সরকারী বিনিয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়েনি সেহেতু বেশীর ভাগ অঞ্চলের জন্যই অত্যাবশক পরিকাঠামোগুলি গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় নি। এই কারণে প্রারম্ভিক যুগে যে সব অঞ্চলে জলবায়ু কৃষির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল এবং যে সব অঞ্চলে আবশ্যক পরিকাঠামোগুলি আগের থেকেই ছিল, সেই সব অঞ্চলেই সবুজ বিপ্লব আবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলগুলি হল পাঞ্জাব, হরিয়ানা পশ্চিম উত্তর প্রদেশ।

৫০.৪.৪ কৃষির বিকাশ (১৯৮০-১৯৯০)

এই সময়টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : ১৯৮০-১৯৯০ এবং ১৯৯০-১৯৯৯। প্রথম ভাগটিকে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ বিপ্লবের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ১৯৮০-১৯৯০ এই সময়কালে সবুজ বিপ্লবের নতুন প্রযুক্তি সমস্ত অঞ্চলে, সমস্ত শ্রেণীর কৃষক ও বর্গাদারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ফলে কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার বেড়ে গিয়ে হয় ৩.৪ শতাংশ যা সবুজ বিপ্লবের প্রারম্ভিক কালের কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় প্রায় এক শতাংশ বেশী। শুধু তাই নয়, এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রায় পুরোটাই ঘটেছিল জমির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার দরুন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০, এই সময়ে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের দুটি কারণ আছে। প্রথমত ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫, এই সময় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এর ফলে কৃষি পরিকাঠামোয় সরকারী বিনিয়োগ বেড়েছিল দ্রুত হারে। যদিও ১৯৭৫ থেকে কৃষির গুরুত্ব এবং কৃষি বিনিয়োগের হার আবার কমে যায় তবুও সরকারী বিনিয়োগের ফলে প্রায় সব অঞ্চলেই ১৯৮০-১৯৯০—এই সময়ের মধ্যে আবশ্যক পরিকাঠামো তৈরী হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় শিল্পে উৎপাদন উচ্চ হারে বেড়েছিল। শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির গড় শতকরা হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। এর ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল দ্রুত গতিতে, এবং কৃষিপণ্যের দাম শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশী হারে বেড়েছিল। ফলত কৃষির উৎপাদনে লাভের হার ক্রমাগত বেড়েছিল। এই দুই কারণেই নতুন প্রযুক্তি বা সবুজ বিপ্লব সব অঞ্চলে এবং সব শ্রেণীর কৃষকের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

যেহেতু সবুজ বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্বে শুধুমাত্র বড় ধনতান্ত্রিক কৃষকেরাই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন সেহেতু বড় খামারের উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল। এই কারণে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও জমির উৎপাদনক্ষমতার মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক প্রাক্ সবুজ বিপ্লব যুগে দেখা গিয়েছিল তা এই সময় বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ এই সময়ে যখন সব শ্রেণীর কৃষকের পক্ষেই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা সম্ভব হল তখন আবার ভারতীয় কৃষিতে এই বিপরীতমুখী সম্পর্কের পুনর্স্থাপন হল।

৫০.৪.৫ কৃষির বিকাশ (১৯৯১-৯৯)

আশির দশকের তুলনায় নব্বইয়ের দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ৩.৪ শতাংশ থেকে অনেকটা কমে যায়। বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার যা আগের দশকে ৩.৫ শতাংশ ছিল, তা কমে গিয়ে হয় ১.৭ শতাংশ, অর্থাৎ কোনোমতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের সাথে সমান। নব্বই-এর দশকে কৃষি পরিকাঠামোর উন্নয়নের হার ছিল অত্যন্ত কম। মূলত এই জনই কৃষিউৎপাদনের বৃদ্ধির হারও ছিল অত্যন্ত মন্থর। সারণি — ২.১-এ বিভিন্ন দশকে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হারগুলি দেখানো হল। এর থেকে ১৯৮০-র দশকের তুলনায় ১৯৯০-র দশক ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে কতখানি নিরাশাব্যঞ্জক তা বোঝা যাবে।

সারণি — ২.১

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক শতকরা হার

	চাল	গম	তৈলবীজ	তুলো	ডাল
ষাটের দশক	২.০	৮.০	৩.২	-১.৫	-০.৭
সত্তরের দশক	২.৪	৪.৩	-০.২	৩.৮	-১.১
আশির দশক	৩.৩	৪.৩	৭.১	৩.৪	৩.০
নব্বইয়ের দশক (১৯৯০-৯৭)	১.৪	২.৮	২.৮	৪.৮	-১.০

অনুশীলনী — ২

১। সবুজ বিপ্লবের প্রারম্ভিক যুগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হয় নি কেন?

২। ১৯৮০-১৯৯০-এর সময়কালে সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের কারণ কী?

৩। ১৯৯০-এর পর কৃষিউন্নয়নের গতি কেন মন্থর হয়ে যায়?

৫০.৫ আন্তঃবর্গীয় পণ্য বিনিময়ের শর্ত

ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শস্যের মূল্য বেশী রাখা এবং পণ্য বিনিময়ের শর্ত শিল্পের তুলনায় কৃষির অনুকূলে নিয়ে আসার যে নীতি উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা সমর্থন করেন তা ভালো করে বিচার করা প্রয়োজন। এই নীতির ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শস্য উৎপাদক — যাঁদের বাজারে বিক্রী করার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ফসল থাকে, তাঁরাই বেশী লাভবান হন। আগেই বলা হয়েছে যে ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের অনেককেই বাজার থেকে বেশ কিছুটা খাদ্যশস্য কিনে সারা বছরের সংস্থান করতে হয়। আর কৃষি শ্রমিকরাও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ানোতে ক্ষতিগ্রস্থ হন কারণ তাঁদেরও বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনতে হয় এবং তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। সুতরাং সব মিলিয়ে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুন গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর কৃষিজ পণ্যের দাম, কৃষির বাইরে তৈরী অন্য পণ্যের তুলনায়, বাড়লেই যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এই মতের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্যগত প্রমাণও নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য (Procurement price) বাড়িয়ে যাওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত দেশে মুদ্রাস্ফীতির একটি কারণ। খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে সমস্ত জিনিসের দামই বেড়ে যাবার প্রবণতা থাকে।

৫০.৬ সারাংশ

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কৃষি একেবারেই অনুন্নত ছিল। উৎপাদন ছিল স্থির। জমির মালিকানা বহু স্তরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করতেন কৃষিকার্যে তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে চাষের কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন জমির উপর তাঁদের কোন অধিকার ছিল না এবং তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। জমির উৎপাদনের সিংহভাগই জমির অকৃষক মালিকদের হাতে চলে যেত।

এই অন্যায্য কৃষিকাঠামো পরিবর্তন করার জন্য সরকার স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। তথাপি স্বাধীনতার পরে প্রথম তিনটি পরিকল্পনার কালে (১৯৫০-৬৫) কৃষি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সময় শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শ্রমিকদের খাদ্যের জন্য চাহিদা বেড়েছিল। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো লাভজনক হয়েছিল। জমির মালিকরা নতুন নতুন জমি চাষের আওতায় এনে উৎপাদন বাড়িয়ে ছিলেন।

ষাটের দশকের শুরু থেকে কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে যায়, কারণ চাষের আওতায় নিয়ে আসার মতো নতুন জমির যোগান প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৬৫

সালে কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন করা হয়। এই প্রযুক্তির কেন্দ্রে ছিল উচ্চ ফলনশীল সঙ্কর বীজ। এই নতুন প্রযুক্তি ভারতীয় কৃষিতে যে অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তাকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়।

প্রথম পনেরো বছরে (১৯৬৫-৮০) সবুজ বিপ্লব খুব একটা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। পরের দশ বছর (১৯৮০-৯০) সবুজ বিপ্লবের স্বর্ণযুগ। এই সময় সবুজ বিপ্লব দেশের সমস্ত অঞ্চলে, সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে এবং সমস্ত শস্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু ১৯৯০-এর পর কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধির হার আবার শ্লথ হয়ে আসে। এর প্রধান কারণ হল কৃষি পরিকাঠামোয় যথেষ্ট বিনিয়োগে সরকারের ব্যর্থতা।

৫০.৭ অনুশীলনী

১। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের কৌশল কী ছিল?

২। উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণে জমিদারদের অনাগ্রহের কোনও কারণ আছে কী? ভাদুড়ির তত্ত্বের আলোকে এই প্রশ্নটির উত্তর আলোচনা করুন।

৩। ভারতীয় কৃষিতে বেকারত্বের স্বরূপ আলোচনা করুন।

৫০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Rao, M. J. and Storm, S. (1998) 'Distribution and Growth in Indian Agriculture' in Byres, J. T (ed) *The Indian Economy,* Oxford Univeristy Press, Delhi.

২। Pursell, G. and Gulati, A. (1995) :. 'Liberalizing Indian Agriculture : An Agenda for Reform' in Cassen, R. and Joshi, V. (eds) *India,* Oxford Univeristy Press, Delhi.

৩। ড. গৌতম কুমার সরকার : *ভারতের আর্থিক বিকাশ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,* জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯।

একক ৫১ □ ভারতের শিল্পোন্নয়ন

গঠন

৫১.০ উদ্দেশ্য

৫১.১ প্রস্তাবনা

৫১.২ পরিকল্পনাধীন সময়কালে শিল্পায়ন (১৯৫১-১৯৬৫)

৫১.৩ শিল্পোন্নয়নে মন্দা (Industrial Deceleration 1965-1980) (১৯৬৫-১৯৮০)

৫১.৪ শিল্পোন্নয়ন (১৯৮০-১৯৯০)

৫১.৫ শিল্পোন্নয়ন (১৯৯০-২০০০)

৫১.৬ সারাংশ

৫১.৭ অনুশীলনী

৫১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫১.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি থেকে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পুরনো নীতি কি ছিল এবং এই নীতি প্রয়োগের ফলে শিল্পোন্নয়ন কী হারে হয়েছিল তা জানা যাবে।
- ১৯৯০-৯১-এ ভারতে বৈদেশিক লেনদেনের যে তীব্রসংকট হয় তার জন্য পুরনো নীতি কতখানি দায়ী তার ধারণা পাওয়া যাবে।
- ভারতের বর্তমান শিল্পনীতি কী এবং কেনই বা এই নীতি গ্রহণ করা হল তা অনুধাবন করা সম্ভবপর হবে।
- বর্তমানে ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রধান অন্তরায় কী তা অনুমান করা যাবে।

৫১.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার সময় ভারতের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। দেশে শিল্পের ভিত্তি ছিল দুর্বল, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার খুব কম এবং পরিকাঠামোর অভাব অত্যন্ত প্রকট। আয়ের বৈষম্যও ছিল উদগ্র এবং কর্মহীনতার সমস্যা তীব্র। স্বভাবতই অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কারের জন্য শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে এবং বেসরকারী শিল্পপতিদের সীমিত সামর্থ্য ও উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

দেশের শিল্পক্ষেত্রে গঠন, পরিকল্পনাধীন সময়কালে শিল্পের কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প পরিকাঠামোর অবস্থা ও সংস্কার এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পের প্রকৃতি ও সমস্যার একটি চালচিত্র এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫১.২ পরিকল্পনাধীন সময়কালে শিল্পায়ন (১৯৫১-১৯৬৫)

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে ভারতবর্ষের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের শিল্প খুবই ক্ষুদ্র ও অনুন্নত ছিল। শিল্প-উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসত মাত্র কয়েকটি শিল্প থেকে। এই শিল্পগুলি হল সূতী ও বস্ত্র, পাট, চিনি ও ভেষজ ভোজ্য তেল (Vegetable oil)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে নীতি গ্রহণ করা হয় তা মূলত মহালানবিশ নীতি নামে পরিচিত। এই নীতিতে ভারী ও মূল শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। পরিকল্পনাকারদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে একটি 'স্বনির্ভর' অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলা। পরিকল্পনাকাররা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন যা নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম দ্রব্য ও পরিষেবা তৈরী করতে সক্ষম। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ভারতে ব্যবহৃত শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত।

এই স্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্যই ভারী শিল্প গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। ভারী শিল্প বলতে সেই শিল্পকে বোঝায় যে শিল্প ভোগ্য ও অন্তর্বর্তী দ্রব্য (intermediate goods) বা শিল্প-উপকরণ তৈরী করার যন্ত্র নির্মাণ করে। স্বভাবতই ভারী শিল্প গড়ে তুলতে পারা মানেই সমস্ত রকম ভোগ্য, অন্তর্বর্তী দ্রব্য, ও মূলধনী দ্রব্য তৈরী করার ক্ষমতা বা 'স্বনির্ভরতা' অর্জন করা।

মহালানবিশ নীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারী শিল্প যত শীঘ্র সম্ভব গড়ে তোলা। এর জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সিংহভাগ যাতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। এই জন্য দুটি নীতি গ্রহণ করা হয়— বিনিয়োগ-লাইসেন্সিং এবং প্রত্যক্ষ সরকারী বিনিয়োগ (direct public investment)।

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনও বিনিয়োগকারীকে শিল্পে বিনিয়োগ করতে হলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি বা বিনিয়োগ-লাইসেন্স নিতে হত। এই পদ্ধতির সাহায্যে সরকার কোনও শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ যাতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেটা সুনিশ্চিত করতেন। দ্বিতীয়োক্ত নীতিতে কোনো শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে সরকার সরাসরিভাবে সেই শিল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেন। এই দুই নীতি বা পদ্ধতির সাহায্যে সরকার পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ করার জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের যে কাম্য বণ্টন প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতেন।

ভারী শিল্প গড়ে তোলার প্রযুক্তি ভারতের ছিল না। এই শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক সম্পদের (external resources) একটি কাম্য বণ্টন প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, ভারতের বৈদেশিক সম্পদের সিংহভাগ যাতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করার দরকার ছিল। এর জন্য সরকার আমদানী লাইসেন্সিং নীতি গ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক সম্পদের উপর যাতে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে সেজন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে রপ্তানিকারকদের এবং অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা প্রাপকদের সমস্ত বিদেশী মুদ্রা সরকারকে দিয়ে দিতে হত। সরকার বিদেশী মুদ্রার বদলে নির্ধারিত হারে টাকা দিতেন। আমদানী লাইসেন্সিং নীতিতে যে কোনো দ্রব্য আমদানি করতে হলে সরকারের কাছ থেকে আমদানি লাইসেন্স নিতে হত। এইভাবে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার উপযুক্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করতেন।

ভারী শিল্পের কোন বাজার সেই সময় ভারতে ছিল না। শিল্প অনেক উন্নত না হলে এবং শিল্প খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি না পেলে ভারী শিল্পের বাজার তৈরী হয় না। আগেই বলা হয়েছে, সেই সময় ভারতীয় শিল্প ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং শিল্পের বৃদ্ধির হারও ছিল খুব কম। এই সব কারণে বেসরকারী শিল্পপতিরা ভারী শিল্প স্থাপনে কোন আগ্রহ দেখান নি। পরিকল্পনাকাররা স্থির করেন যে ভারী শিল্প সরকারী উদ্যোগেই গড়ে উঠবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সময় শিল্পে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ হতে থাকে, ফলে শিল্পের দ্রুত হারে সম্প্রসারণ ঘটে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে বার্ষিক উন্নয়নের হার ছিল যথাক্রমে ৬.০, ৭.৮ এবং ৮.০ শতাংশ। ভারীশিল্পের প্রসারের হার অবশ্য অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ছিল অনেক বেশী।

৫১.৩ শিল্পোন্নয়নে মন্দা : (১৯৬৫-১৯৮০) (Industrial Deceleration 1965-1980)

১৯৬৫ পর্যন্ত সময়কালে শিল্প-উৎপাদনের সাথে সাথে শিল্প-শ্রমিকদের আয় ও সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে। বাড়তে থাকে তাদের খাদ্যের চাহিদাও। খাদ্যের উৎপাদন কিন্তু চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে পারে

নি। যেহেতু বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সিংহভাগ ব্যয়িত হত শিল্পায়নের জন্য, সেই কারণে কৃষিতে বিনিয়োগ বড় একটা হয়নি, কৃষি পরিকাঠামোও বিস্তার লাভ করতে পারে নি এবং কৃষিপ্রযুক্তিও উন্নত হয়নি। এই সময় খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই বৃদ্ধি ঘটেছিল নতুন নতুন জমিতে চাষের বিস্তারের ফলে। জমির উৎপাদনক্ষমতা তেমন বাড়েনি। খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান তৈরী হয়েছিল তা মেটানো হয়েছিল আমদানির সাহায্যে। ভারত এই সময় প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল। ভারতের সাথে আমেরিকার পি. এল-৪৮০ চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির আওতায় প্রচুর খাদ্যশস্য আমেরিকা ভারতে সাহায্য হিসাবে পাঠাত। এই কারণে এই সময় দেশে খাদ্যের উৎপাদন কম হলেও খাদ্যের মোট যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল কম। সমস্যা প্রধানত শুরু হল ১৯৬৫ সাল থেকে। এই বছর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল ব্যয়বৃদ্ধি হয়, এবং যোজনাধীন বিনিয়োগের সঙ্কোচন হয়, যার দরুন শিল্পক্ষেত্রে (ও কৃষিতে) লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যায় নি। এদিকে ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-১৯৬৮ এই তিনটি বছর ছিল খরার বছর। শুধু তাই নয়, ষাটের দশকের শুরু থেকেই খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে চাষের আওতায় আনার মত নতুন জমির যোগান প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই সব কারণে ১৯৬৫ থেকে খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান সৃষ্ট হয়। খাদ্যের দাম বেড়ে যেতে থাকে দ্রুত হারে। সরকার খাদ্যের দাম কমিয়ে আনার জন্য বিনিয়োগ প্রচুর পরিমাণে কমিয়ে দেয় যাতে শিল্পের প্রগতির হার এবং তার ফলে খাদ্যের চাহিদার বৃদ্ধির হারও কমে যায়। সরকারী বিনিয়োগ কমে গেলে বেসরকারী শিল্পের পণ্যের জন্য চাহিদা কমে যায়। কমে যায় অত্যাবশ্যক পরিকাঠামোগত কাঁচামালের ভবিষ্যৎ যোগানও। এই দুই কারণেই বেসরকারী বিনিয়োগের লাভ কমে যায়। অতএব, সরকারী বিনিয়োগের সাথে সাথে বেসরকারী বিনিয়োগও ১৯৬৫'র পর কমে যায় বহুল পরিমাণে। এর ফলে ১৯৬৫'র পর থেকে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার অনেকখানি হ্রাস পায়।

সত্তরের দশকে সরকার সঙ্কোচনধর্মী নীতিই (contractionary policy) অবলম্বন করেছিলেন। এর কারণ ছিল ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সালে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। Organization of Petrolcum Exporting Countries (OPEC) গঠনের পর পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলি খনিজ তেলের দাম ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলেছিল। যেহেতু তেল ভারতের প্রধান আমদানি পণ্য সেহেতু তেলের দাম অনেকটা বেড়ে গেলে ভারতে বৈদেশিক লেনদেন (balance of payments)-এর তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই কারণে সরকার সঙ্কোচনধর্মী নীতি অবলম্বন করেছিলেন যাতে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার এবং তার ফলে তেলের চাহিদার বৃদ্ধির হার কম থাকে। গোটা সত্তরের দশক জুড়ে সঙ্কোচনধর্মী নীতির ফলে শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ এবং তার ফলে শিল্পোৎপাদন খুব শ্লথ গতিতে বেড়েছিল। ১৯৬৫-১৯৮০-এই সময়ে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ যা আগের পনেরো বছরের বৃদ্ধির হারের তুলনায় ৩.৮ শতাংশ কম।

অনুশীলনী—১

১। মহালানবিশ নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৫০-৬৫ এই সময়কালে ভারতে শিল্পোন্নয়ন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?

২। ১৯৬৫-৮০—এই সময়ে শিল্পে যে মন্দা হয় তার কারণগুলি কী?

৫১.৪ শিল্পোন্নয়ন : (১৯৮০-১৯৯০)

সত্তরের দশকে সঙ্কোচনধর্মী নীতি এবং কঠোর আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে আমদানি বৃদ্ধির হার কম ছিল। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে মন্দা, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেজী অবস্থা থাকার ফলে রপ্তানী বেড়েছিল দ্রুত গতিতে। এই কারণে পর পর দুবার তেলের দাম অনেকটা বাড়লেও ভারতকে কোন বৈদেশিক লেনদেনের সঙ্কটে পড়তে হয়নি। বরং আশির দশকের শুরুতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল। দু'দুবার তেলের দাম বৃদ্ধির ধাক্কা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার ফলে ভারত সরকারের মনোবল বেড়ে যায় অনেকখানি এবং সরকারী নীতি সম্প্রসারণধর্মী (expansionary) হয়ে ওঠে।

গোটা আশির দশক জুড়ে সরকারী ভোগ ব্যয়, বিশেষতঃ সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বেড়েছিল দ্রুত হারে। বস্তুত এই দশকে সরকারী কর্মচারীদের প্রকৃত আয় দুগুণের বেশী বেড়ে গিয়েছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রতিযোগিতার ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে (organized sector-এ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের প্রকৃত আয় ৮০-র দশকে প্রায় ষাট শতাংশ বেড়ে যায়। এর ফলে এই সময়ে ভোগ্য দ্রব্যের জন্য চাহিদাও বেড়েছিল দ্রুত হারে। অন্য দিকে, মূলধন ও অন্তর্বর্তী দ্রব্যের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। এর দরুন উৎপাদকরা নানা ধরনের আধুনিক শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্তর্বর্তী দ্রব্য আমদানি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুই কারণেই আশির দশকে শিল্পোৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৭.৮ শতাংশ।

১৯৫০-৬৫ এবং ১৯৮০-৯০ এই দুই সময়কালেই শিল্পোন্নয়ন দ্রুত হারে হলেও শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি এই দুই সময়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। প্রথম কালে শিল্পপ্রসারের প্রথম সারিতে ছিল ভারী শিল্প যার উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ২০ শতাংশেরও বেশী। দ্বিতীয় কালের শিল্পোন্নয়নে প্রধান ভূমিকা ছিল ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের বিশেষত স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (consumer durables) শিল্পের।

এই শিল্পোন্নয়নের গতি কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎই। ১৯৯০-৯১ সালে সৃষ্টি হল বৈদেশিক লেনদেনের তীব্র সঙ্কট। আমদানির উপর জারি হল কঠোর নিষেধাজ্ঞা, এবং সরকার তীব্র সঙ্কোচনধর্মী নীতি গ্রহণ করলেন। এর ফলে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার ৯০-৯১ সালে ঋণাত্মক হয়ে গেল।

অনুশীলনী—২

১। আশির দশকের শিল্পোৎপাদন কী হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল? এর কারণ কী?

২। আশির দশকের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে ১৯৫০-৬৫ সময়কালের শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতিগত পার্থক্য কী?

৫১.৫ শিল্পোন্নয়ন : (১৯৯০-২০০০)

এই দশক উন্নয়নের নতুন নীতির বা উদার নীতির দশক। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি নতুন এবং প্রায় আমূল পরিবর্তিত শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতির মূলমন্ত্র ছিল শিল্পক্ষেত্রে মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা। নতুন নীতি শিল্পপতিদের সামনে অনেক সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল। বিনিয়োগ, আমদানি, জিনিসপত্রের দাম, বৈদেশিক বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রভূত পরিমাণে শিথিল করে দেওয়া হয়। এর ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের বহু লাভজনক ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। নতুন শিল্পনীতি চালু হওয়ার পর প্রথম দুটি বছর প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের জন্য শিল্প বিকাশের হার মন্থর হলেও পরের দিকে এই হার অনেকটা ত্বরান্বিত হয়।

শিল্পের এই তেজী অবস্থা ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ থেকেই শিল্পে মন্দা শুরু হয়ে যায়। এই মন্দার একাধিক কারণ ছিল। শিল্পকে আমরা দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করতে পারি, পরিকাঠামো ক্ষেত্র (infrastructural sector) এবং অপরিকাঠামো ক্ষেত্র (noninfrastructural sector)। পরিকাঠামো বলতে সেই সব মূলধনী সম্পদকে বোঝায় যেগুলি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ও সেবামূলক কাজের আদান প্রদানে এবং সমগ্র সমাজের উপকারে লাগে। এগুলিকে স্থায়ী সামাজিক পরিসম্পতও (social overhead capital) বলা হয়ে থাকে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্প রয়েছে সেগুলি হল রাস্তাঘাট, সেতু, নিষ্কাশন ব্যবস্থা (drainage), পানীয় জল, বন্যানিরোধক ব্যবস্থা, জলসেচ-ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, বন্দর, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি। অন্যান্য শিল্পগুলি অপরিকাঠামোক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক প্রগতির জন্য পরিকাঠামো গঠনের মুখ্য ভূমিকা আছে। শিল্প বিকাশ (বিশেষত অনুন্নত অঞ্চলে) বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। ভারতে পরিকাঠামোর ৯০ শতাংশ বিনিয়োগ সরকারই করেন। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে মুনাফা অভিলাষী বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও উদ্যোগের সম্ভাবনা স্বভাবতই সীমিত হওয়ায় সরকারকেই মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

বেশীর ভাগ পরিকাঠামো দ্রব্যের ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় (gestation lag) খুব দীর্ঘ এবং ব্যয় খুবই বেশী। এর ফলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা এই ধরনের বিনিয়োগকে খুব একটা লাভজনক বলে মনে করেন না।

এছাড়াও আছে সমন্বয় সাধন (co-ordination)-এর সমস্যা। পরিকাঠামো-দ্রব্যগুলি অপরিকাঠামো দ্রব্যের উৎপাদনের অত্যাবশ্যক উপাদান। পরিকাঠামোয় যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ না হলে এগুলির যোগান ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না, এবং অপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগও লাভজনক হয় না। অন্যদিকে, অপরিকাঠামো-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না হলে পরিকাঠামো-দ্রব্যের চাহিদা ভবিষ্যতে বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ লাভজনক হয় না। এই কারণে বিনিয়োগকারীরা যদি দেখেন যে পরিকাঠামোয় যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ হচ্ছে না তাহলে তাঁরা অপরিকাঠামো-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে খুব একটা উৎসাহ পান না। আবার অপরিকাঠামো-ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ না হতে দেখলে বিনিয়োগকারীরা পরিকাঠামোতেও বিনিয়োগ করা লাভজনক বলে মনে করেন না। এর ফলে কোনও ক্ষেত্রেই উপযুক্ত বিনিয়োগ হয় না। সরকার পরিকাঠামো-ক্ষেত্রে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ না করেন তাহলে এই সমস্যার উদ্ভব হতেই পারে। ভারতের শিল্পোন্নয়নে পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী (দেশী ও বিদেশী) উদ্যোগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনাতেই (১৯৯২-৯৩-১৯৯৬/৯৭) সর্বপ্রথম এটি নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। বস্তুতঃ পরিকাঠামোর-ক্ষেত্রে সার্বিক দুর্বলতা নিরসনে অর্থনৈতিক দিক থেকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের একাধারে সম্পূরক এবং প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকা থাকাই কাম্য।

পরিকাঠামোর প্রায় সব ক্ষেত্রেই অধুনা বেসরকারী-উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে, নিছক আর্থিক লাভক্ষতি বিবেচনা না করে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য সরকারও সচেষ্ট হয়েছেন। এই পটভূমিতে মূলত প্রয়োজন, পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, উন্নত পরিচালন ব্যবস্থা, যতদূর সম্ভব একটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এবং বেসরকারী বিনিয়োগকে ঋণদান ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহিত করা। তবে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং মূলধনের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে পরিকাঠামো ব্যবস্থার কর্মদক্ষতায় উন্নতিসাধন বিশেষ আবশ্যক। তাছাড়া, ফিস্‌কাল ঘাটতির কথা মনে রেখে পরিকাঠামো সংক্রান্ত পরিষেবার মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে পরিকাঠামো

গঠনে লগ্নী অলাভজনক না হয়ে দাঁড়ায়। রেলপথ, সড়কপথ ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা বিস্তর।

নব্বইয়ের দশকে নতুন উন্নয়নের নীতিতে সরকারের ফিস্‌ক্যাল-ঘাটতির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সরকার ফিসক্যাল ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন পরিকাঠামোয় নিজের বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়ে। কিন্তু পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের উপর বাধা নিষেধ অনেকাংশে শিথিল করে দেওয়া সত্ত্বেও বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা খুব একটা উৎসাহ দেখান নি। অন্য দিকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ফলে অপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত পরিকাঠামো দ্রব্যের যোগানের অভাব সেভাবে অনুভূত হয় নি, কিন্তু তার পর থেকেই পরিকাঠামো দ্রব্যের যোগানের অভাবের জন্য অপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস, পায় এবং ভারতীয় শিল্পে মন্দা শুরু হয়। পরিকল্পনাধীন সময়কালে নিঃসন্দেহে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। মোটামুটি বলা চলে যে পরিকল্পনাধীন সময়কালে শিল্পবিকাশের গড় হার ছিল ৬ শতাংশের মতো। তাছাড়া যোজনাকালে শিল্পপণ্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ১৯৫০-৫১ সালে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনে ভোগ্যপণ্যের অনুপাত ছিল প্রায় অর্ধেকের মতো; বর্তমানে এই অনুপাত দুই পঞ্চমাংশের বেশী নয়। অনুরূপভাবে, মূলধনী দ্রব্যের অনুপাত ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ভারত এখন শিল্পক্ষেত্রে অনেকটাই স্বনির্ভর হয়েছে এবং নানা দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতা অনেকটা কমেছে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে সাম্প্রতিককালে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার দেশে মোট শিল্প উৎপাদনের হারের থেকে বেশী। অর্থাৎ দেশের মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ক্রমশ বেড়েছে। পরিকল্পনার শুরু থেকেই ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে উন্নতির প্রতি নজর দেওয়া হয়। পরিকল্পনাধীন সময়কালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে নানা ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সবের ফলে যোজনাধীন সময়ে ক্ষুদ্র শিল্পের অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে তা অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। তবে খুব সম্প্রতি বেশ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে নয়তো রুগ্ন হয়ে পড়েছে।

৫১.৬ সারাংশ

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে ভারতের শিল্প ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং অনগ্রসর। ভারতের শিল্পোন্নয়ন শুরু হয় প্রধানত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে। এই সময়ে শিল্পোন্নয়নের যে নীতি গ্রহণ করা হয় তাকে মহালানবিশ নীতি বলা হয়। 'স্ব-নির্ভরতা' অর্জনের জন্য এই নীতিতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার উপরে জোর দেওয়া হয়।

দেশের সম্পদের সিংহভাগ যাতে পরিকল্পিত খাতে ব্যয়িত হয় সে জন্য বিনিয়োগ ও আমদানি সংক্রান্ত লাইসেন্সিং-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার পূরণ সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার নিজে শিল্পে সরাসরি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। শিল্পায়নে সরকারের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে (১৯৫০-৬৫) বহুল পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়। এই সময় শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৭.৮ শতাংশ।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ঘটে এবং ১৯৬৬ সাল থেকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের যোগান অপ্রতুল হয়ে ওঠে। সত্তরের দশকে খনিজ-তেল রপ্তানিকারক দেশগুলি (OPEC) তেলের দাম অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে এই সময়ে সরকার সংকোচনধর্মী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন। এই সব কারণে ১৯৬৫-৮০-র সময়কালে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার কমে যায় ৪ শতাংশ। বস্তুত ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০-র বছরগুলিকে ভারতের শিল্প (এবং অর্থনীতি)-র ক্ষেত্রে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলা চলতে পারে।

তবে পর পর দুবার তেলের দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতকে তেমন কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনের সঙ্কটে পড়তে হয় নি। আশির দশকে সরকার প্রসারণধর্মী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে শিল্পোৎপাদনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার আশির দশকে বেড়ে গিয়ে হয় ৭.৮ শতাংশ।

১৯৯১ সালে সরকার এক নতুন এবং উদার শিল্পনীতি ও অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতিতে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেওয়ার ফলে অনেক নতুন বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। এর ফলে ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে শিল্পোৎপাদন দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ থেকে পরিকাঠামো দ্রব্যের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে ও শিল্পে আবার মন্দা দেখা যায়। যোজনাধীন সময়কালে দেশে শিল্পপণ্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে মোট শিল্পোৎপাদনে ভোগ্যপণ্যের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের অনুপাত বেড়েছে। তা ছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। শিল্প বিকাশের সামগ্রিক হারের থেকে ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশের হার অনেকটা বেশী হওয়ায় দেশের মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ক্রমশ বেড়েছে।

৫১.৭ অনুশীলনী

১। শিল্পোন্নয়নের মহালানবিশ নীতির বৈশিষ্ট্য কী?

২। নব্বইয়ের দশকে শিল্পে মন্দা অবস্থার কারণ কী?

৩। পরিকাঠামোর বেসরকারী বিনিয়োগের অন্তরায়গুলি কী কী?

৪। পরিকল্পনাধীন সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

৫১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. গৌতম কুমার সরকার : *ভারতের আর্থিক বিকাশ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা-৯।

২। Ahluwalia, I. J. and Little, I. M. D. (1998) : *India's Economic Reforms and Development : Essays for Manmohan Singh,* OUP, Delhi.

৩। Chattopadhyay, M. Maiti, P. and Rakshit, M (1996) : *Planning and Economic Policy in India* ; Sage Publication (Delhi).

৪। Bhattacharya Dhires (1999), *India's Five Year Plans,* Joydurga Library (Calcutta).

একক ৫২ □ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গঠন

৫২.০ উদ্দেশ্য

৫২.১ প্রস্তাবনা

৫২.২ ভারতের অর্থনীতিতে আমদানির কাঠামো

৫২.৩ ভারতবর্ষের রপ্তানী : কাঠামো সমস্যা ও সম্ভাবনা

৫২.৩.১ রপ্তানির কাঠামো

৫২.৩.২ রপ্তানিবৃদ্ধির হার শ্লথ হওয়ার কারণ

৫২.৩.৩ পুরনো বাণিজ্যনীতি ও রপ্তানি

৫২.৪ বৈদেশিক বিনিয়োগ

৫২.৫ সারাংশ

৫২.৬ অনুশীলনী

৫২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫২.০ উদ্দেশ্য

এই একক থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

- বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের অর্থব্যবস্থায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।
- ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য রপ্তানিবৃদ্ধির কতখানি প্রয়োজন এবং রপ্তানিবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়গুলি কী?
- বৈদেশিক বিনিয়োগ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কি?

৫২.১ প্রস্তাবনা

ভারতের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করতে পারে তাদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়— রপ্তানি সঞ্চালিত প্রগতির নীতি (export-led growth strategy) এবং স্বনির্ভর বা আমদানিসঙ্কোচক প্রগতির নীতি (import-substituting growth strategy)। যে দেশ প্রথম

নীতিটি অনুসরণ করে সেই দেশ শুধুমাত্র যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'তুলনামূলক সুবিধা' (comparative advantage) ভোগ করে, অর্থাৎ যে দ্রব্যগুলিকে অন্যান্য দেশের তুলনায় সস্তায় তৈরী করতে পারে, সেই সব দ্রব্যই উৎপাদন করে। এই দ্রব্যগুলির উদ্বৃত্ত অংশ রপ্তানি করে এবং রপ্তানিলব্ধ আয় দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করে। দ্বিতীয় নীতি অনুসরণকারী দেশসমূহ 'স্বনির্ভর' হতে বা বিদেশের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এই দেশগুলি সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সময়কাল পর্যন্ত, যে উন্নয়নের নীতি ভারত অনুসরণ করেছিল তা স্বনির্ভর প্রগতি এবং আমদানি পরিবর্ততার নীতি। মূলত ১৯৯১-এ এই নীতি পরিত্যাগ করে ভারত নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। নতুন নীতি বহুলাংশে রপ্তানিসঞ্চালিত উন্নয়নের নীতি। কেন হল অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে এই বিপরীতমুখী পরিবর্তন? স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশ্নের উত্তর এই এককে আলোচিত হয়েছে।

৫২.২ ভারতের অর্থনীতিতে আমদানির কাঠামো

ভারতের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব প্রভূত। এর কারণ হল আমাদের দেশের উৎপাদন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি অনেক অত্যাবশ্যক অন্তবর্তী দ্রব্য, (intermediate goods) (যাদের মধ্যে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, রাসায়নিক সার, খনিজ দ্রব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) মূলধনী দ্রব্য ও যন্ত্রাংশ আমদানির উপর নির্ভরশীল। অন্য যেসব আমদানি পণ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে নিউজপ্রিন্ট (newsprint), ঔষুধপত্র, ভোজ্যতেল ইত্যাদি। পরিকল্পনাকালে আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যশস্য, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, অ্যালুমিনিয়ম ও স্টীলের সামগ্রী ইত্যাদির গুরুত্ব কমেছে। বিশেষত, খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের তুলনায় বর্তমানে অনেক কম।

উৎপাদন ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে উচ্চ হারে বজায় রাখতে হলে আমদানিকে দ্রুত হারে বাড়াতে হবে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বেশী না হলে অর্থাৎ রপ্তানি বেশী না হলে আমদানি বেশী করা সম্ভব নয়। অতএব রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত হারে না বাড়াতে পারলে ভারতের মত দেশে জাতীয় আয় উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাবে না।

১৯৯০-৯১ সালে ভারত তীব্র বৈদেশিক লেনদেন (Balance of Payments)-এর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। দেশের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ শোধ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (IMF) ও বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank)-এর কাছ থেকে ঋণ ও সাহায্য চাইতে হয় এবং পরোক্ষত তাদেরই চাপে অর্থনৈতিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এই সমস্যার জন্য নতুন নীতির প্রবক্তরা দেশে রপ্তানী বৃদ্ধির শ্লথগতিকেই প্রধানত দায়ী করেন। আশির দশকে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৫.৬ শতাংশ, যা কিনা আগের দশকের তুলনায় অনেকটাই বেশী। এর ফলে আমদানিও বেড়েছিল দ্রুত

হারে। কিন্তু আমদানির সঙ্গে তাল রেখে রপ্তানি বাড়ে নি, আমদানির খরচা মেটানোর জন্য চড়া সুদে বৈদেশিক ঋণের বাজার থেকে বাণিজ্যিক ঋণ নিতে হয়েছিল। বৈদেশিক ঋণ গোটা আশির দশক জুড়ে বেড়েছিল দ্রুত হারে এবং তার সাথে বেড়েছিল বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ও সুদের বোঝা। এভাবেই সৃষ্টি হয় ব্যালেন্স অফ্ পেমেন্টের সঙ্কট। এই সঙ্কটের জন্য নতুন নীতির প্রবক্তরা মূলত রপ্তানির বৃদ্ধির শ্লথগতিকেই দায়ী করেন। বলা হয় যে রপ্তানির বৃদ্ধির হার এমনই শ্লথ ছিল যে জাতীয় আয়ের ৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য যে আমদানি প্রয়োজন তার ব্যয়ও বহন করা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

৫২.৩ ভারতবর্ষের রপ্তানি : কাঠামো, সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভারতের রপ্তানি পঞ্চাশের দশকে কিছুমাত্র বাড়ে নি। ষাটের দশকে রপ্তানি বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ৪ শতাংশ। ১৯৭০-৭৭—এই সময়কালে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল দ্রুত হারে। ডলারের অঙ্কে এই বৃদ্ধির বাৎসরিক গড় হার ছিল ১৭.৮ শতাংশ। পরের আট বছরে (১৯৭৮-৮৫) এই হার কমে দাঁড়ায় ৬.১ শতাংশে। ১৯৮৬-৮৭ থেকে ১৯৯৫-৯৬—এই সময়ে একমাত্র ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩—এই দুটি বছর বাদ দিয়ে প্রত্যেক বছরেরই রপ্তানির হার ছিল ৯ শতাংশের বেশী। পরের তিনটি বছরে রপ্তানিবৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম—যথাক্রমে ৫.৬, ২.১ ও ৪.৯ শতাংশ। সারণি ৪.১-এ নব্বইয়ের দশকে রপ্তানির ও আমদানির বৃদ্ধির শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি — ৪.১

ভারতে রপ্তানি ও আমদানি বৃদ্ধির শতকরা হার

বিষয়	১৯৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯
রপ্তানি বৃদ্ধির হার	–১.১	৩.৩	২০.২	১৮.৪	২০.৩	৫.৬	২.১	–৫.১
আমদানি বৃদ্ধির হার	–২৪.৫	১৫.৪	১০.০	৩৪.৩	২১.৬	২.১	৪.৪	০.৯
রপ্তানি (জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে)	৬.৭	৭.১	৮.১	৮.৯	৮.৬	৮.৬	৮.৩	
আমদানি (জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে)	৭.৭	৯.৪	৯.৬	১০.৯	১২.০	১২.৩	১২.২	

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সারা বিশ্বের মোট রপ্তানি কিন্তু অনেক বেশী হারে বেড়েছিল। এর ফলে পৃথিবীর সামগ্রিক রপ্তানিতে ভারতের রপ্তানির অনুপাত ক্রমাগত কমে যেতে থাকে। এই অনুপাত ১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৮০ ও ১৯৯৪-এ ছিল যথাক্রমে ২, ১, ০.৬, ০.৫ এবং ০.৬ শতাংশ। শুধু পৃথিবীর নয়, এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশ (বিশেষত হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার) তুলনায়ও ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কম ছিল।

৫২.৩.১ রপ্তানির কাঠামো

স্বাধীনতার পরের পঞ্চাশ বছরে রপ্তানির কাঠামোর বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তুলা, সুতা ও সূতীবস্ত্র, চা, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য ইত্যাদি। বর্তমানে ভারতের রপ্তানিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যগুলি হল সূতীবস্ত্র ও পোশাক, হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, রত্ন ও অলঙ্কার, ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট ও রাসায়নিক পণ্য, সামুদ্রিক দ্রব্য, প্রসেস করা খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। সম্প্রতি কম্পিউটারের Software, আঙ্গিক পরামর্শ (consultancy) ইত্যাদির রপ্তানিও বিশেষভাবে বেড়েছে।

৫২.৩.২ রপ্তানি বৃদ্ধির হার শ্লথ হওয়ার কারণ

রপ্তানি বৃদ্ধির হার শ্লথ হওয়ার কারণ হিসাবে নতুন নীতির প্রবক্তরা মূলত ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ভারতে সাধারণভাবে অনুসৃত অর্থনৈতিক এবং বিশেষত বাণিজ্য-নীতিকে দায়ী করেন। রপ্তানির পরিমাণের একটি প্রধান নির্ধারক হল রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়। নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রবক্তরা মনে করেন যে আগের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-নীতির দরুন ভারতে উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে যায়— এবং এটাই রপ্তানি বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। পুরনো নীতির ফলে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারেনি; দেশীয় উৎপাদকরা না স্বদেশী না বিদেশী— কোনো ধরনের প্রতিযোগিতারই সম্মুখীন হননি। প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে তাঁদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা (efficiency) অর্জন করার, উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করার বা প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গবেষণায় (R + D) বিনিয়োগ করার কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছা ছিল না।

তৎকালীন নীতির একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল আমদানি লাইশেন্সিং। দেশে আমদানি অবাধ ছিল না। কাউকে কিছু আমদানি করতে হলে লাইসেন্স নিতে হত। এই লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে নীতি অনুসরণ করতেন তা হল যেসব দ্রব্য দেশেই উৎপাদিত হত সেসব দ্রব্য আমদানি করতে দেওয়া হত না। এর ফলে দেশী উৎপাদকদের বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হত না।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment) ব্যাপারেও আইন এত কঠোর ছিল যে ১৯৯০-এর আগে ভারতে ঐ ধরনের বিনিয়োগ বিশেষ হয়নি বললেই চলে। এই সব কারণেই দেশীয় উৎপাদকরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। দেশের বাজারে তাঁদের টিকে থাকার জন্য বা মুনাফা উপার্জন করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করার দরকার ছিল না।

পুরনো নীতির শিল্পে বিনিয়োগের উপরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। শিল্পে বিনিয়োগ করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ভারতীয় শিল্প কয়েকটি বড় ব্যবসায়ী পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই সমস্ত পরিবারগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল অপরিসীম এবং তার ফলে রাজনৈতিক দল ও সরকারী কার্যকলাপের উপরও তাদের সমূহ প্রভাব ছিল। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁরা সরকারী লাইসেন্স-এর সিংহভাগ কুক্ষিগত করেছিলেন। অর্থাৎ, এই কয়েকটি পরিবার লাইসেন্সিং নীতির সুযোগ নিয়ে ভারতীয় শিল্পে দেশীয় প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে প্রায় নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে দেশীয় উৎপাদকদের দক্ষতা অর্জনের, প্রযুক্তির উন্নতিকরণের বা গবেষণায় বিনিয়োগ করার কোনোরকম উৎসাহ ছিল না। এর ফলে আমাদের দেশ এক উচ্চ উৎপাদনব্যয় বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

৫২.৩.৩ পুরোনো বাণিজ্যনীতি ও রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রার বিভিন্ন খাতে খরচা যাতে পরিকল্পনা মাফিক হয় সেজন্য পুরনো নীতির আওতায় আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। আমদানির উপর শুধুমাত্র আমদানি শুল্ক-ই নয়, পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণও (quantitative restrictions) ছিল। এই দুইয়ের ফলে উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচামালের দাম দেশের বাজারে বিদেশের তুলনায় বেশী হয়ে গিয়েছিল। নতুন রীতির প্রবক্তাদের মতে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্যগুলিতে কালো বাজারের সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থনৈতিক পরিবেশ রপ্তানির অনুকূল ছিল না। সব মিলিয়ে দেশের রপ্তানির বৃদ্ধির জন্য সরকার অনেকগুলি নীতি গ্রহণ করেন প্রধানত সত্তরের দশক থেকে। এই নীতিগুলি হল শুল্ক প্রত্যর্পণ (Duty Drawback Scheme), কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি (Cash Compensatory Scheme), রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত আমদানির লাইসেন্স (Import Replenishiment Licence Scheme) ইত্যাদি। আমাদের দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বেশ উচ্চহারে উৎপাদন শুল্ক (excise tax) ও বিক্রয়কর ধার্য ছিল। ফলে আমাদের দেশে উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল এবং রপ্তানিকারকরা আন্তর্জাতিক বাজারে

অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য শুল্ক প্রত্যর্পণের নীতি গৃহীত হয়। এই স্কীমে রপ্তানিকারকরা রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য বা উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয়কর বাবদ খরচ করতেন তার সবটাই সরকারের কাছ থেকে ফেরত পেতেন। ক্যাস্ কম্পেন্সেটরি স্কীমে রপ্তানিকারকদের ভরতুকি দেওয়া হত। ইম্পোর্ট রিপ্লেনিস্মেন্ট্ স্কীমে রপ্তানিকারকরা রপ্তানি পণ্য, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী কাঁচামাল বিনা আমদানিশুল্কে কিনতে পারতেন। এছাড়া রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন ফিস্ক্যাল্ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। যেমন রপ্তানির থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর আয়কর ছাড় ইত্যাদি। এতৎসত্ত্বেও রপ্তানি তেমন বাড়েনি।

পুরোনো নীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (exchange rate) ভারসাম্য মাত্রা (equilibrium rate) অর্থাৎ যে স্তরে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হয় সেই স্তরের অনেক নীচে রাখা হত। কম দামের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত চাহিদা থাকত। কার চাহিদা কত পরিমাণে পূরণ হবে, অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আমদানি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করতেন সরকার লাইসেন্সিং পদ্ধতির সাহায্যে। পুরোনো নীতির সমালোচকরা বলেন যে এই নীতির ফলেও একটি রপ্তানিবিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বিনিময় হারকে ভারসাম্য মানের যত তলায় রাখা হবে রপ্তানি করে তত কম আয় হবে রপ্তানিকারকের। বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় দেশী পণ্যের মূল্য এবং চাহিদা কমে যাবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অসুবিধা দূর করার জন্য রপ্তানির উপর ভরতুকি ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে। কিন্তু সমালোচকরা বলেন যে রপ্তানি বাণিজ্যের উপর এই ভরতুকি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার প্রভাব ছিল সামান্য।

পুরনো নীতির প্রবক্তারা রপ্তানির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি কারণ সাবেকী রপ্তানিদ্রব্যগুলির বাজার ভবিষ্যতে যথেষ্ট হারে বাড়বে কি না এ সম্পর্কে এঁদের সন্দেহ ছিল। এই সমস্ত দ্রব্যগুলির অনেক সস্তা ও উৎকৃষ্ট পরিবর্ত দ্রব্য উন্নত দেশগুলি তৈরী করে ফেলেছিল এবং এগুলির মানও ক্রমাগতভাবে উন্নত হচ্ছিল। এই সমস্ত কারণে পরিকল্পনাকাররা ভেবেছিলেন যে, দেশে শিল্পায়ন না হলে, দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি না ঘটলে এবং উচ্চপ্রযুক্তিজাত দ্রব্য (hi-tech goods) তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন না করতে পারলে রপ্তানিকে দ্রুত গতিতে বাড়ানো সম্ভবপর নয়। এই কারণেই তাঁরা শিল্পায়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না পৌছানো পর্যন্ত রপ্তানির উপর জোর না দিয়ে স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন।

দেশের সম্পদের বণ্টন যাতে এমনভাবে হয় যাতে শিল্পায়ন সর্বাধিক হারে ঘটতে পারে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ যাতে দেশের শিল্পায়নে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ নিতে ও উপকৃত হতে পারেন তা সুনিশ্চিত করার

জন্যই বিনিয়োগ ও আমদানির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবেই বিনিয়োগ-লাইসেন্সিং ও আমদানি-লাইসেন্সিং নীতি গ্রহণ করা হয়। ভারতে আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। দেশের সামগ্রিক আয়ের সিংহভাগই একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর কুক্ষিগত। এই অবস্থায় সম্পদের বণ্টন বাজারের উপর ছেড়ে দিলে সম্পদের সিংহভাগ শুধুমাত্র বিলাসদ্রব্য উৎপাদন ও আমদানির প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত; শিল্পায়নে বিলাসদ্রব্যই প্রাধান্য পেত, স্বনির্ভরতা প্রাধান্য পেত না। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল থেকে বেশীর ভাগ মানুষই বঞ্চিত হতেন।

নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে আমদানি, রপ্তানি, বিনিয়োগ ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের উপর থেকে সব রকমের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। এর প্রভাব ভারতের মত দেশে শিল্পায়ন ও রপ্তানির পরিপন্থী হতে পারে। দেশের সম্পদ একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। বেড়ে যেতে পারে সাধারণ মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র।

ভারতের মত দেশে যা করা প্রয়োজন ছিল তা হল লাইসেন্সিং পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে আরও দক্ষ, আরও সর্বসাধারণের মঙ্গল বিধায়ক করে তোলা। এভাবেই শিল্পায়ন ও রপ্তানির গতিকে ত্বরান্বিত করা যেত এবং শিল্পায়ন ও রপ্তানির সুফল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করা যেত।

৫২.৪ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর পুরনো নীতিতে কঠিন নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পকে গড়ে তোলা এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করা। পরিকল্পনাকারদের ধারণা ছিল যে শৈশব অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতার থেকে রক্ষা না করলে ভারতীয় শিল্পকে গড়ে তোলা যাবে না। এই কারণেই বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

নতুন নীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর থেকে প্রায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে নতুন নীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে প্রতিযোগিতার অভাবই ভারতীয় শিল্পের অদক্ষতা, অনগ্রসর প্রযুক্তি ইত্যাদির জন্য দায়ী। তাঁদের মতে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না

হলে ভারতীয় শিল্প আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা অর্জন করতে সচেষ্ট হবে না। এই কারণেই তাঁরা আমদানি ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী।

এছাড়া তাঁরা আরও বলেন যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারতে নিয়ে আসবে এবং দেশী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে দেশী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহায়তার মাধ্যমে এই প্রযুক্তি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির করায়ত্ত হবে।

বহুজাতিক সংস্থার সমর্থনে আরো একটি যুক্তি খাড়া করা হয়। এখনকার দিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনেকটাই ইনট্রাফার্ম ট্রেড্ (intra-firm trade)। ইনট্রাফার্ম ট্রেড্ বলতে বোঝায় একই বহুজাতিক সংস্থার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বিভিন্ন শাখার মধ্যে কেনাবেচা। বেশীর ভাগ দেশের আমদানি রপ্তানির অনেকটা অংশই এই ধরনের ক্রয় বিক্রয়। এই অবস্থায় কোনো দেশে যদি বহুজাতিক সংস্থা না আসে তাহলে সেই দেশের পক্ষে রপ্তানি বাড়ানো খুবই কঠিন। অতএব নতুন নীতির প্রবক্তাদের মতে রপ্তানিবৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রবেশ অবাধ করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই নীতির সমালোচকরা অবশ্য এই বক্তব্য মানেন না। তাঁদের আপত্তিগুলি এই রকম— নেহাৎ বাধ্য না হলে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে আসে না। এদের আর্থিক ক্ষমতা এতই বেশী যে এরা বছরের পর বছর অনেক লোকসান করে খুব কম দামে এদের পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং এইভাবে প্রতিযোগী দেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল ও দেউলিয়া করে দিতে পারে। অনেক সময় বহুজাতিক সংস্থাগুলি অনেক দাম দিয়ে প্রতিযোগী দেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিনেও নিতে পারে। যেমন প্রক্টর এ্যান্ড গ্যাম্বল্ গোদরেজের একটা অংশ কিনে নিয়েছে; কোকাকোলা কিনে নিয়েছে পার্লে সফ্ট্ ড্রিংক্স্ ইত্যাদি।

নতুন নীতির সমালোচকরা যা বলেছেন তার অনেকটাই সত্যি। তবে ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বড় একটা হয় নি। এশিয়ায় যে পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয় তার খুব সামান্য অংশই ভারতে আসে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি সেখানেই বিনিয়োগ করে যেখানে বিনিয়োগ করা সবচেয়ে লাভজনক। একটা দেশে বিনিয়োগ করা কতটা লাভজনক তা প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে— মজুরির হার ও শ্রমিকের গুণগত মান এবং পরিকাঠামোর বিস্তৃতি ও পর্যাপ্ততা। এশিয়ার অনেক দেশ যেমন চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদিতে শ্রম আইন অত্যন্ত কড়া এবং মজুরির হারও খুব কম। এদিক দিয়ে ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশ ঐ দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবে না। একক বাহান্নতে পরিকাঠামোর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে পরিকাঠামোর অবস্থা সন্তোষজনক নয়। নব্বইয়ের দশকে পরিকাঠামোয় আশানুরূপ বিনিয়োগ হয় নি। স্থায়ী

সামাজিক পরিসম্পতে (social overhead capital) যথেষ্ট বিনিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে বেশী বৈদেশিক বিনিয়োগ হবার আশা নেই।

৫২.৫ সারাংশ

ভারত কিছু অত্যাবশ্যক অন্তর্বর্তী, মূলধনী ও ভোগ্য দ্রব্যের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীল। এই আমদানি দ্রব্যগুলির মধ্যে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, রাসায়নিক সার, ওষুধপত্র, ভোজ্য তেল ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ অন্যতম। জাতীয় আয় বাড়তে থাকলেই বাড়তে থাকে এই সমস্ত আমদানিদ্রব্যের জন্য চাহিদা। যেহেতু আমদানিদ্রব্যের দাম রপ্তানিজাত আয় থেকেই মেটাতে হয় সেহেতু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারকে উচ্চ মাত্রায় ধরে রাখতে হলে রপ্তানিকে যথেষ্ট বেশী হারে বাড়াতে হবে। নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রবক্তাদের মতে আশির দশকে জাতীয় আয়ের মাত্র ৫.৬ শতাংশ বাৎসরিক বৃদ্ধির হারকে বজায় রাখার জন্য রপ্তানির যে হারে বাড়া প্রয়োজন ছিল ভারতের পক্ষে রপ্তানিকে সেই হারে বাড়ানো সম্ভবপর হয় নি। এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অনুসৃত নীতি তাঁদের মতে এই নীতি আমদানির উপর শুল্ক বসিয়ে এবং আমদানি লাইসেন্সিং-এর সাহায্যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রতিযোগিতার সমস্ত পথ বন্ধ করে, ভারতকে একটি উচ্চ উৎপাদনব্যয় বিশিষ্ট অর্থনীতিতে পর্যবসিত করেছিল এবং একটি রপ্তানী প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই কারণে এঁরা সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে এই নতুন বাজারকেন্দ্রিক উদার অর্থনীতিতে দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা যে কমবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ভারত উৎপাদন বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক মাত্রায় রাখতে সক্ষম হবে কি হবে না তা অনেকটাই নির্ভর করবে এই নীতি পরিকাঠামোর বিনিয়োগের সমস্যা কতটা সমাধান করতে পারবে তার উপর।

৫২.৬ অনুশীলনী

১। ভারতের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২। ভারতের রপ্তানিবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় কী?

৩। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অনুসৃত নীতিতে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? নীতির প্রবক্তারা এই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন না কেন?

৪। বৈদেশিক বিনিয়োগের বিপক্ষে ও সপক্ষে যুক্তিগুলি কী?

৫২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ghosh, J (1998) : Liberalization Debates' in Byres, T. J (ed) *The Indian Economy,* Oxford University Press, Delhi

২। Joshi, V and Little, I. M. D (1995) : Future Trade and Exchange Rate Policy for India', in Cassen, R. and Joshi, V (eds) *India,* Oxford University Press, Delhi.

৩। Srinivasan, T.N (1998) : India's Export Performance : A Comparative Analysis' in Ahluwalia, I. J., and Little, I. M. D (eds) *India's Economic Reforms and Development ;* Oxford University Press ; Delhi.

৪। ড. গৌতম কুমার সরকার : *ভারতের আর্থিক বিকাশ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;* জয়দুর্গা লাইব্রেরী কলকাতা-৯।

একক ৫৩ □ পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি

গঠন

৫৩.০ উদ্দেশ্য

৫৩.১ প্রস্তাবনা

৫৩.২ পরিকল্পনার কৌশল

৫৩.৩ পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহ

৫৩.৪ বিভিন্ন লক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন

৫৩.৪.১ অর্থনৈতিক বিকাশ

৫৩.৪.২ স্বনির্ভরতা অর্জন

৫৩.৪.৩ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

৫৩.৪.৪ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা

৫৩.৪.৫ সামাজিক ন্যায়বিচার

৫৩.৪.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ

৫৩.৫ বিকেন্দ্রীত পরিকল্পনা

৫৩.৬ অনুশীলনী

৫৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন

- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
- কোন কোন লক্ষ্যপূরণের জন্য ভারতে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল?
- পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় কী ধরনের কৌশল (Strategy) অবলম্বন করা হয়?
- পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা কীভাবে করা হয়েছে?

- পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে কীভাবে সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই চেষ্টা কতটাই বা ফলপ্রসূ হয়েছে?
- প্রচলিত কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে যে বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা বর্তমানে আলোচনা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য কী?

৫৩.১ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝায় কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কতকগুলি কর্মসূচী নির্ধারণ করা যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে এগুলি রূপায়ণ করা সম্ভব হয়। এই পরিকল্পনার রূপরেখা এবং সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা কিন্তু সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এক নয়। তার কারণ হল বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থা আলাদা। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন ব্যবস্থা সবই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্বভাবতই সেখানের পরিকল্পনাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেকখানি প্রত্যক্ষ ও সর্বাত্মক। অন্যদিকে আছে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং জাপানের মতো দেশ যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগেরই প্রাধান্য এবং পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই সীমিত। কোন অর্থনৈতিক সংকটের সময় এখানে রাষ্ট্র পরিকল্পনার সাহায্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সহায়তা করে মাত্র। এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝে আছে ভারত এবং তার মতোই কিছু উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশগুলিকে মিশ্র-অর্থনীতির দেশ বলা হয় কারণ এদের বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহাবস্থান। এই সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া হয় যদিও পরিকল্পনার চেহারা এই সব দেশেও একেবারে এক নয়। তবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে হলেও এই ধরনের সব পরিকল্পনাতেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা থাকে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যায়। ভারত একটি মিশ্র অর্থনীতির দেশ যেখানে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান। ১৯৪৭ সালে উপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়ে বিভক্ত ভারত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হাতে পেয়েছিল তা নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার উন্নত দেশের তুলনায় কম তো বটেই, উপরন্তু আয় ও সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে অনেকখানি অসাম্য বর্তমান। এছাড়া কর্মহীনতার সমস্যাও ভারতে তীব্র। জাতীয় আয়বৃদ্ধির মন্থর গতি, ব্যাপক কর্মহীনতা, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং জীবনযাপনের জন্য নিম্নতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার (খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি) অভাব দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ব্যক্তিগত উদ্যোগের নেই। এছাড়া অসাম্য দূর করে সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্যও সরকারী উদ্যোগে

পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই জরুরী ছিল। তাই স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারী পরিকল্পনা যে অপরিহার্য ছিল এ নিয়ে খুব বিতর্কের অবকাশ নেই।

৫৩.২ পরিকল্পনার কৌশল (ষষ্ঠ পরিকল্পনার পর অর্থাৎ সপ্তম পরিকল্পনা থেকে কৌশলের পরিবর্তন)

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কৌশল বা strategy-র বিস্তৃত আলোচনার আগে খুব সংক্ষেপে পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করছি। সোভিয়েত রাশিয়াকে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তক বলা যায়। সে দেশে পরিকল্পনার সফলতা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এম বিশ্বেশ্বরাইয়া নামে এক ইঞ্জিনীয়ার একটি বই লেখেন। সেই বই-এ তিনি দেশের আর্থিক বিকাশে একদিকে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, অন্যদিকে শিল্পোন্নয়নের গুরুত্ব ও তার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন, যদিও এই বই-এ সামগ্রিক পরিকল্পনার কোন ছক পাওয়া যায় না। পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোগের সূচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি থাকার সময় তিনি জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। তারা পরিকল্পনার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন যার মূল বৈশিষ্ট্য হবে গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি ইত্যাদি। রাজনৈতিক কারণে এই কমিটির কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং এর পর থেকে দেশের সমস্ত পরিকল্পনা এঁরাই প্রস্তুত করার দায়িত্ব নেন। ১৯৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করে এখন চলছে নবম পরিকল্পনার যুগ-বিভিন্ন পরিকল্পনার সময়সীমা নিম্নরূপ—

প্রথম	পরিকল্পনা	১৯৫১-১৯৫৬
দ্বিতীয়	,,	১৯৫৬-'৬১
তৃতীয়	,,	১৯৬১-'৬৬
তিনটি বার্ষিক	,,	১৯৬৬-'৬৯
চতুর্থ	,,	১৯৬৯-'৭৪
পঞ্চম	,,	১৯৭৪-'৭৮
জনতা সরকারের ষষ্ঠ ও বহতা	,,	১৯৭৮-'৮০
(নূতন) ষষ্ঠ	,,	১৯৮০-'৮৫
সপ্তম	,,	১৯৮৫-'৯০
অষ্টম	,,	১৯৯২-'৯৭
নবম	,,	১৯৯৭-২০০২

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো। এই লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিতে পরিবর্তন আনতে হয়। এই পরিবর্তন নানাভাবে ও নানা অনুপাতে করা সম্ভব। সেই বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে পরিকল্পনাকারেরা এক এক পরিকল্পনায় এক এক ধরনের কৌশল বা strategy বেছে নেন। সেই কৌশলগুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় তেমন কোন সুনির্দিষ্ট কৌশল ব্যবহার করা হয়নি। ১৯৫১ সালে এই পরিকল্পনা শুরু হওয়ার প্রায় দেড় বছর বাদে এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিলটি তৈরী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে বিপর্যস্ত ভারতের অর্থনীতিকে সুবিন্যস্ত করে তোলাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিনিয়োগের প্রধান অংশ ব্যয় করা হয় কৃষি, সমাজসেবা, পরিবহন ও সংযোজনে। কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দ্রুত ফল পাওয়া গিয়েছিল অবশ্য তার ফলে শিল্পে তেমনভাবে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। প্রথম পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের চূড়ান্ত পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২০৬৯ কোটি টাকা, যদিও প্রকৃত ব্যয় এর চেয়ে অনেক কম হয়েছিল—১৯৬০ কোটি টাকা। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কৃষিতে উন্নতি এবং কিছু কিছু শিল্পে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে কিছুটা সাফল্য দেখা গেলেও একে সঠিক অর্থে পরিকল্পনা বলা মুশকিল যদিও ভবিষ্যতের অগ্রগতির ভিত রচনা করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নেওয়া হয়েছে আরও সাহসী রণকৌশল। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এর প্রধান রূপকার। এই পরিকল্পনায় কৃষির চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হল শিল্প উন্নয়নে আর শিল্পের ভেতরে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হল মূলধনী শিল্পে। এই সব শিল্পে বিনিয়োগের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয় কম অথচ আয় বৃদ্ধি হয় বেশী ফলে দেশে বেকারী ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে— এই কারণে মূলধনী শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল। উপযুক্ত কর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন রোধ করে দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করাও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মূলকৌশল ছিল কিছুটা ভারসাম্যহীন উন্নয়নের পথে গিয়ে (কৃষির তুলনায় মূলধনী শিল্পের ওপর গুরত্ব দান তার প্রমাণ) অর্থনীতিকে জোর ধাক্কা দেওয়া যাতে ভারতের অর্থনীতি যথাযথ উন্নয়নের স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারীখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৬৭২ কোটি টাকা, বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করলে এই অংক ৬৭৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাপকাঠিতে বিচার করলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে তেমন সফল বলা যাবে না কিন্তু এটা মানতেই হবে এই পরিকল্পনাতে অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিকাশ কৌশলটি নেওয়া হয়েছিল সেই কৌশল অনুসরণ করেই আমরা পরের পরিকল্পনাগুলিতেও এগিয়েছি। অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রের একসঙ্গে বিকাশ নয় বরং বাছাই করা কয়েকটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা— এই কৌশলের মূল কথা এটাই।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না যদিও এই সময় সরকার আর একটু সতর্ক হয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগত বণ্টন স্থির করেন। এই পরিকল্পনাতে কৃষির ওপর তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মৌলিক শিল্পের প্রসারের জন্য যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তেমনি কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য বিনিয়োগও বাড়ানো হয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষণ ও গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়। একটি স্বয়ম্ভর (self reliant) এবং স্বয়ংচালিত (self generating) অর্থনীতি গঠনের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনাকারেরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছিলেন— জাতীয় আর বার্ষিক ৫ শতাংশের বেশী হারে বৃদ্ধি করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; খাদ্য শস্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য এবং শিল্প ও রপ্তানীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি মৌলিক শিল্পের প্রসার এবং নূতন যন্ত্র নির্মাণ ক্ষমতার সৃষ্টি করা যাতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়েই দেশের ভারি শিল্পায়নের সমস্যা মেটানো যায়, দেশের মানবসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা; দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করে আর্থিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্রা এই পরিকল্পনায় ছিল ৭৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগে ৪১০০ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৭৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কিন্তু তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। এই সময়ে ভারতের দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়, এছাড়া খরা পরিস্থিতি, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, দুর্বল প্রশাসন যন্ত্র ইত্যাদি মিলে অর্থনীতিতে এক বেহাল অবস্থার সৃষ্টি করে। উপায় না দেখে পরিকল্পনাকারেরা পরিকল্পনার অবকাশ (Plan holiday) ঘোষণা করেন এবং পরবর্তী তিন বছরে (১৯৬৬-'৬৭, ১৯৬৭-'৬৮, ১৯৬৮-'৬৯) উন্নয়নের গতিকে সচল রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনাগুলিতে নূতন কোন কর্মসূচী নেওয়া হয়নি, তৃতীয় পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র।

চতুর্থ পরিকল্পনার মূল রণকৌশল ছিল মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ রেখে উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা (Growth with stability) এবং অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের দিকে আরও অগ্রসর হওয়া। কৃষি এবং মূল শিল্পে তাই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম ও শহরে কর্মসংস্থান এবং দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রসার করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবা হয়েছিল। এছাড়া দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নে যাতে সমতা আসে তার চেষ্টাও পরিকল্পনাতে ছিল। বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এবং রপ্তানি বাড়িয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের কথা ভাবা হয়েছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণও এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সরকারী ক্ষেত্রে এই সময় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫৯০২ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৮৯৮০ কোটি টাকা। বাস্তবে সরকারী বিনিয়োগ হয়েছিল ১৫৭৭৯ কোটি টাকা কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির হার

বিবেচনা করলে প্রকৃত বিনিয়োগের মাত্রা অনেক কম ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার কৌশল নির্ধারণে পরিকল্পনাকারেরা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি অর্থব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত নীতি থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনা খুব বেশী সরে আসেনি, তবুও চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পঞ্চম পরিকল্পনার মূল চেষ্টা ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ আর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য প্রধান কর্মসূচি ছিল—নিট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমানো, রপ্তানি বৃদ্ধি করা ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি। ১৯৭৪-'৭৫ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে পঞ্চম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৩৯০২২ কোটি টাকা এবং ২৭০০০ কোটি টাকা। বাস্তবে অবশ্য সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০১৯৭ কোটি টাকা।

কেন্দ্রে সরকার বদলের ফলে পঞ্চম পরিকল্পনার পর বহতা পরিকল্পনা (Rolling plan) রচিত হয়। এই ধারণা অনুযায়ী পরিকল্পনার সময়সীমা আগের মত পাঁচ বছরই থাকবে তবে প্রতিবছরের শেষে অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরিকল্পনাকে নূতন করে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রচনা করতে হবে। ১৯৮০ সালে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসে এই বহতা পরিকল্পনার ধারণাটি বাতিল করে দেয় এবং নূতন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করা হয়। এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় দারিদ্র্য দূরীকরণ আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর। কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো শক্ত করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং সেই সূত্রে মূলধন বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ও রপ্তানীর দ্রুত প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিল্প ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল ভারি শিল্পের উন্নয়ন, গবেষণা ও কলাকৌশলের উন্নতির ওপর। এছাড়া দেশে খনিজ তেল উৎপাদনের বৃদ্ধি, বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ও যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছিল। মোট বিনিয়োগের প্রস্তাবিত পরিমাণ ছিল ১৫৮৭১০ কোটি টাকা যার মধ্যে সরকারী বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ৯৭৫০০ কোটি টাকার। যদিও বাস্তবে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯৫৪৬ কোটি টাকা।

যে ছটি পরিকল্পনা আলোচনা করা হল তাদের মূল কৌশল মোটামুটি একই ছিল। প্রতিটি পরিকল্পনার মধ্যে খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির বিকাশ ও তার আধুনিকীকরণ, স্বনির্ভরতা অর্জন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার সমস্যা দূর করার কথাও পরের দিকে বলা হয়েছে কিন্তু এগুলি সেভাবে মূল কৌশলের অন্তর্গত ছিল না। সেদিক থেকে সপ্তম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল আগামী শতকের কথা মনে রেখে আর কৌশল হিসেবে নেওয়া হয়েছিল দারিদ্র্য, কর্মহীনতা আর আঞ্চলিক বৈষম্যকে

আক্রমণ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এর জন্য প্রয়োজন মানব সম্পদের দ্রুত বিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নূতনতর প্রয়োগ, অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি। শুধুমাত্র আর্থিক প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয় এটা বুঝে উৎপাদনমুখী কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের চেষ্টা করার কথা ভাবা হয়েছিল এবং এই লক্ষ্য পূরণের ভার দেওয়া হয়েছিল প্রধানত কৃষিক্ষেত্রকে।

ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ত্রুটি—স্বল্প উৎপাদনশীলতার মোকাবিলা করার জন্য পরিকল্পনাকারেরা মূলধন ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। তবে সবচেয়ে বড় বদল এসেছিল একটা মূলনীতির প্রশ্নে কারণ এই সময় থেকেই আর্থিক ব্যবস্থায় বেসরকারীকরণের ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুমতি পরিমাণ যখন ১৫৪২১৮ কোটি টাকা, বেসরকারী ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিমাণ তখন ১৬৮১৪৮ কোটি টাকা— অর্থাৎ সরকারী বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত দাঁড়ায় ৪৮/৫২।

সপ্তম পরিকল্পনার শেষে দেশে তীব্র অর্থসংকট দেখা যায়, এছাড়া ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম পরিকল্পনার কাজ শুরু করা যায়নি তাই ১৯৯০-'৯১ এবং ১৯৯১-'৯২ এই দুটি বছরকেও পরিকল্পনার অবকাশ বলে ধরা হয়।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি থেকে সপ্তম পরিকল্পনায় যে পরিবর্তন হয়েছিল, সেই ধারা অনুসরণ করে অষ্টম পরিকল্পনাতেও প্রধান রণকৌশল ছিল বেসরকারীক্ষেত্রে বিকাশের পথগুলিকে তৈরী করে দেওয়া এবং সরকারী উদ্যোগের লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রধানত প্রয়োজন ছিল দেশের মানবসম্পদ, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (শক্তি, পরিবহন, যোগাযোগ, সেচব্যবস্থা, ইত্যাদি) এবং কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন।

অষ্টম পরিকল্পনার আগে যে পরিকল্পনাগুলি হয়েছে তাতে পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের কোন সক্রিয় অংশ ছিল না। এটাকে পরিকল্পনার সাফল্যের একটি বিশেষ ত্রুটি বলে মনে করা হচ্ছিল, তাই অষ্টম পরিকল্পনায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ও বিভিন্ন রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। জেলা, ব্লক ও গ্রামস্তরে যে সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারাই সাক্ষরতা, পরিবার কল্যাণ, পতিত জমি উদ্ধার, বনসৃজন, পশুপালন ইত্যাদি গ্রামোন্নয়নের কাজে জনসাধারণকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে এইভাবে প্রশাসনের ওপর নির্ভরতা ক্রমশ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। পরিকল্পনা কমিশনের লক্ষ্য ছিল নয়া অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কমিয়ে ফেলা। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকাও ঠিক করা হয়েছিল। দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা দূরীকরণের লক্ষ্যও অষ্টম পরিকল্পনায় যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আগের কর্মসূচীগুলি ছাড়াও গণবণ্টন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা, দরিদ্র মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, সকলের

জন্য ন্যূনতম খাদ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির কর্মসূচীও ছিল। যদিও এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সবচেয়ে বেশী নির্ভর করা হয়েছিল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপরে। অনুমান করা হয় যে এই সময় স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে ৫.৬% এবং তার ফলে বার্ষিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ লোকের। ঠিক হয়েছিল যে এমন সব প্রকল্প নেওয়া হবে যেখানে নিয়োগের উৎপাদন স্থিতিস্থাপকতা (output elasticity of employment) অর্থাৎ প্রতি এক শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পিছু নিয়োগ বৃদ্ধির শতকরা হারটি অপেক্ষাকৃত বেশী। সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেও যথাযথ কৃৎকৌশল নির্বাচন (choice of technique) করে আর্থিক কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হয়েছিল। ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থ নিয়োগের সমস্যা হ্রাস করার জন্য উন্নত কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া গুরুত্ব পেয়েছিল শহরে দরিদ্র্যদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প, শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প, নেহরু রোজগার যোজনা ইত্যাদি। অর্থের অঙ্কে অষ্টম পরিকল্পনার আয়তন ছিল বিশাল। মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭,৯৮,০০০ কোটি টাকা-এর মধ্যে সরকারী বিনিয়োগ ৩,৬১,০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের ৪৫.২%। বাকি ৫৪.৮% অর্থ বেসরকারী উদ্যোক্তরা বিনিয়োগ করবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।

নবম পরিকল্পনা সরকারীভাবে শুরু হওয়ার কথা ১৯৯৭-এর এপ্রিল থেকে কিন্তু পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিল তখনও প্রস্তুত হয়নি। যুক্তফ্রন্টের আমলে এই পরিকল্পনার খসড়া তৈরী হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ১৯৯৮ সালের মার্চে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মধু দন্ডবতে এর খসড়া প্রকাশ করেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ঠিক হয় যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বে এই খসড়ার কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন হবে। পরে কে সি পন্থ যখন ডেপুটি চেয়ারম্যান হন, তখন ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিকল্পনাটি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National development council) চূড়ান্ত অনুমোদনটি পায়। এই পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রবিন্দু focus ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশ। এই উদ্দেশ্যে চারটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল—১. জীবনযাপনের গুণগত মানবৃদ্ধি, ২. উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৩. আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা, ৪. স্বনির্ভরশীলতা অর্জন।

আর্থিক বিকাশের জন্য এই পরিকল্পনায় প্রধান জোর পড়েছিল কৃষির ওপর কারণ কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই কর্মহীনতা হ্রাস আর স্বনির্ভরতা অর্জনের দ্বৈত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে লক্ষ্যগুলিকে নিম্নলিখিত কটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দান

২। মূল্যস্তর স্থিতিশীল রেখে অর্থনীতির বৃদ্ধির হারটি ত্বরান্বিত করা

৩। সকল মানুষকে বিশেষত সমাজের দুর্বলতম অংশের মানুষদের খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে সুরক্ষা দেওয়া।

৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করা

৫। দেশের সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করা।

৬। আর্থসামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্য— অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে মহিলা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ যেমন তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে লাগানো

৭। পঞ্চায়েত, সমবায় ও স্বয়ংসহায়ক গোষ্ঠীর মত যেসব সংস্থায় জনসাধারণ অংশ নেয়, সেগুলির উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, এবং

৮। স্বনির্ভরতা অর্জনের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করা।

এই সমস্ত কার্যক্রম সফল করার জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রের সমস্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাছাড়া পরিকল্পনার প্রক্রিয়াকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকৃত করা হবে এরকম ঠিক হয়েছিল। ন্যূনতম প্রাথমিক পরিষেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল ইত্যাদি সবরাহের ব্যাপারে সরকারী ভূমিকার প্রাধান্যের কথা স্বীকার করা হয়েছিল এই পরিকল্পনায়। তার মানে বাজার অর্থনীতিকে স্বাগত জানালেও সরকার এখনই পরিকল্পনার পথ থেকে সরে আসতে চান না। এই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ঠিক হয় ২১৭১০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে সরকারী বিনিয়োগ হ'ল ৭২৬০০০ কোটি টাকা।

[*টীকা* : অষ্টম পরিকল্পনা পর্যন্ত সরকারী ব্যয়ের যে হিসেব এখানে দেওয়া হয়েছে তা ড. গৌতম কুমার সরকারের "ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও আর্থিক বিকাশ" (১৯৯৬) বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে।]

৫৩.৩ পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহ

পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী হ'ল দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পদ সংগ্রহ করা যাতে পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়। এই সম্পদ সংগ্রহ বা অর্থসংস্থান পরিকল্পনাকারেদের কাছে খুবই গুরুতর সমস্যা। অর্থসংস্থানের উৎসগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়— ১. অভ্যন্তরীণ, ২. বৈদেশিক, ৩. ঘাটতি ব্যয়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে প্রধান হ'ল কর, রাষ্ট্রীয়সংস্থার উদ্বৃত্ত, ক্ষুদ্রসঞ্চয়, সরকারী ঋণ ইত্যাদি। বৈদেশিক উৎস হ'ল বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ। ঘাটতি ব্যয়ের সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে আলাদা। আমাদের দেশে সরকারের চলতি এবং মূলধনী খাতে মোট ব্যয় যদি মোট আয়ের চেয়ে বেশী হয় তাহলে সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার হয় সরকারী সঞ্চয় থেকে অর্থ তুলে ব্যয় করে অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়। রির্জাভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা নোট ছাপিয়ে পূরণ করে। দুই ক্ষেত্রেই দেশে মোট টাকাকড়ির যোগান বেড়ে যায়। প্রতিটি উৎসকে নিয়ে এবার একটু বিস্তারিত অলোচনা করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা আছে কর রাজস্বের। আপনারা হয়ত জানেন যে কর দু ধরনের হয়— প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। যে করগুলির ভার সরাসরিভাবে করদাতাদের ওপর পড়ে সেগুলি হ'ল প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর, সম্পদ কর, মূলধনী কর ইত্যাদি। যেসব করের

ভার করদাতারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে সেগুলি হল পরোক্ষ কর যেমন বিক্রয় কর, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ করকেই যদিও প্রগতিশীল কর বলা যায় তবু পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই করের গুরুত্ব কমে এসেছে। আর একটা কথা বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য—তা হ'ল করব্যবস্থাকে যদিও উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়, তবু এ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের অনেকটাই ব্যয় হয়ে যায় বিভিন্ন পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ে (nonplan expenditure)। পরিকল্পনার প্রথম দশকে রেল ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তেমন উদ্বৃত্ত হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে এই সংস্থাগুলি কিছু অর্থসংস্থান করতে আরম্ভ করে যদিও এই উৎস কখনই তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পারেনি। সে তুলনায় জীবনবীমা কর্পোরেশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় (যেমন জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট, পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, জাতীয় সঞ্চয় এবং কিষান বিকাশ পত্র ইত্যাদি)। মারফত সংগৃহীত অর্থ পরিকল্পনার আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে আরো বেশী কাজে লেগেছে।

পরিকল্পনার ব্যয় বহনের জন্য অনেকসময় ভারতকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর বিশেষ নির্ভর করতে হয়েছে। তবে এই ধরনের সাহায্যের ব্যাপারে সবসময়ই একটা অনিশ্চয়তা থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও সাহায্যের বিভিন্ন উৎস হচ্ছে—১. প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ, ২. বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ, ৩. বিভিন্ন উন্নত দেশের সহযোগিতায় গঠিত ভারত সংস্থা (Aid India) থেকে আর্থিক সহায়তা এবং ৪. বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র থেকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি। অর্থসংস্থানের তৃতীয় উৎস ঘাটতি ব্যয় কীভাবে দেশে মুদ্রার যোগান বাড়ায় সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে ঘাটতি ব্যয় দেশে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে তবুও দেশের আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই উৎসটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থসংস্থানের যে তিনটি উৎসের কথা বলা হ'ল বিভিন্ন পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক অবদান নিচের ২টি সারণি থেকে বোঝা যায়।

সারণি — ১

পরিকল্পনার জন্য সম্পদের উৎস

(কোটি টাকায়-বন্ধনীতে মোট ব্যয়ের শতাংশ)

পরিকল্পনা	মোট অভ্যন্তরীণ উৎস	বৈদেশিক সাহায্য	ঘাটতি ব্যয়
প্রথম	১৪৩৮	১৮৯	৩৩৩
	(৭৩.৪)	(৯.৬)	(১৭.০)
দ্বিতীয়	২৬৬৯	১০৪৯	৯৫৪
	(৫৭.৫)	(২২.৫)	(২০.৪)

সারণি ১ *(contd.)*

পরিকল্পনা	মোট অভ্যন্তরীণ উৎস	বৈদেশিক সাহায্য	ঘাটতি ব্যয়
তৃতীয়	৫০২১ (৫৯.৫)	২৪২৩ (২৬.৩)	১১৩৩ (১৩.২)
চতুর্থ	১২০১৯ (৭৬.৩)	২০৮৭ (১২.৯)	২০৬০ (১২.৮)
পঞ্চম	৩১৯৪৩ (৭৮.৪)	৫২০৯ (১২.৮)	৩৫৬০ (৮.৮)
ষষ্ঠ	৮৬৬০৬ (৭৮.১)	৮৫২৯ (৭.৭)	১৫৬৮৪ (১৪.২)

সারণি ২
পরিকল্পনার জন্য সম্পদের উৎস

(কোটি টাকায়-বন্ধনীতে মোট ব্যয়ের শতাংশ)

পরিকল্পনা	মোট অভ্যন্তরীণ উৎস	বৈদেশিক সাহায্য	ঘাটতি ব্যয়
সপ্তম	১৩৪১৯০ (৭৫.০)	১৬১২০ (৯.০)	২৮২৬০ (১৬.০)
অষ্টম	৩৩২১০০ (৮৬.০০)	১৯২৩০ (৫.০)	৩৩০৪০ (৯.০)

সূত্র : ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত ব্যয়ের হিসেব (সারণি-১) অধ্যাপক সম্পদ মুখার্জী ও দেবেশ মুখার্জীর "সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি" বইটি থেকে সংকলিত হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনার চূড়ান্ত হিসেব এই বই-এ না থাকায় দ্বিতীয় সারণিটির জন্য Dalt a and Sundaran এর "Indian Economy" (1999) বইটির ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

[টীকা— উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরিকল্পনার ব্যয়ের হিসেবে সূত্রের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন লেখকের লেখাতে কিছু গরমিল দেখা যায় কিন্তু তা অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সাধারণ প্রকৃতিকে প্রভাবিত করছে না।]

এই দুটি সারণি থেকে দেখা যায় যে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় গুরুত্ব ছিল স্বনির্ভরশীলতার ওপর তাই বৈদেশিক

সাহায্যের গুরুত্ব হ্রাস পায়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনায় শতকরা হিসেবে এই উৎসের অবদান আরো কমে যায়। ঘাটতি ব্যয় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় এবং এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ যাতে স্বল্পসীমার মধ্যে রাখা যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সেই চেষ্টা যে সফল হয়নি তা ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনার সময় সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে এই সময় পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় খুব বেড়ে যায়। আগের পরিকল্পনাগুলিতে দেশি ও বিদেশি ঋণের ওপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল যে দেশের পক্ষে শুভ হয়নি তা এই সময় বোঝা যায়। কারণ সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পেলে সরকারের সুদের বোঝা বেড়ে যায় ফলে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে স্বল্প পরিমাণ উদ্বৃত্তই পাওয়া যায়। এই সব কারণে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও সরকারকে ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভরতা বাড়াতে হয়।

মোটের ওপর পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান ব্যবস্থাটি খুব সন্তোষজনক নয় এবং তার পরিবর্তনের জন্য আরও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

৫৩.৪ বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন

বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে রণকৌশল (strategy) আগে বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে আপনারা অবহিত হয়েছেন। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটা দোলচলতা প্রথম থেকেই ছিল— বর্তমানের আশু সমস্যার সমাধান না ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ প্রয়োজন কোনটার ওপর বেশী জোর দেওয়া হবে এ নিয়ে পরিকল্পনাকারেরা কখনই স্থির নিশ্চিত ছিলেন না। প্রথম পরিকল্পনা শুরুর পটভূমিকায় ছিল একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি কিন্তু এই পরিকল্পনাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতির প্রবেশ হ্রাস দেশনেতাদের অনেকখানি স্বস্তি দেয়, ফলে দূরবর্তী লক্ষ্যপূরণের কথা তাঁরা ভাববার অবকাশ পান। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে শিল্প প্রসার বিশেষত মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই পথই অনুসরণ করা হয় কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তীব্র আয় বৈষম্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে ফলে পরিকল্পনাকারদের ঘোষণা করতে হয় যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকেও আর্থিক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যতম লক্ষ্য করতে হবে (growth with justice)। তার ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় পশ্চাৎপদ অঞ্চল আর শ্রেণীর জন্য নানারকম উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত ভাবা হয়েছিল সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটলেই তার ফল সমাজের উপরিস্তর থেকে চুঁইয়ে নিচের স্তরে পৌঁছে যাবে। সে আশা কিন্তু পূর্ণ হয়নি তাই পঞ্চম পরিকল্পনাতে

দারিদ্র্য দূরীকরণকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করা হয়। কর্মসংস্থানের সমস্যাটিকেও এইসময় সামনের সারিতে আনা হয়। এছাড়া মূলধন গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা ছিল বেশি, ফলে বিদেশি ঋণ ও সুদের হার পরিশোধ দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাকালের লক্ষ্যগুলিকে মোটামুটি এই কটি ভাগে ভাগ করা যায়— ১. অর্থনৈতিক বিকাশ, ২. স্বনির্ভরশীলতা অর্জন, ৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ৫. সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, ৬. দারিদ্র্য দূরীকরণ। কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন লক্ষ্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার ও যথাযথ সমন্বয় সাধন করা যায়নি এবং এই সমন্বয়ের অভাবই ছিল আমাদের পরিকল্পনাগুলির প্রধান সীমাবদ্ধতা যার ফলে পরিকল্পনাকালে দেশের প্রত্যাশিত অগ্রগতি দেখা যায়নি।

৫৩.৪.১ অর্থনৈতিক বিকাশ

শুধুমাত্র পরিমাণগত দিক দিয়ে বিচার করলেও ভারতে অগ্রগতির হার তেমন সন্তোষজনক নয়। মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে ভারত পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ— এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি ছোট দেশের মাথাপিছু আয়ও আমাদের চেয়ে বেশী। ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের World Development Report-এ দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক জনভারপীড়িত চীনেও ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ১০.৯%, আমাদের দেশে এই হার ৫.৮% মাত্র।

৫৩.৪.২ স্বনির্ভরতা অর্জন

বিদেশের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা কমানো পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। পরিকল্পনার চার দশক পরে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও আরো অনেক কিছুতেই আমরা স্বনির্ভর হতে পেরেছি, তবু সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন থেকে অর্থনীতি এখনও অনেক দূরে। উন্নত প্রযুক্তির জন্য এখনও আমাদের বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়, পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের গড়পড়তা ১০% আসে বিদেশ থেকে, বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি নিয়ে দুশ্চিন্তার এখনও শেষ হয়নি।

৫৩.৪.৩ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

দেশের উন্নতির আর একটি মাপকাঠি হল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। আগে পরিকল্পনাকারদের ধারণা ছিল যে আয় বৃদ্ধি হলে নিজে থেকেই কর্মসংস্থান বাড়বে, কিন্তু কার্যত দেখা গেল কর্মসংস্থান বাড়ার জন্য আয় বৃদ্ধি জরুরী

হলেও যথেষ্ট নয়। মূল ও ভারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়ায় আমাদের শিল্পায়নের পথটি ছিল পুঁজি প্রগাঢ় (Capital intensive) প্রযুক্তির পথ, নূতন কৃষি প্রযুক্তি ও কিছুটা তাই ছিল ফলে আয় বৃদ্ধি হলেও কর্মহীনের সংখ্যা দেশে বেড়েই যাচ্ছিল। সপ্তম পরিকল্পনায় এই সমস্যাকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কর্মহীনতা দূরীকরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয় যদিও লক্ষ্যমাত্রা যথার্থভাবে পূর্ণ হয়নি।

৫৩.৪.৪ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থায়িত্ব বজায় রেখে অর্থনৈতিক বিকাশ (growth with stability)। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটলে কিছু পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেই কিন্তু এই হার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে না রাখলে তা দেশের দুর্বলতর শ্রেণীকে আঘাত করে এবং শেষপর্যন্ত দেশের আর্থিক বিকাশের প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয়। ভারতে এটাই ঘটছে।

৫৩.৪.৫ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আমাদের সামনে ছিল কাজেই পরিকল্পনা এমন হবে যাতে সমস্ত ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কার্যত কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অনুকূলেই জাতীয় আয়ের বণ্টন হচ্ছে। সম্পদের মালিকানাতেও এই অসাম্য বর্তমান। গ্রামে ৭০% ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে রয়েছে মোট জমির মাত্র ২৫%, অন্যদিকে মোট জমির ২৫% এর মালিক মাত্র ৩% কৃষিজীবি। শহরেও এই অসাম্যের চিত্র ফুটে ওঠে। বিশেষ করে অসহনীয় হল অসংগঠিত শিল্পগুলির শ্রমিকদের অবস্থা। এই কারণেই দেশের আর্থিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরের দিকের পরিকল্পনাগুলিতে এই অবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিরোধী কর্মসূচীর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

৫৩.৪.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠারই অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হ'ল দারিদ্র্য দূরীকরণ। আর্থিক বিকাশের সুফলটি চুঁইয়ে পড়ে (trikle down) দেশের দারিদ্র্য দূর করবে এ আশা সফল হয়নি। তাই চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে আলাদাভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণকে লক্ষ্য ধার্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলির ওপর। এছাড়া স্বল্পকালে অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যও নানারকম কর্মসূচী নেওয়া হয় যেমন দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে অন্তত একজন সদস্যের জন্য বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় কাজ পাওয়া সুনিশ্চিত করা, সরকারী গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের হাতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য

পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়া কিছু সমষ্টিগত প্রকল্পের কথাও ভাবা হয়েছিল যেমন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, রাস্তাঘাট মেরামত করা ইত্যা.। এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকার আর্থিক বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু তা যে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য লাভ করেনি তা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানেরও প্রয়োজন হয় না।

পরিকল্পনার ফলাফল দিয়ে যদি তার সাফল্য বিচার করতে হয় তাহলে এটা বলতে হবেই যে প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে বিস্তৃত পরিকল্পনায় দেশের কিছুটা অগ্রগতি হলেও বেশীরভাগ লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হয়নি যথাযথভাবে। এর কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে কখনই তাদের গুরুত্ব অনুসারে ঠিকমত বিন্যস্ত করা হয়নি, কখনও কখনও আবার পরস্পর বিরোধী কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রতিটি অংশের মধ্যে ঠিকমত সমন্বয়সাধনও করা হয়নি। ভারী শিল্পের উন্নয়ন যে প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই কিন্তু ভারী শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকে ঠিকভাবে যুক্ত না করার ফলে দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ যেভাবে সম্প্রসারিত হয়নি আর তাই দারিদ্র্যের ওপর আঘাত হানার মত জোর অর্থনীতি আয়ত্ত করতে পারেনি। নীতি রূপায়ণে ব্যর্থতাও অবশ্য পরিকল্পনার একটি দুর্বল দিক। নানারকম কায়েমী স্বার্থ, কালো টাকার প্রবল প্রতাপ, আর্থিক ব্যবস্থায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ এসবই পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সাধারণ মানুষকে পরিকল্পনার কাজে সামিল করে, অব্যবহৃত সম্পদের ও মানবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনাকারেরা যদি সুসমন্বিত নীতি গ্রহণ করেন এবং সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন, তবেই পরিকল্পনা তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৫৩.৫ বিকেন্দ্রীত পরিকল্পনা

পরিকল্পনার অনেকগুলি বছর কেটে গেলেও অর্থনীতির তেমন প্রত্যাশিত অগ্রগতি না হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় কিছু নূতন স্তর যুক্ত করার কথা ভাবা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার কার্যক্রমকে উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তরে ছড়িয়ে না দিয়ে নিচু স্তর থেকে ক্রমশ উঁচু স্তরে নিয়ে আসতে হবে—একেই বলে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা। ভারতের ভৌগলিক আয়তন বিশাল, এর কোন কোন অঙ্গরাজ্য পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিধিতে সমান কিংবা বড়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পদের বণ্টনের মধ্যে এবং আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অনেক পার্থক্য আছে, বিভিন্ন অঞ্চলের রীতিনীতিও অনেকখানিই আলাদা তাই একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা দিয়ে দেশের সমস্ত অঞ্চলের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে সরকার অনেক দূরবর্তী প্রতিষ্ঠান কিন্তু পঞ্চায়েত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের দ্বারাই নির্বাচিত ও পরিচালিত—তাই এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত

যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা ও রূপায়ণ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই আঞ্চলিক স্তরের পরিকল্পনাগুলিকে পরিকল্পনার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করলে এটি একটি সামগ্রিক রূপ পাবে। অর্থাৎ বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হল আঞ্চলিক স্তরে, রাজ্যস্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমন্বয়।

বিকেন্দ্রীত পরিকল্পনার কথা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করলেও অষ্টম পরিকল্পনাতেই এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাকে উজ্জীবিত করা। উত্তরপূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য ও লাক্ষাদ্বীপ ছাড়া ভারতে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে এর গঠন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে এটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানো হবে। এর কার্যক্রমের মধ্যে থাকার কথা কৃষি ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম, জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ শিল্পায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনসৃজন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্থানীয় পরিবহন ইত্যাদি। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই তৃণমূলস্তরে পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। শক্তির (energy) যে সব চিরাচরিত উৎস আছে। সেগুলি গ্রামোন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্তও নয়, আবার ব্যয়বহুলও বটে। বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষে উপযুক্ত প্রথাবহির্ভূত শক্তির উৎসকে (nonconventional sources of energy) ব্যবহার করার দায়িত্বও এই ধরনের পরিকল্পনা নিতে পারে।

এটা ঠিকই যে পরিকল্পনাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে গেলে নানারকম সুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎসাহী অংশীদার হয়ে উঠবে এটি সুনিশ্চিত করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া জনসাধারণের সঙ্গে পেশাদার কর্মীদের (যেমন অর্থনীতিবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও অন্য কলাকুশলী) সুষ্ঠু যোগাযোগ ছাড়া পরিকল্পনা সফল হওয়া অসম্ভব। তবে এই বাধাগুলি অলঙ্ঘনীয় নয় মোটেই। গ্রামে ব্যাপক ভূমিসংস্কার, শিক্ষার প্রসার, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা এবং সরকারের তৃণমূলস্তরে উন্নয়নের জন্য যথার্থ সদিচ্ছা থাকলে তবেই বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে।

৫৩.৬ অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগের প্রধান অংশ ব্যয় করা হয় ———।

(খ) তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকারেরা একটি ——— ও ——— অর্থনীতি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

(গ) যে করের ভার করদাতাদের ওপর পড়ে তাকে বলে ——— কর।

(ঘ) পরিকল্পনার প্রথম দশকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে একমাত্র ——— থেকেই কিছু উদ্বৃত্ত হয়েছিল।

(ঙ) ঘাটতি ব্যয় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে ——— পরিকল্পনায়।

(চ) ১৯৮০-১৯৯০ সালের মধ্যে ভারতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ———।

(ছ) মূল ও ভারী শিল্পের ওপর জোর দিলে শিল্পায়নের পথটি হয় ——— ———।

(জ) ——— পরিকল্পনা থেকে আলাদাভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণকে লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।

(ঝ) বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনায় অর্থনীতিতে কতকগুলি নূতন ——— যুক্ত করতে হয়।

(ঞ) বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনার ধারণাটি গুরুত্ব পায় ——— পরিকল্পনায়।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মিশ্র অর্থনীতি কাকে বলে?

(খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে?

(গ) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনা কী উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়?

(ঘ) ঘাটতি ব্যয় কাকে বলে?

(ঙ) মূলত কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য "কাজের বদলে খাদ্য" কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল?

(চ) ভারতের পরিকল্পনার 'লক্ষ্যগুলির মধ্যে স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় কি?

(ছ) বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান উৎসগুলো কী কী?

(জ) অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশী?

(ঝ) বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনায় প্রধানত কোন কোন কর্মসূচী রূপায়ণের কথা ভাবা হয়েছে?

(ঞ) প্রথম কোন পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল?

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(খ) সপ্তম পরিকল্পনার রণকৌশল (strategy) পর্যালোচনা করুন। এর নূতনত্ব কী?

(গ) ভারতীয় পরিকল্পনা যে আশানুরূপ সফল হতে পারেনি তার জন্য কোন কোন বিষয়গুলি দায়ী বলে মনে করো, তাদের বিস্তৃত বিবরণ দিন।

(ঘ) ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসগুলি সম্বন্ধে সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

(ঙ) ভারতের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। তথাকথিত নেহেরু অনুসারী উন্নয়নের কৌশল থেকে এই পরিকল্পনা কতখানি সরে এসেছে? ভারতের অর্থনীতিতে এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. গৌতম কুমার সরকার— *ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আর্থিক বিকাশ*, ১৯৯৬ (জয় দুর্গা লাইব্রেরী)

২। Dhiresh Bhattacharya — *India's Five Year Plans — An Economic Analysis 1990* : (Joydurga Library).

৩। I. C. Dhingra — *The Indian Economy Rcources, Planning, Development and Problems 1995*, (Sultan Chand & Sons).

৪। R. Datt and KPM Sundharam — *Indian Economy 1999*, (S. Chand & Company Ltd.)

৫। সম্পত মুখার্জী ও দেবেশ মুখার্জী — *সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি*, ১৯৯৮, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী।

একক ৫৪ □ পরিকল্পনার মডেল বা নকশা : দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং অষ্টম পরিকল্পনার মডেল

গঠন

৫৪.০ উদ্দেশ্য

৫৪.১ প্রস্তাবনা

৫৪.২ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মডেল

৫৪.৩ চতুর্থ পরিকল্পনার মডেল

৫৪.৪ পঞ্চম পরিকল্পনার মডেল

৫৪.৫ অষ্টম পরিকল্পনার মডেল

৫৪.৬ অনুশীলনী

৫৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন কীভাবে—

(ক) ভারতের পরিকল্পনা বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেলের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে,

(খ) এ বিষয়ে মডেলের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও আঙ্গিকে পার্থক্য হয়ে গেছে।

৫৪.১ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ধরনের নকশা বা 'মডেল' দিয়েছেন। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে কোন কোনটি এইরকম বিশেষ কোন তাত্ত্বিক মডেলের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

এই এককটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি কী ধরনের মডেলের সাহায্যে রচিত হয়েছে।

১। দ্বিতীয় পরিকল্পনা

২। চতুর্থ পরিকল্পনা

৩। পঞ্চম পরিকল্পনা

৪। অষ্টম পরিকল্পনা

৫৪.২ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মডেল

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরিকল্পনা কমিশন নানারকম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনার রূপ দান করে। এর জন্য অর্থনীতির তাত্ত্বিক মডেলের সাহায্যও নেওয়া হয়। বিশেষভাবে ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ একটি মডেল রচনা করেন যেটি "নেহেরু মহলানবিশ মডেল" নামে খ্যাত। এই মডেলের ভিত্তি ছিল রাশিয়ার কয়েকজন অর্থনীতিবিদের এবং বিশেষত অর্থনীতিবিদ ফেল্ডম্যানের রচিত পরিকল্পনার মডেল। দু-অংশে বিভক্ত (two-sector) এই মডেলটিতে সমস্ত উৎপাদনযোগ্য দ্রব্যকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ফলে পরবর্তীকালে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনীদ্রব্য উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। শুধু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে সম্পদ নিয়োজিত করলে জনসাধারণ অনেক জিনিষ ব্যবহার করতে পারত। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে শক্তির ব্যয় করলে স্বল্পকালে হয়তো সাধারণ মানুষকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কিন্তু দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে মূল ও ভারী শিল্পের ওপর বিনিয়োগ করাই যথার্থ পথ। এর কারণ এই পথেই ভবিষ্যৎ উৎপাদন হার বৃদ্ধি পাবে। অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর এই দু অংশে বিভক্ত মডেলটি পরবর্তীকালে চার অংশে বিভক্ত মডেলে রূপান্তরিত করেন। এই মডেলে দেশের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়—১. কারখানাতে প্রস্তুত মূলধনী দ্রব্য (যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি), ২. কারখানাতে উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্য (যেমন সূতীবস্ত্র ইত্যাদি), ৩. কুটির বা পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্য (মূলত খাদ্যশস্য) এবং ৪. বিভিন্ন রকমের সেবামূলক কাজকর্ম উৎপাদনক্ষম অংশ (যেমন ব্যাংকিং ও বীমাব্যবস্থা, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি)। এর মধ্যে তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রথমটিতে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের ওপর কারণ তার ফলেই আর্থিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য এ বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন যে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের ওপর জোর দিলে দেশে সৃষ্টি হবে নূতন আয় ও ক্রয়ক্ষমতা যার চাপে দামস্তরে বৃদ্ধির প্রবণতা

দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এই শিল্পগুলি মূলধন প্রগাঢ় (capital intensive) বলে দেশের অব্যাহৃত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য অধ্যাপক মহলানবিশ কৃষি ও চিরাচরিত কুটির শিল্পগুলির অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন। তাঁর মত ছিল এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর জোর সাময়িক প্রয়োজন মেটাবে এবং পরে মূল ও ভারি শিল্পের অগ্রগতির ফলে উৎপাদিত উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জনসাধারণের জন্য ভোগ্যপণ্যের বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হবে।

এই মডেলটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছিল আধুনিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্প গুণগত উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্যের বিচারে পেরে উঠবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাছাড়া মূলধনী দ্রব্যের ওপর জোর দেওয়ার ফলে যখন নূতন শিল্পভিত্তি গড়ে উঠবে তখনই বা এসব শিল্পের ভবিষ্যৎ কী হবে? অনেকে এও মনে করেছিলেন যে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে এখনই বিনিয়োগ না করে দেশে প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্যগুলিকে রপ্তানী করে তার বদলে বিদেশ থেকে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করলে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্মহীনতার ও দারিদ্র্যের সমস্যার আরও ভালভাবে সমাধান করা যেত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমাদের প্রত্যাশা মাফিক সফল হয়নি তবু এই পরিকল্পনা যে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তিকে কিছুটা প্রস্তুত করেছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

৫৪.৩ চতুর্থ পরিকল্পনার মডেল

তৃতীয় পরিকল্পনা মোটামুটি দ্বিতীয় পরিকল্পনার ধারাতেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা সরকারকে নূতন করে ভাবতে বাধ্য করে এবং সেই জন্যই ১৯৬৭ সালে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিলকে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর প্রস্তুত দলিলের ভিত্তিতেই চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হয়। এই মডেলে অধ্যাপক গ্যাডগিল ভারি শিল্প বিকাশের চলতি কার্যক্রমকে উপেক্ষা করার কথা বলেননি কিন্তু তার সঙ্গে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন একটি নূতন কৃষিকৌশল যার উদ্দেশ্য হল কৃষির সর্বাঙ্গীন বিকাশ যাতে পরিকল্পনার সুফল অন্তত কিছুটা হলেও সমাজের দুর্বলতর মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য ক্ষুদ্র জোতের মালিক চাষীদের জমিহীন ক্ষেত মজুরদের আর খরাপ্রবণ অঞ্চলের চাষীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একথাও ভাবা হয়েছিল যে কৃষির ওপর যদি সমস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যাকে কাজ দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে তাহলে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব তাই কৃষিকাজের পরিপূরক হিসেবে গ্রামীণ শিল্প বিকাশের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। অধ্যাপক গ্যাডগিলের এই মডেলে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল উপাদান ছিল স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পরিকল্পনার সুফল পৌঁছে দেওয়া আর

স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আর্থিক বিকাশের চেষ্টা করা (growth with stability)। এর জন্য নূতন কৃষিনীতির পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত শিল্পের উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এবং রপ্তানী বাড়িয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে চিরাচরিত দ্রব্য ছাড়াও প্ল্যাস্টিক, ওষুধপত্র, কাগজ ইত্যাদি দ্রব্যের রপ্তানী প্রসারের চেষ্টা হবে। রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৭ শতাংশ। শিক্ষানীতি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় যে নূতন পথের দিগ ছিল তাতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে দেশের প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হয়েছে যাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দেশে শিক্ষা ও সময়ের অপচয় না হয়। এছাড়া এই পরিকল্পনাতেই প্রথম পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয় যাতে দেশের জনসংখ্যা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্যক্তিগত অসাম্যের মত আঞ্চলিক বৈষম্যও দূর করা জরুরী এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার এই মডেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক ৫.৭ শতাংশ এবং মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক ৩ শতাংশ। এর জন্য কৃষি উৎপাদন বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে এবং শিল্প উৎপাদন বার্ষিক ৮ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বারবার স্থিতিশীলতার কথা বললেও এই সময় দামস্তরের নজিরবিহীন ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির এই ধাক্কায় পরিকল্পনার কাজ বজায় রাখা ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছিল। দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনাই তাই পঞ্চম পরিকল্পনার সামনে প্রধান কাজ ছিল। সেই সঙ্গে অন্য সেই দিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ছিল স্বয়ম্ভরতা অর্জন আর দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন।

৫৪.৪ পঞ্চম পরিকল্পনার মডেল

পঞ্চম পরিকল্পনার মডেলের মূল ভিত্তি ছিল হ্যারড ডোমার মডেল .(Harrod Domar model) আর লিওনটিফের মডেল (Leoutief model)। হ্যারড ডোমারের উন্নয়ন বিষয়ে মডেলটি যে অনুমানের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে তা হল জাতীয় আয় বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল, আবার বিনিয়োগ নির্ভর করে সঞ্চয় প্রবণতার ওপর। লিওনটিয়েফের লেনদেনের যে মডেলটি (transaction model) এই পরিকল্পনায় ব্যবহার হয়েছে তা ৬৬ × ৬৬ ইনপুট আউটপুট মেট্রিক্স সমাধানের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এখানে দেশের সমগ্র জনসংখ্যাকে মাসিক ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে ২৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরপর ভোগব্যয়ের কিছু পরিবর্তনের অনুমান করে এই জনসংখ্যার মোট ভোগব্যয়ের হিসেব করা হয়। দেশের চূড়ান্ত চাহিদা নির্ভর করবে সরকারী ও বেসরকারী মোট ভোগব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও রপ্তানীর হারের ওপর। এই মডেলের তাত্ত্বিক সূত্র India's

Five year Plans (1990) Prof Dhiresh Bhattacharya) মডেলের তাত্ত্বিক দিকটির খুঁটিনাটি আলোচনা না করে এর প্রয়োগের দিকটি বিশ্লেষণ করা যাক। পঞ্চম পরিকল্পনার নকশায় প্রধান লক্ষ্যগুলি ছিল— জাতীয় আয়ের বার্ষিক ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি, জাতীয় বিনিয়োগের হারে মোট জাতীয় উৎপাদনের ২৫% এ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের হার ২১% এ উন্নীত করা। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বার্ষিক ৪.৩৭ শতাংশ হারে এবং শিল্পোৎপাদন বার্ষিক ৮.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা। এর আগে পর্যন্ত সব পরিকল্পনাতেই কর্মসংস্থানের তুলনায় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের ওপরই বেশী গুরুত্ব ছিল। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনার মডেলে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রধান প্রয়োজন হল সাধারণ মানুষের আয় এবং ভোগব্যয় বাড়ানো তাই কর্মসংস্থানে বৃদ্ধির ওপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সমাজের দুর্বলতম মানুষদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যসংস্থানের লক্ষ্যে "খাদ্যের জন্য কাজ" (Food for work) কার্যক্রম এবং ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্প (Minimum needs programme) গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম শর্ত হল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা— এই বৃদ্ধির হার বজায় রেখে যদি দরিদ্র মানুষের ভোগব্যয় বাড়াতে হয় তাহলে করব্যবস্থার পরিবর্তন এবং আরও কোন কোন কর্মসূচি নিয়ে ধনীদের ভোগব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। যে মডেলের ওপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তার মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কারণ এর সময়সীমা ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত। পরিকল্পনার চূড়ান্ত দলিল প্রস্তুত হয় শুরু হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পর এবং তার পর দেড় বছর বাদেই রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে এটি বাতিল হয়ে যায়। এইসময় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও বেড়েছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে ঘাটতি কমে গিয়েছিল কিন্তু বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করে আর্থিক সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছনর আশা পূরণ হয়নি। প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অভাব থাকলে কোন তাত্ত্বিক মডেলই যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না তা প্রমাণ হল।

৫৪.৫ অষ্টম পরিকল্পনার মডেল

অষ্টম পরিকল্পনার মডেলে সূচিত হয়েছে পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী। এখন থেকেই ক্রমশ বাজারের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। যে পরিস্থিতিতে এই পথ বদল করতে হয় তা সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা আর বৈদেশিক বাণিজ্যে সংকটের কারণে। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের ঋণ পরিশোধ যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, স্বভাবতই তৎকালীন সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। ১৯৯১ সালে নূতন অর্থনৈতিক নীতির পত্তন হয় এবং সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই অষ্টম পরিকল্পনা রচিত হয়। দলিলে একে "একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজার পরিচালিত অর্থনীতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিকে পরিচালনার একটি পরিকল্পনা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (This plan is a plan for managing the changes, for managing the transition from a centrally planned

economy to a marketed economy without tearing our socio-cultural fabrics"— The Eighth Five year plan (1992-97) vcol-I। আপনারা জানেন যে সরকারের ভূমিকার দিক থেকে বিচার করলে পরিকল্পনা দুধরনের হয়— অনুজ্ঞামূলক (imperative) আর ইঙ্গিতদায়ী (indicative)। অষ্টম পরিকল্পনাতে এই ইঙ্গিতদায়ী পরিকল্পনার মডেল ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পরিকল্পনা অনেকখানি নমনীয় হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাজার প্রক্রিয়ার ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করার কথা ভাবা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিও মোটামুটি বাজারনীতির দ্বারাই প্রভাবিত হবে যদি না দরিদ্রতম মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য এর কোন পরিবর্তন দরকার হয়।

আগের মত সরকার আর আদেশের জোরে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন না বরং সরকারের নির্দেশমত মূলত বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগে পরিকল্পনা রূপায়িত হবে।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণও এই মডেলের অন্যতম উপাদান ছিল। জেলা, ব্লক আর গ্রামস্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং তার মাধ্যমে সাক্ষরতা, পরিবার কল্যাণ, পতিতজমি উদ্ধার, পশুপালন, মৎস্যচাষ, সামাজিক বনসৃজন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য এই পরিকল্পনায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

যেহেতু অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ প্রত্যাহার করে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছিল তাই এর জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল পরিকাঠামোর উন্নতি করা। এই উদ্দেশ্যে সেচ, শক্তি, পরিবহন ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়। দেশের বিপুল জনসমষ্টি যেহেতু আমাদের 'সম্পদ' হয়ে ওঠেনি তাই এই পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর জন্য দরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের সুযোগ বাড়ানো আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা। শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা আর ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলার লক্ষ্য ধার্য হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথাসিদ্ধ এবং প্রথাবহির্ভূত দুধরনের শিক্ষাপদ্ধতিই গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া জোর দেওয়া হয়েছে কারিগরী শিক্ষার ওপর, নারীশিক্ষা বিস্তারের ওপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ঘটিয়ে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্র ২০০০ সালের মধ্যে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এই লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ছিল মূল লক্ষ্য। দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নেওয়া আগের কর্মসূচিগুলি বহাল রাখা হয়। এছাড়া গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করা, দরিদ্রদের বাসস্থান ও ন্যূনতম খাদ্যের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছিল। তবে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর। সমগ্র পরিকল্পনার সময় স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশ হবে অনুমান করে বছরে গড়ে ৮০ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে আশা করা হয়েছিল। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এমন সব প্রকল্প নেওয়া হবে যেখানে

নিয়োগের উৎপাদন স্থিতিস্থাপকতা (এক শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পিছু নিয়োগ বৃদ্ধির শতকরা হার) অপেক্ষাকৃত বেশী। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে এই স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পেয়েছিল এই ত্রুটি সংশোধন করার বিশেষ চেষ্টা এই সময় করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে নিয়োগের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য নানারকম প্রকল্প যেমন পতিত জমি উদ্ধার, যেখানে সেচের সুযোগ সীমিত সেখানে শুষ্ক চাষের প্রসার, মুরগি পালন, মাছ চাষ, দুধ ও দুধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি নেওয়া হয়। সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত আঙ্গিক নির্বাচনের (choice of technique) মাধ্যমে অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থনিয়োগ সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নত কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়। পরিবহনের ক্ষেত্রে নিয়োগে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর কথা বললেও তা কী করে হবে তা নিয়ে কোন রূপরেখা রচিত হয়নি। পরিমাণগত দিক দিয়ে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অনুমিত হার ছিল ৫.৬%, কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩.১ এবং ৭.৬ শতাংশ। বাস্তবক্ষেত্রে অষ্টম পরিকল্পনার জাতীয় আয় বেড়েছে ৬.৫ শতাংশ হারে, লক্ষ্যের চেয়ে বেশী। কৃষিতে উৎপাদন বাড়লেও আরো বৃদ্ধির পথ প্রতিবন্ধক ছিল কৃষি পরিকাঠামো। যে সংস্কার কর্মসূচি নব্বই-এর দশকের গোড়াতেই গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে প্রধান ছিল শিল্পনীতির সংস্কার। কিন্তু আশির দশকের তুলনায় এ সময় শিল্পে অগ্রগতির হার কমেই যায় তার কারণ নূতন নীতির অঙ্গ হিসেবে সরকার তার বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে এনেছিলেন কিন্তু সেই শূন্যস্থানে তেমনভাবে বেসরকারী বিনিয়োগ প্রসারিত হয়নি। ঋণ সংকোচন, সুদের হার বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এই সমস্তই শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিকাঠামো গঠনের কাজও তেমন সন্তোষজনক হয়নি। উৎপাদনের নিয়োগ স্থিতিস্থাপকতাও তেমনভাবে বাড়েনি, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল— সব মিলিয়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যপূরণ হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তথাকথিত বিদায়নীতি যাকে বলা হয় "সোনালী করমর্দনের" (golden handshake) নীতি ফলে দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাই বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তি দেখা গেলেও একথা মেনে নিতেই হবে যে অষ্টম পরিকল্পনায় যে উদার অর্থনীতির মডেল নেওয়া হয়েছিল তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ তেমন কিছুই লাভ করেনি এবং আপেক্ষিকভাবে দেখলে দরিদ্রদের অবস্থার আরও অবনমনই ঘটেছে।

৫৪.৬ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) "কোন পরিকল্পনার সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের নাম যুক্ত আছে?

(খ) মহলানবিশের মডেলের চারটি ক্ষেত্র কী কী?

(গ) চতুর্থ পরিকল্পনার সঙ্গে প্রধানত কোন অর্থনীতিবিদের নাম যুক্ত?

(ঘ) পঞ্চম পরিকল্পনায় আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এই দুই-এর মধ্যে কোনটির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

(ঙ) লিওনটিয়েফের মডেলকে ভিত্তি করে কোন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে?

(চ) আগের পরিকল্পনাগুলির তুলনায় অষ্টম পরিকল্পনার মূল পার্থক্য কী?

২। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) দ্বিতীয় পরিকল্পনার মডেলটির বিস্তারিত বিবরণ দাও।

(খ) চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্যাডগিল যে মডেল ব্যবহার করেছিলেন তার পটভূমিকা কী ছিল? মডেলটির বিবরণ দাও।

(গ) পঞ্চম পরিকল্পনায় কোন কোন ক্ষেত্রের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? এই পরিকল্পনায় ব্যবহৃত মডেল কতখানি সাফল্য লাভ করেছে আলোচনা কর।

(ঘ) অষ্টম পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকারেরা যে পথ বদল করলেন তার প্রকৃতি কী? কোন পরিস্থিতিতে এই বদলের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন?

৫৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. গৌতম কুমার সরকার — *ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আর্থিক বিকাশ;* ১৯৯৬ (জয়দুর্গা লাইব্রেরী)

২। অনিন্দ্য ভুক্ত—*ভারতীয় পরিকল্পনার চার দশক,* ১৯৯৯ (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স)

৩। Dhiresh Bhattacharya— *India's Five year Plans — An Economic Analysis, 1990* (Joydurga Library)

৪। R. Dutt. and KPM Sundharam — *Indian Economy, 1999* (S. Chand and Company Ltd.)

একক ৫৫ □ দারিদ্র্য ও বেকারী

গঠন

৫৫.০ উদ্দেশ্য

৫৫.১ প্রস্তাবনা

৫৫.২ ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যা ও পরিমাপ

৫৫.৩ বেকারত্বের পরিমাপ

৫৫.৪ প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকারত্ব

৫৫.৫ বেকারত্ব মোকাবিলা করার জন্য কার্যক্রম

৫৫.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী

৫৫.৭ অনুশীলনী

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন

- আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এবং তা মাপবার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী?
- বেকারীর পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়।
- গ্রামে ও শহরে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেগুলির আলোচনা ও কার্যকারিতা কতখানি।
- গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্য দূর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি মূল সমস্যার কতটা সমাধান করতে পেরেছে।

৫৫.১ প্রস্তাবনা

ভারতের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হল কয়েক শতাব্দীর উত্তরাধিকার। ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে আছে যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ভারতের প্রথম প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। সত্তরের দশক থেকে 'গরীবী হঠাও" কে পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত দারিদ্র্যই দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

৫৫.২ ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যা ও পরিমাপ

দারিদ্র্যের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার করা যায়। ভারতে দারিদ্র্য বিচার করার জন্য জীবনযাপনের নিম্নতম প্রয়োজনকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তার মানে দারিদ্র্যরেখা এমন একটি সীমা যার নীচে আয় থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হয় না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণই এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "আপেক্ষিক বঞ্চনা"র ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ একজন লোক যে সঙ্গতি ও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, একই পরিবেশে আর একজন লোক যখন তা পাচ্ছে না তার অবস্থা আগের লোকটির তুলনায় নিশ্চয় খারাপ। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল জিনিষগুলি থেকে একজন লোক যদি পুরোপুরি বা আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত হয় তাহলেই সে দরিদ্র।

ভারতে দারিদ্র্য সীমার সংজ্ঞা এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা জনসংখ্যার অনুপাত সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য আছে কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রসার ঘটেছিল, তারপর থেকে সংখ্যানুপাতে দারিদ্র্য কমেছে যদিও দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচেই আছে।

দারিদ্র্য মাপার জন্য সরকারী ও বেসরকারী নানা স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৬২ সালে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন একটি কার্যকরী দল (working team) গঠন করে। তাদের মতে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে জনপ্রতি মাসিক ২০ টাকা খরচকে একটি সীমারেখা ধরা যেতে পারে যার নীচে চলে গেলে জনসাধারণ দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। এই সীমা নির্দিষ্ট করার ভিত্তি কি তা অবশ্য খুব পরিষ্কার করে বলা হয়নি এছাড়া গ্রাম ও শহরের হিসেবের মধ্যেও কোন পার্থক্য করা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা দারিদ্র্য মাপার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই National Sample Survey-র দেওয়া তথ্য (data) ব্যবহার করেছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও পরিমাপের পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য তাঁদের পরিমাপে পার্থক্য দেখা যায়। অর্থনীতিবিদ মিনহাস .(Minhas) পরিকল্পনা কমিশনের মাপটি গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁর মতে শহরাঞ্চলে বার্ষিক ২৪০ টাকায় (মাসিক ২০ টাকায়) যা ভোগ করা যায় তা ভোগ করতে গ্রামে লাগে ২০০ টাকা তাই গ্রামে এই ২০০ টাকাকেই সীমা

হিসাবে ধরা উচিত। এই মাপ গ্রহণ করলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামবাসীর সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৫ শতাংশ থেকে কমে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যাপক বর্ধনের মত এ বিষয়ে বিপরীত। তিনি ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে মাসিক মাথাপিছু ১৫ টাকা আয়কে সীমা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেই অনুযায়ী গ্রামে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৩৮ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে হয়েছে শতকরা ৫৪ ভাগ।

ড. দান্তেকর এবং রথ মনে করেন একজন লোকের বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজন হল ২২৫০ একক ক্যালোরি। সেই মানদণ্ডে ১৯৬৮-৬৯ সালে গ্রামের অধিবাসীদের শতকরা ৪০ ভাগ এবং শহরের অধিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল।

শ্রী পি ডি ওঝার মতে প্রয়োজনীয় ২২৫০ একক ক্যালোরি পেতে গেলে ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে শহরে দরকার মাথাপিছু ১৫ থেকে ১৮ টাকা এবং গ্রামে দরকার ৮ থেকে ১১ টাকা। সেই হিসেবে জনসমষ্টির ৪৪ শতাংশ মানুষ ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। তাঁর হিসেব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পুষ্টির ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে গেছে তাই ১৯৬০-৬১ সালে যেখানে গ্রামের শতকরা ৫২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল, ১৯৬৭-৬৮ সালে সেই অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশে।

বিশ্বব্যাঙ্কের এম এস আলুওয়ালিয়াও ভারতীয় গ্রামীণ দারিদ্র্যর গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনিও ১৯৬০-৬১ সালের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয়ের সীমা ধরেছেন গ্রামাঞ্চলে ১৫ টাকা ও শহরাঞ্চলে ২০ টাকা। তিনি দেখিয়েছেন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি গ্রামীণ দরিদ্রদের অনুপাত ছিল ৫০ শতাংশ। সেই অনুপাত পরবর্তীকালে কমা বাড়া হয়েছে এবং তা হয়েছে কৃষিজ উৎপাদনের উন্নতি অবনতির সঙ্গে তাল রেখে।

১৯৭৭ সালে ভারত সরকার একটি Task force গঠন করে তাদের দারিদ্র্য সীমা চিহ্নিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত এর প্রতিবেদনে ১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে এই সীমা ধরা হয়েছিল মাসিক ৭৬ টাকা ও শহরাঞ্চলে ৮৮ টাকা। এই হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৯-৮০ সালে জনসংখ্যার মোট ৪৮.৪৪ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমের ফলে ১৯৮৪-৮৫ সালে এই পরিমাণ কমে ৩৭ শতাংশ হয়। জাতীয় নমুনা সংস্থার প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী দরিদ্রের সংখ্যানুপাত আরও কমেছে কিন্তু এই পরিসংখ্যান থেকে চিত্রটা পরিষ্কার হয়না কারণ এই সময় দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই গেছে। পরে নবম পরিকল্পনায় যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ১৯৮৭-৮৮ সালে দারিদ্র্য সীমার নীচে লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৮.৯ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে তা নেমে ৩৬ শতাংশ হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। (গ্রন্থপঞ্জীর চতুর্থ বই Datt and Sundharam, Indian Economy (1999)

পৃ. ৩৪০ দ্রষ্টব্য)। দারিদ্র্যসীমার নির্ধারণ বা জনসংখ্যায় দরিদ্রের অনুপাতের বিষয়ে সরকারী হিসেবের সঙ্গে বেসরকারী হিসেবের পার্থক্য আছে। অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ বিষয়ে নানামত আছে তবে এ বিষয়ে কোন দ্বিমতই নেই যে দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠীর এখনও জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য হয়নি। আরও একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যায় শহরের তুলনায় গ্রামের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য আরও বেশী গভীর এবং ব্যাপক।

৫৫.৩ বেকারত্বের পরিমাপ

দারিদ্র্যের সমস্যা ও বেকারত্বের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেকার বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন লোককে যার কাজ করার প্রয়োজন এবং ইচ্ছে দুই-ই আছে অথচ সে কাজ পাচ্ছে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই সমস্যার তীব্রতা বেশী হলেও উন্নত দেশেও নানা কারণে বেকারত্ব দেখা যায়। যেমন ব্যবসার ওঠানামার ফলে সেখানে শিল্প শ্রমিকের নিয়োগের তারতম্য দেখা যায় .(cyclical unemployment)। আবার অনেক সময় শিল্পের সংগঠনগত পরিবর্তন বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সময় শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা যায় (frictional unemployment)। ভারতের মত দেশে বেকার সমস্যা মূলত উদ্ভূত হয় মূলধন বা সম্পদের স্বল্পতা থেকে যার জন্য দেশের এক বিরাট জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যায় না। গ্রাম ও শহরের মধ্যে আবার বেকার সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বেকারত্ব মাপার জন্য বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে নানা ধরনের অসঙ্গতি থাকায় বেকারত্বকে ঠিকমত পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণত দশ বছর পরপর জনগণনার (census) বিবরণ, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National sample survey) আর কর্মবিনিয়োগ সংস্থার (Employment exchange) রেজিস্টার— এই তিনটি উৎস থেকে বেকারী পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও বিভিন্ন পরিমাপ থেকেই এই সমস্যার তীব্রতা বুঝতে পারা যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে মরশুমী বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়। কৃষিকাজের মরশুমী চরিত্রের জন্য বছরের কয়েকমাস কৃষিজীবিরা কর্মহীন হয়ে থাকে। গ্রামীণ শিল্পগুলিতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ এমন নয় যাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে কাজ দেওয়া যায়। এছাড়া কৃষিতে বিশেষত পরিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত খামারে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক সময়ই বেশী লোক কাজ করে যাদের উৎপাদন থেকে সরিয়ে নিলেও উৎপাদনের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এরকম প্রচ্ছন্নভাবে কর্মহীনের সংখ্যা গ্রামে প্রচুর। শহরাঞ্চলেও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দেশে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

বেকারত্বের পরিমাপ করার জন্য ১৯৭০ সালে শ্রী বিজয় ভগবতীর সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি

(commitee of experts on unemployment) গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৮.৭ মিলিয়ন। Datt Sundharam Indian Economics (1999) (পৃ. ৩৭০ দ্রষ্টব্য)। এই কমিটি জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থাকে কর্মনিয়োগ ও কর্মহীনতা সংক্রান্ত ধারণাগুলিকে সরলীকরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়। এই সংস্থার দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ীই পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশন বেকারত্বের পরিমাপ করেছে। তিন ধরনের কর্মহীনতার ধারণা এই পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ক) প্রচলিত পদমর্যাদা সংক্রান্ত কর্মহীনতা (Usual status unemployment) (খ) সাপ্তাহিক পদমর্যাদা সংক্রান্ত কর্মহীনতা (weekly status unemployment) আর (গ) দৈনিক পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট কর্মহীনতা (Daily status unemployment)। প্রচলিত পদমর্যাদা সংক্রান্ত কর্মহীনতার হিসেব করা হয় একবছরের সমীক্ষার ভিত্তিতে। কর্মহীনতার এই ধারণাটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় যে কর্মক্ষম ব্যক্তিরা সারা বছর ধরে কাজ পায় না। কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি যদি সারা সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যও কাজ না পায় তাকে সাপ্তাহিক পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট কর্মহীন বা বেকার বলে ধরা হবে। এই ধরনের বেকারত্ব স্বভাবতই অস্থায়ী। দৈনিক পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট বেকারত্বও অস্থায়ী আর শেষোক্ত এই দুটি ধারণাই মরশুমী ও আংশিক কর্মহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৬১ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব বা প্রচলিত পদমর্যাদা সংশ্লিষ্ট কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি ৫৩ লক্ষে দাঁড়ায়। শতাংশের হিসেবে এই হার ছিল ৩.৭৭ শতাংশ। সাপ্তাহিক পদমর্যাদা সংক্রান্ত কর্মহীনতা আর দৈনিক পদমর্যাদা সংক্রান্ত কর্মহীনতার হার ছিল যথাক্রমে ৪.৮০ শতাংশ এবং ৬.০৯ শতাংশ।

সূত্র : *সম্পৎ মুখার্জী ও দেবেন্দ্র মুখার্জী 'সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি' (১৯৯৮) পৃ. ১৭৭*

সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রে যারা কর্মপ্রার্থী হিসেবে নাম লিখিয়েছে তাদের একটি হিসেব নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

(লক্ষের হিসেবে)

	শিক্ষিত	অদক্ষ শ্রমিক এবং অন্যান্যরা	মোট
১৯৬১	৫.৯০	১২.৪৩	১৮.৩৩
১৯৭১	২২.৯৬	২৮.০৪	৫১.০০
১৯৮১	৯০.১৮	৭৫.৬৬	১৬৫.৮৪
১৯৯১	২২৪.৩৪	১৩৮.৬৬	৩৬৩.০০

উৎস — *Basic statistics relating to the Indian Economy, August 1994*

এই হিসেব থেকে বেকারের সঠিক সংখ্যা সবসময় বোঝা যায় না। এর মধ্যে অনেকে হয়তো আছেন যাঁরা ঠিক বেকার নন আরও ভালো কাজের আশায় নাম লিখিয়েছেন, চাকরী পেয়েও নাম কাটাননি এমন অনেকেও

আছেন, আবার বেকার অথচ কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লেখাননি এমন বেকারের অস্তিত্বও আছে। সে যাই হোক দেশের অর্থনৈতিক প্রসার সত্ত্বেও বেকার সমস্যার মোকাবিলা যে তেমনভাবে করে ওঠা যায়নি এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

৫৫.৪ প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকারত্ব

পূর্ণ বেকারত্ব ছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রধান সমস্যা হল প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। কাজ পেয়েও যারা বেকার থাকে তাদেরই বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকার। এই ধারণাটির উল্লেখ আগেও করা হয়েছে, এখানে আর একটু বিস্তৃতভাবে এর আলোচনা করা হবে।

সাধারণত অনগ্রসর গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। ধরা যাক একটি খামারে কিছু শ্রমিক কাজ করছে। যদি দেখা যায় তাদের মধ্যে কয়েকজনকে সরিয়ে আনলেও (মূলধনের ব্যবহার ও শ্রমিকের দক্ষতায় কোন পরিবর্তন হয়নি ধরে নিয়ে) সেই খামারের উৎপাদন কমছে না তখন বুঝতে হবে যাদের সরিয়ে আনা হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নেই অর্থাৎ এদের উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য। তাই কাজে নিযুক্ত থাকলেও এদের প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকার বলা হয়। পারিবারিক ভিত্তিতে কাজ হয় এমন সব খামারে, কুটির শিল্পে বা ছোট ব্যবসায়ে এ ধরনের বেকার দেখা যায়। অর্থনীতিবিদদের অনেকের ধারণা যে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত লোকদের প্রায় এক পঞ্চমাংশই ছদ্ম বেকার যদিও এর কোন সঠিক গাণিতিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এছাড়া পুঁজির অভাব, উৎপাদনের পুরোনো যন্ত্রপাতি, সেকেলে উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল ইত্যাদির জন্য দেশের শিল্পে ও নানা পেশায় নিযুক্ত মানুষের শ্রমশক্তি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, এটাও একধরনের প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার সমস্যা। এই প্রচ্ছন্ন কর্মহীনেরা এক অব্যবহৃত বিপুল শক্তি যাদের কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তারা সেখানে কাজ করে যেখানে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তারা ভরণপোষণ পেত। এখন তাদের সেখান থেকে সরিয়ে এনে যদি অন্য কাজে নিয়োগ করা যায় তাহলে বাড়তি খরচ না করেই দেশে মূলধন গঠন করা যাবে।

৫৫.৫ বেকারত্ব মোকাবিলা করার জন্য কার্যক্রম

যে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের নীতিগুলি দুধরনের হয়—স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। সরকারের গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী কোন সূত্র পাওয়া যায় না তবে স্বল্পমেয়াদী কিছু কিছু নীতি গ্রহণ করে সরকার এই সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলি যে গাণিতিক মডেলের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল সেখানে কর্মনিয়োগ নামে চলটির (variable) ওপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটলে এবং মূল ভারী শিল্পের উন্নয়ন হলে নিয়োগ সৃষ্টি হবে নিজের থেকেই (automatic)। তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি, কুটির, ক্ষুদ্রশিল্প এবং সমাজোন্নয়ন কর্মসূচীগুলিও বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান করতে পারেনি। প্রতিটি পরিকল্পনাতে নিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও বেকারত্বের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলছিল। বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আলাদা করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে এটা পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে পরিকল্পনাকারেরা উপলব্ধি করেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তীকালেও কিছু নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যদিও পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ পরিকল্পনা (employment planning) এখনও প্রণয়ন করা হয়নি তাই বেকার সমস্যার পূর্ণ সমাধান এখনও অনেক দূরে।

১৯৬০-৬১ সালে গ্রামীণ জনশক্তি কর্মসূচী (Rural manpower programme) প্রবর্তিত হয় এবং ৬৪-৬৫ সালের শেষে ১০০০টি সমাজ উন্নয়ন ব্লককে এর আওতায় আনা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা তেমনভাবে পূরণ হয়নি। ১৯৭১ সালে নেওয়া হয়েছিল গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য জরুরী প্রকল্প (Crash schemes for Rural employment)। এর উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পে বছরে দশমাস কাজের সময় ধরে নিয়ে প্রতি জেলায় গড়ে এক হাজার লোককে মাসিক ১০০ টাকার মধ্যে মজুরী দিয়ে কাজ দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকরা নিযুক্ত হয়েছিল রাস্তাঘাট নির্মাণে, ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প, বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কাজে। চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু ছিল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুলতা ছাড়াও কখনই খুব সুসংগতভাবে এ কাজ করা হয়নি।

১৯৮০ সালে একটি কর্মসূচী প্রবর্তিত হয় যার নাম দেওয়া হয়েছিল সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (Integrated Rural Development Programme)। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় প্রতি ব্লকে গড়ে ৩০০০ পরিবার ধরে মোট দেড় কোটি পরিবারকে সাহায্য করার কথা এখানে ঠিক হয়েছিল। ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত এই খাতে ৪৮৪.৬৫ কোটি টাকা খরচ করে ২৮/২৯ লক্ষ পরিবারকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় প্রায় ১৮ লক্ষ পরিবার এর থেকে উপকৃত হয়। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮ লক্ষ। এছাড়া ষষ্ঠ পরিকল্পনার মাঝখানে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবার থেকে অন্তত একজনকে বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প (Rural Landless Employment Programme) চালু করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে এর জন্য যথাক্রমে ১০০ কোটিও ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় এর জন্য মূল বরাদ্দ ছিল ১৭৪৪ কোটি টাকা এবং এর ফলে এই সময় ১০১৩ মিলিয়ন, ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ 'কর্মদিবস' সৃষ্টি হবে এরকম লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। কর্মসংস্থানের দিক

থেকে দেখলে এই সময় প্রকল্পটি তার লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সামাজিক বনসৃজন, বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে এখানে কাজ সৃষ্টি করা হয়। বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (Food for work Programme)। গ্রামীণ বেকার সমস্যার তীব্রতা সাময়িকভাবে কমানোর জন্য ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্প চালু হয়। দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছে তাদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিয়ে তার বদলে অর্থ না দিয়ে খাদ্যশস্য দেওয়া হবে এটাই ছিল এই প্রকল্পের মূলকথা। এই নীতি গ্রহণের দুটি উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত গ্রামের কর্মক্ষম বেকার পুরুষ ও নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া আর দ্বিতীয়ত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যকে কাজে লাগিয়ে সমাজে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ওপর এই প্রকল্প রূপায়ণের ভার দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে যে সব কাজ হত তা হল রাস্তাঘাট, স্কুল বাড়ি ইত্যাদি তৈরী বা মেরামত করা, জলনিকাশের ব্যবস্থা করা, নলকূপ বসানো, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। ১৯৮০ সালের ২রা অক্টোবর 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প তুলে দিয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবর্তিত হয় জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী (National Rural Employment Programme), কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে এর খরচ মেটাবে। জনপ্রতি দৈনিক মজুরীর পরিমাণ ১ কিলোগ্রাম খাদ্যসামগ্রী হবে বলে ঠিক করা হয়। কর্মসংস্থানের দশ শতাংশ নির্দিষ্ট করা হয় তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য। এর আওতায় যারা আসবে তারা আগের প্রকল্পের মতই রাস্তাঘাট নির্মাণ, নলকূপ নির্মাণ, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবে ঠিক হয়েছিল। অনেক আশা নিয়ে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনার হিসাবে দেখা গেছে যে খরচের তুলনায় এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে কম। আসলে প্রয়োগের ব্যাপারে এই প্রকল্পে অনেক ত্রুটি ছিল— সরকারের বিভাগীয় কাজকর্ম যেভাবে চলে সেভাবে চালাতে গিয়ে এর আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া এই কর্মসূচীতে কর্মসংস্থান হয় স্বল্পকালের জন্য এবং মজুরীও খুব নিম্নস্তরের তাই এর মাধ্যমে যথার্থ অর্থবহভাবে বেকারত্বের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই প্রকল্পের পরিপূরক হিসেবে আর একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়— গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (Rural Landless Employment guarantee Programme)। ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য চালু হয় জওহর রোজগার যোজনা (Jawhar Rojgar Yojana) আর পূর্ববর্তী প্রকল্প ছটি (NREP এবং RLEGP) এই যোজনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের টাকা ৮০ : ২০ অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সরবরাহ করবে। এই পরিকল্পনাতে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণকে কাজ দেওয়ার সময় তপসিলী জাতি ও উপজাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আর ত্রিশভাগ কাজের সুযোগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ব্লক সমিতির ওপর। এর লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা আর ভবিষ্যতে উৎপাদনে সাহায্য করতে

পারবে এরকম উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যেমন মজা পুকুরের সংস্কার, সেচনালা তৈরী ইত্যাদি। এছাড়া জোর দেওয়া হয়েছিল বনসৃজনের ওপর। বেকারত্বের মোকাবিলা করার পক্ষে এই প্রকল্প খুব উপযোগী নয় কারণ দরিদ্র মানুষকে কৃষি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বেকারী দূর করা মুশকিল। ১৯৯১-৯৪ আর্থিক বছরে নিয়োগ সংস্থানে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নেওয়া হয় নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (Employment Assurance Scheme)। এর ভিত্তি ছিল ১৯৭২-৭৩ সালে নেওয়া মহারাষ্ট্রের কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (Pilot Employment guarantee scheme of Maharashtra)। গ্রামের অদক্ষ শ্রমিকদের বছরে অন্তত ১০০ দিন কাজ সুনিশ্চিত করা ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। পরিবার পিছু অন্তত দুজন (১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের) লোক যাতে কাজ পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায় যে এই কর্মসূচী অনুযায়ী ৫২৭৮ কোটি টাকা খরচ করে ২৫.৯ মিলিয়ন লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বছরে ১০০ দিনের বদলে তারা কাজ পেয়েছে মাত্র ৪১.৩ দিন।

শহর অঞ্চলের বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রচনা করা হয়।

(ক) শহর অঞ্চলের গরীবদের জন্য স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান প্রকল্প (The Self Employment Programme for the Urban Poor or SEPUP)।

(খ) শহর অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকদের জন্য স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান প্রকল্প (Scheme for self employment to the Educated Urban Youth or SEEUY) এবং (গ) নেহরু রোজগার যোজনা (Nehru Rojgar Yojana or NRY)। প্রথম প্রকল্পটি ১৯৮৬ সালে চালু হয়। এতে দশ হাজার বা তার চেয়ে বেশী জনসমষ্টি সম্পন্ন শহরে গরীব কর্মপ্রার্থীদের ব্যাঙ্ক থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ঋণের ওপর ২৫% ভর্তুকী দেবেন। দ্বিতীয় প্রকল্পটি ১৯৮১-৮৪ সালে চালু হয়। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকার নীচে সেই পরিবারের ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষিত যুবকদের এই প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নেহরু রোজগার যোজনার আরম্ভ ১৯৮৯ সালে। এই প্রকল্প থেকে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া হয়, এছাড়া দশলক্ষ লোকের চেয়ে কম জনসমষ্টি সম্পন্ন শহরে দরিদ্রদের কিছু মৌল সুবিধা ও মজুরীর বিনিময়ে কাজ দেওয়া হবে। ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে ছোট কারখানা গড়ার জন্য ৩২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং ১.৬০ লক্ষ লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছিল।

উপরে যে সব নীতি বর্ণনা করা হল তার প্রায় সবগুলিই সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী। তাছাড়া দুর্নীতি ও অশুভ রাজনীতির খেলায় এই স্বল্প মেয়াদী নীতিগুলিও সঠিকভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। ২০০০ সাল নাগাদ মোট ১০ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে। এই বিপুল কাজের জন্য যে ধরনের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ নেওয়া দরকার তা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

৫৫.৬ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী

ভারতের অর্থনীতিতে দারিদ্র্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলেও স্বাধীনতার পরে অনেকদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়নি। প্রথম চারটি পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বিকাশের ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল কারণ তখন পরিকল্পনাকারদের বিশ্বাস ছিল যে অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের প্রকোপ কমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অন্তত নীতিগতভাবে পরিকল্পনাকারেরা দেশে বিনিয়োগ ও বণ্টন এমনভাবে করতে চাইলেন যাতে অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যও সুনিশ্চিত হয়। দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচীগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে।

১। দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ যেহেতু বেকারত্ব তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর অনেকখানিই জুড়ে আছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বেশী তাই ১৯৭০ সাল থেকে গ্রামীণ বেকারত্ব হ্রাসের জন্য নানারকম চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব কর্মসূচীগুলি আগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম (GRDP), জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কার্যক্রম (NREP), গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত কার্যক্রম (RLEGP), জওহর রোজগার যোজনা (JRY) ইত্যাদি। এরমধ্যে GRDP কার্যক্রমটির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্য সীমার নীচ থেকে তুলে আনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তবে এই কর্মসূচীটিকে খুব সফল বলা যায় না। সপ্তম পরিকল্পনায় চলতি মূল্যস্তরে ৬৪০০ টাকাকে দারিদ্র্যের সীমারেখা বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই অনুযায়ী মাত্র ১৩ শতাংশ পরিবার এই কর্মসূচীটির সুবিধা পেয়েছে। এছাড়া ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে জনসাধারণের যতটা উৎসাহ ছিল, ঋণ কাজে লাগানোর ব্যাপারে তারা ততটা আগ্রহ বা দক্ষতা দেখাতে পারেনি। NREP কার্যক্রম চালু হয়েছিল তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে— গ্রামের দরিদ্রদের জন্য লাভজনক অতিরিক্ত র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করা, স্থায়ী সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করা, গ্রামীণ এলাকার জীবনের গুণগত মান বাড়ানো। এতে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলি মহিলাদের সাহায্য করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সাহায্যে শুরু হয় RLEGP। এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক পরিবারের অন্তত একজন সদস্য যাতে বছরের ১০০ দিন কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। NREP আর RLEGP এই দুটি প্রকল্পের সংযুক্তি ঘটিয়ে ১৯৮৯ সালে চালু করা হয় জওহর রোজগার যোজনা। এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ওপর।

শহরাঞ্চলের দরিদ্র ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে চালু হয় শহরের দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য স্বনিযুক্তি কর্মসূচী (SEPUP), নেহরু রোজগার যোজনা (NRY), শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি কর্মসূচী (SEEUY) ইত্যাদি প্রকল্পগুলি।

২। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ সফল না হলেও কিছু নিয়োগবৃদ্ধি নিশ্চয় ঘটেছে কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সেটুকুই যথেষ্ট নয়। পঞ্চম পরিকল্পনায় এজন্য নেওয়া হয়েছিল ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের কর্মসূচী (Minimum Needs Programme)। এই কর্মসূচী পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও অব্যাহত ছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে কারণ তাঁর অর্থনীতি চর্চার অনেকখানি জুড়ে আছে দরিদ্র মানুষের সমস্যা। তিনি দেখিয়েছেন নিছক জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে কখনই উন্নয়ন বলা যায় না, উন্নয়ন মানে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন যা নির্ভর করে শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং আরও অনেক কিছুর ওপর। বস্তুত MNP কর্মসূচীতেও এই চিন্তা করা হয়েছিল তাই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ, পুষ্টিবৃদ্ধির ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, জল সরবরাহ ইত্যাদি।

৩। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিশেষ অঞ্চলের জন্য কতকগুলি বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। বিশাল দেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা অনেকসময় বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হয় সেগুলির সমাধান করতে না পারলে সেই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। এই খাতে যে সব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে খরাপ্রবণ এলাকার কর্মসূচী (Dronght Provc Area Programme), মরুভূমি উন্নয়ন কর্মসূচী (Desert Development Programme) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪। দরিদ্র মানুষের ভোগের মাত্রাকে উন্নত করতে হলে তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের যোগানকেও নিশ্চিত করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের স্বল্পদামে ভোগ্যদ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে গেলে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে তাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা বিশেষ জরুরী। এরজন্য সরকার উৎপাদন বাড়ানো এবং মূল্যস্তরের গতি নিম্নমুখী করার জন্য যে সব ব্যবস্থা আছে সবগুলিই যৌথভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন।

সরকার নানাদিক থেকে দারিদ্র্যের সমস্যাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন যা অবশ্যম্ভাবী কেন স্বরূপ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যানুপাত কিছুটা কমেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দরিদ্রমানুষদের দারিদ্র্যরেখা নামে একটি কল্পিত রেখার ওপরে আনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দারিদ্র্যের (absolute proverty) অমর্ত্য সেন যাকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য বলেছেন (অমর্ত্য সেন : জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি পৃ. ১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৭ কলিকাতা) অবনমনই সমস্যার মূল সমাধান নয়। দারিদ্র্যসীমার নিচেও বিভিন্ন স্তর আছে— যাঁরা দারিদ্র্যসীমার ঠিক নীচে ছিলেন তাদের একটু চেষ্টা করলেই ওপরে আনা যায় তাতে পরিসংখ্যানগত উন্নতি দেখানো যায়। কিন্তু যাঁরা আরও নীচের স্তরে আছেন তাঁরা এখন কী অবস্থায় আছেন তার হিসেব না পেলে দারিদ্র্যের সঠিক

অবস্থাটা বোঝা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করার জন্য একটি সূচক গ্রহণ করেছেন যার নাম মানবিক বিকাশের মান (Human Development Index)। এই মান অনুযায়ী ১৯৯২ সালে পৃথিবীর ১৭৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১৩৫ তম। অনেকগুলি পরিকল্পনা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভারতের দারিদ্র্য পৃথিবীর মানচিত্রে কোন পর্যায়ে আছে এই সূচক থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

এতগুলি পরিকল্পনা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যে দরিদ্রদের সমস্যা তেমন করে নিরসন হল না তার জন্য সরকারের আরো বেশী উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রধানত দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে এগোনো দরকার। প্রথমত এমনভাবে দেশের উন্নয়নের হার বাড়ানো যাতে বিনিয়োগের হার বাড়ে এবং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের (Productive employment) ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক রঞ্জিত সাউ মনে করেন দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়াস কতটা সফল হবে তা নির্ভর করবে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে তার উপর।

দারিদ্র্য দূর করার জন্য দ্বিতীয় যে প্রচেষ্টাটি দরকার তা হল আয় ও সম্পদের বৈষম্যের হ্রাস করে দরিদ্রদের পক্ষে আর্থ সামাজিক অবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। এই দুটি চেষ্টাই সফল হবে যদি সরকার সঠিকভাবে নিম্নলিখিত নীতিগুলি কার্যকরী করতে পারে। ১. জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি, ২. করব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে আয় ও ধনের বৈষম্য হ্রাস, ৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ৪. বেকার সমস্যা সমাধানের যে সব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলির যথাযথ রূপায়ণ, ৫. নিত্য ব্যবহার্য ভোগসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দাম স্থিতিশীল রাখা, ৬. ব্যাপক ভূমিসংস্কার, ৭. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জীবনযাত্রার মান নির্ধারক দিকগুলি উন্নতি সাধন।

৫৫.৭ অনুশীলনী

১। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

নিচের উক্তিগুলি ঠিক কি ভুল বলুন?

(ক) দারিদ্র্যসীমা পরিমাপের জন্য সব অর্থনীতিবিদই এক অভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন।

(খ) প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব গ্রামাঞ্চলেই বেশী ব্যাপক।

(গ) দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ভারতে ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

(ঘ) বেকারের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্রের হিসেবই যথেষ্ট।

(ঙ) জওহর রোজগার যোজনা শহরাঞ্চলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।

(চ) দারিদ্র্যের সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল বেকারত্ব।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আমাদের দেশে দারিদ্র্যের দুটি মূল কারণ উল্লেখ করুন।

(খ) দারিদ্র্য পরিমাপ করার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বঞ্চনা কথাটির তাৎপর্য কী?

(গ) গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৃহীত তিনটি প্রকল্পের নাম করুন।

(ঘ) মরসুমী বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) কর্মহীনতা কত রকমের হতে পারে?

(চ) প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের ওপর একটি টিকা লিখুন।

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের দারিদ্র্যের বিষয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের হিসাবগুলি আলোচনা করুন। এদের মধ্যে কোন মিল আছে কি?

(খ) দারিদ্র্যসীমা কাকে বলে? দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সেগুলির বিবরণ দিন।

(গ) দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ বিষয়ে আপনার মত ব্যাখ্যা করুন। দারিদ্র্য দূরীকরণ করার জন্য যে কর্মসূচীগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি কি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট? এবিষয়ে আপনার মত কী?

(ঘ) প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। বলা হয় "দেশের প্রচ্ছন্ন কর্মহীনদের সাহায্যে কোন বাড়তি খরচ ছাড়াই অতিরিক্ত মূলধন গঠন করা যায়"— এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) ভারতে কী কী ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়? এই বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য দেশে কী কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বর্ণনা করুন।

৫৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. গৌতম কুমার সরকার — *ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও আর্থিক বিকাশ*, ১৯৯৬, জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

২। সম্পৎ মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী — *সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি*, ১৯৯৮, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড।

৩। Pramit Choudhury — *The Indian Economy, Poverty and Development, 1995*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

৪। R. Datt and KPM Sundharam — *Indian Economy, 1999*, S. Chand and Company Ltd.

একক ৫৬ □ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ ভারতীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গে উন্নয়ন ও জনসংখ্যা ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ

গঠন

৫৬.০ উদ্দেশ্য

৫৬.১ প্রস্তাবনা

৫৬.২ জনসংখ্যার ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

৫৬.২.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

৫৬.৩ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি

৫৬.৩.১ পরিবার পরিকল্পনা

৫৬.৩.২ অর্থনৈতিক প্রতিবিধান

৫৬.৩.৩ সামাজিক প্রতিবিধান

৫৬.৪ অনুশীলনী

৫৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন

- জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সব অর্থনৈতিক, সামাজিক আর পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি উপাদানগুলি কীভাবে জনসংখ্যা সমস্যাকে প্রভাবিত করে।

৫৬.১ প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ (Human resource) অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর পরিমাণ ও গুণাগুণের ওপর দেশে সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে। অন্য দিক থেকে দেখলে জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনও দেশের জনসাধারণের জন্যই। দেশের জনসংখ্যা বা মানবসম্পদ তাই একই সঙ্গে উন্নয়নের উপাদান ও লক্ষ্য। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ সম্পর্কে আলোচনার মূলকেন্দ্রে আছে বর্ধিত জনসংখ্যার সমস্যা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর এই বর্ধিত জনসংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যে কোন আর্থিক নীতি বিচার করার ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। এই সম্পর্কটি দুদিক থেকে বিচার করতে হবে ১. জনসংখ্যার ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব এবং ২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব।

৫৬.২ জনসংখ্যার ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে জন্মহার ও মৃত্যুহারের ওপর তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে এই দুটির মাধ্যমে। জন্মহার নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারী পুরুষের অনুপাত, নারীদের বিয়ের বয়স, সন্তানধারণ ক্ষমতার নিম্নতম বয়স, সন্তানধারণক্ষম বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি অনেকাংশেই দেশের ভৌগোলিক আর সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আবার অর্থনৈতিক চিন্তাও অনেক সময় সন্তানলাভের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। সাধারণত দরদ্রি পরিবারে সন্তান আয়ের উৎস বলে সেখানে জন্মহার বেশী হয়। গ্রামাঞ্চলে যেহেতু অনেক অর্থনৈতিক কাজকর্মই পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয় তাই সেখানে বেশী সন্তানের জন্ম লাভজনক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে এই চিত্র খুব দ্রুত বদলায় না তাই জন্মহার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে (একেবারে প্রথম অবস্থায় আগের তুলনায় কিছুটা অর্থনৈতিক স্থিতি জন্মহার বাড়াতেও পারে)। মৃত্যুহারের ওপর কিন্তু উন্নয়নের নিশ্চিত নিম্নমুখী প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই দুই কারণ মিলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে (Coale and Hoover) কোলে এবং হুভার Theory of Demographic Transition তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তনের কতকগুলি স্তর আছে। প্রথমস্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই বেশী থাকে বলে দেশে জনসংখ্যা মোটামুটি স্থিতাবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় স্তরে উন্নত দেশগুলি থেকে আসা চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, পরিবহনের প্রসার সব মিলে মৃত্যুহার কমিয়ে আনে কিন্তু তখনও জন্মহার তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এই স্তরকে জনবিস্ফোরণের স্তর (Stage of Population Explosion) বলা যায়। এই সময় জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে

দাঁড়ায়। তৃতীয় স্তরে মৃত্যুহার ও জন্মহার উভয়ই কমে আসে ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এই তত্ত্বটির সত্যতা প্রমাণ করে। ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই ছিল খুব বেশী কিন্তু তার পর থেকে মৃত্যুহার হ্রাস পেতে শুরু করে যদিও জন্মহার সামান্যই হ্রাস পেয়েছে ফলে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ ভারত এখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির দ্বিতীয় স্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জনগণনা (census) রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতি হাজারে বার্ষিক জন্মহার ও মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে ৪৮.১ এবং ৪২.৬। হিসাব অনুযায়ী ১৯৯২ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ২৯ এবং ১০। ফলে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল ২.১৪ শতাংশ (Economic survey 1996-97, Govt. of India Table 9.2 (Census data) + Dreze and Sen : India : Economic Development and social opportunity (1995) Table A.1)।

জনসংখ্যার ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় প্রভাব হল জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে জনসমষ্টির পুনর্বণ্টন। অনুন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের অধিকাংশই কৃষি অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষেত্রের জীবিকার ওপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বাড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৫১ সালে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল ৭২.১ শতাংশ লোক যা কমে ১৯৯১-এ দাঁড়িয়েছে ৬৬.৮৩ শতাংশ। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১০.৭ ও ১২.৭ শতাংশ আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৭.২ ও ২০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতে কৃষির তুলনায় কৃষিবহির্ভূত কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু উন্নত দেশের তুলনায় এই হার অনেকটাই কম। তার কারণ অবশ্যই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি প্রভাব হল নগরায়ন অর্থাৎ ক্রমশ বেশী লোক গ্রামের তুলনায় শহরবাসী হওয়া। এছাড়া অনেক সময় জনবিরল স্থানে সরকার শিল্পস্থাপন করে এবং সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে সেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। ভারতেও ১৯৬১ সালের পর থেকে শহরে লোকের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেড়েছে কিন্তু এই বাড়া কখনই তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ১৯৯১ সালের জনগণনা (census) অনুযায়ী ভারতে শহরে বাস করে মাত্র ২৫.৭ শতাংশ লোক সেখানে এই সংখ্যা ১৯৯২ সালে ৮৯% ইংল্যান্ডে, জাপানে ৭৭% এবং আমেরিকায় ৭৬% । দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ না বাড়ায় বর্ধিত জনসংখ্যা বেশিটাই গ্রামে থেকে গেছে এবং এখনও তাই ভারতের অর্থনীতি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতি।

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, জীবন সম্বন্ধে যুক্তিশীল ও সার্থক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটার কথা। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শ্রমের সচলতারও বৃদ্ধি ঘটে। ভারতের ক্ষেত্রে শ্রমের সচলতা আগের তুলনায় বেড়েছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন আকাঙ্খিত

উন্নতি হয়নি। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বই Dreze and Amartya Sen, India : Economic Development and Social opportunity (1995)-এ দেখিয়েছেন যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান নির্ধারণকারী অনেকগুলি মৌলিক বিষয়েই ভারতের অবস্থা উন্নত দেশগুলির তুলনাতেই শুধু নয় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালকে বাদ দিলে এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনাতেও অনেকটাই খারাপ।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার ওপর পরিমাণগত বা গুণগত কোন দিক দিয়েই প্রভাব ফেলতে পারে না।

৫৬.২.১ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

জনসংখ্যাবৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর দুধরনের প্রভাব পড়ে— একদিকে এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করে আবার কোন কোন দিক থেকে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এখন কোন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব অনুকূল হবে না প্রতিকূল হবে তা নির্ভর করছে কি অবস্থার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ওপর। ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে দেখার জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় বুঝতে হবে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়— অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান সূচক মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি বেশী থাকে তাহলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে কম হয়। ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে নীট জাতীয় উৎপাদন (১৯৮০-৮১ সালের দামের ভিত্তিতে) বেড়েছে ৪৯৩ শতাংশ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১৩১ শতাংশ।

জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগান— এখন ভারতে কৃষিব্যবস্থা অনেকখানি উন্নত হয়েছে কিন্তু ১৯৪৭ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারকে যথেষ্ট খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। এর কারণ ছিল ক্রমাগতঃ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। এছাড়া জনসংখ্যার বর্ধিত হার কৃষিক্ষেত্রে পারিবাহিক ভোগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ফলে বাজারে বিক্রীর জন্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও ক্রমাগত চাপ পড়ে। বেশি লোকের খাদ্য যোগাবার জন্য বন কেটে বনকে কৃষিজমিতে পরিণত করতে হয়। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

জনসংখ্যা ও উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার— জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত হয়। ভারতেও এই জিনিস চোখে পড়ে। স্থায়ী ভোগ্যবস্তুর বাজার এখন অনেকখানি বিস্তৃত ফলে দেশে বিশেষত শহরাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রায় একটা আলগা চাকচিক্য চোখে পড়ে। কিন্তু এ চিত্রটা সম্পূর্ণ নয় কারণ এর পাশাপাশি আছে লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষ যারা ভোগ্যবস্তু দূরের কথা, জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোও

পায় না তাই এই বিস্তৃত বাজারের জন্য যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তা সমাজে কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

জনসংখ্যা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের বর্ধিত চাহিদা— বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য চাহিদা বর্ধিত হারে মেটাতে হয় এবং সেজন্য সরকারকে প্রচুর অর্থব্যয়ও করতে হয়। প্রতিটি পরিকল্পনাতে এই ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান— দ্রুত জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কর্মসংস্থানের সমস্যাও ভারতে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে' ষষ্ঠ পরিকল্পনার হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮০ সালে বেকারীর পরিমাণ ছিল ২০.৭ মিলিয়ন, ১৯৯০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২৮ মিলিয়নে। গত কয়েক দশকের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে কোন পরিকল্পনাতেই চলতি সময়ের সব কর্মপ্রার্থীকে কাজ দেওয়া যাচ্ছে না, তার সঙ্গে বকেয়া বেকারদের সংখ্যা যোগ হয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বেকার সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

জনসংখ্যা ও অনুৎপাদক শ্রেণীর ভার— সব দেশের জনসমষ্টির মধ্যেই উৎপাদক ভোগী আর অনুৎপাদক ভোগী এই দুই শ্রেণী আছে— যারা কাজে নিযুক্ত থাকে তারা উৎপাদক ভোগী আর যারা কাজে নিযুক্ত থাকে না তারা অনুৎপাদক ভোগী। দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে অনুৎপাদক ভোগীর অনুপাত বেড়ে যায় এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে ১৯৬১ সালে উৎপাদক ভোগী আর অনুৎপাদক ভোগীর অনুপাত ছিল ৪৩ শতাংশ আর ৫৭ শতাংশ। ১৯৯১ তে সেই অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭.৬ শতাংশ ও ৬২.৪% Datt Sundharam : Indian Economy (1999) P. 61। কাজে নিযুক্ত নয় অথচ ভোগ করে এরকম মানুষ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী শুধু নয়, এই অনুপাত ক্রমশ বেড়ে গেছে।

জনসংখ্যা ও জীবিকা নির্বাহের ধরন— আধুনিক কালের জীবিকাগুলিতে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় ১. প্রাথমিক জীবিকা যার মধ্যে আছে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। ২. মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবিকা যার মধ্যে আছে খনি ও শিল্প এবং ৩. তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকা যেমন পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাংকিং এবং সমস্ত রকমের সেবামূলক কাজ। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের জীবিকার ধাঁচে পরিবর্তন আসে প্রথমে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সরে যেতে থাকে এবং পরে তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকায় তা আরও সরে যায়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন কিন্তু ঘটেনি। বেশী লোকের খাদ্যের যোগান এবং বেশী লোকের কর্মসংস্থান এই দুই প্রয়োজনে এখনও আয়ের উৎস হিসেবে প্রাথমিক ক্ষেত্রই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। আগেই আমরা দেখিয়েছি ১৯৫১ তে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৭২.১ শতাংশ, ১৯৯১ তে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৮ শতাংশে। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ১০.৭ ও ১২.৭ শতাংশ আর তৃতীয় ক্ষেত্রে ১৭.২ ও ২০.৫ শতাংশ।

এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতে আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয়ে ওঠেনি, বরং নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য খুবই জরুরী হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এ বিষয়ে এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"You are poor because you are too many"—তোমরা সংখ্যায় অনেক বলেই তোমরা দরিদ্র।

৫৬.৩ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিন ধরনের কর্মসূচীর প্রয়োজন— পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচী, অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও সামাজিক কর্মসূচী।

৫৬.৩.১ পরিবার পরিকল্পনা

ভারত সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পরিবার পরিকল্পনা। এ বিষয়ে সরকার থেকে নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের (Provcntive checks) ওপর বেশী জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকার তাই প্রতিটি পরিকল্পনাতেই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মহার হ্রাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর জন্য জনমত গঠন, জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্র স্থাপন, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি বিনামূল্যে বিতরণ অথবা সুলভে বিক্রয়, মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানো, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান সম্ভাবনাকে স্থায়ীভাবে নিরোধ করা, জন্মনিয়ন্ত্রণের উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে এই বিষয়টির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সময় জন্মদানে সক্ষম দম্পতিদের জন্মহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সবরকম সরকারী সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনাতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মাতৃত্ব, শিশু-স্বাস্থ্য সুরক্ষা এই সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালে গৃহীত হয় জাতীয় জনসংখ্যা নীতি আর এই নীতি রূপায়ণের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৪৯৭ কোটি টাকা। ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স ধার্য হয়েছিল ২১ ও ১৮ বছর। জন্মনিয়ন্ত্রণকে স্বেচ্ছামূলক না রেখে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবা হয়। জরুরী অবস্থার সময় শৃঙ্খলার নামে অনেক বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনার জন্য গৃহীত নীতি কিন্তু তেমন সফল হয়নি। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও যে খুব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তা বলা যায় না। ১৯৯৪ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ২৮.৬ এবং ৯.২। এই সংখ্যা ১৯৫১ তে ছিল যথাক্রমে ৩৯.৯ এবং ২৭.৪। মৃত্যুহার অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা কিন্তু জন্মহার আনুপাতিকভাবে হ্রাস না পাওয়ায় জনবৃদ্ধি ঘটেছে। ভারতের মতই জনভারপীড়িত চীনে ১৯৮১-৯১ এর দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১.৩ শতাংশ। কিন্তু সেই সময় ভারতে ঐ হার ছিল ২.১৪ শতাংশ।

সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাকে পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে দেখা হয়েছে, কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি। অষ্টম পরিকল্পনাতে নির্বীজকরণ (Sterilization) কর্মসূচীতে প্রায় স্থিতাবস্থা বজায় ছিল বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচী একেবারেই রূপায়ণ করা যায়নি। নবম পরিকল্পনা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিতে আরও বেশী গুরুত্ব দিয়েছে যার জন্য মোট সরকারী বিনিয়োগের ৩% এর জন্য ব্যয় করার কথা ঘোষণা করা হয়। এই সব কর্মসূচী গ্রহণ করে ২০০২ সালের মধ্যে জন্মহার কমিয়ে হাজারে ২৪-২৩-এ নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। আমাদের দেশে আর একটি অভিশাপ হল শিশুমৃত্যু এবং অনেকেরই ধারণা শিশুমৃত্যুর হার বেশী থাকার জন্যই আমাদের দেশে জন্মহার বেশী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই নবম পরিকল্পনা এ বিষয়েও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ২০০২ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুহার কমিয়ে হাজারে ৫৬-৫০-এ নামিয়ে আনা।

ভারতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সরকার অনেক আগে থেকেই গ্রহণ করেছে কিন্তু জনবৃদ্ধির হার দেশে উর্ধ্বমুখীই থেকে যাচ্ছে। ১৯৫১-৯১ সালে অর্থাৎ ৪০ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে— এই চিত্র ম্যালথাসের তত্ত্বকেই সমর্থন করে যিনি বলেছিলেন জনসংখ্যা মোটামুটি ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হওয়ার প্রবণতা থাকে। পরিবার পরিকল্পনা যে তেমন সাফল্য পাচ্ছে না তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও অপদার্থতা সবই আছে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আসলে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবিধানের মাধ্যমেই এর মোকাবিলা করা দরকার।

৫৬.৩.২ অর্থনৈতিক প্রতিবিধান

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াতে পারলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় ফলে জন্মহার নিজে থেকেই কমে আসে। অবশ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়লেই সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটে না তার জন্য দরকার বিশেষ ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ আর বেকারী-দূরীকরণের কমসূচী। দরিদ্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেশী সন্তান থাকার সুবিধার তুলনায় তাদের প্রতিপালনের ব্যয় কম তাই সেই সব পরিবারে জন্মহার বেশী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এরই ফলস্বরূপ আমরা চারদিকে বিপুল সংখ্যক শিশু শ্রমিক দেখতে পাই। জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের আয় বাড়ানো এবং দেশের উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করা খুবই জরুরী। কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের কোন সম্ভাবনা নেই কিন্তু শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা প্রচুর। তাই দ্রুতহারে শিল্পায়নের ফলেও জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে কারণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে দরিদ্র ব্যক্তিদের অধিক সন্তান উৎপাদনের আকাঙ্খা হ্রাস পায়।

৫৬.৩.৩ সামাজিক প্রতিবিধান

জনবৃদ্ধির সমস্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নানা সামাজিক সমস্যা। ধর্মীয় বিশ্বাস, নানারকম কুসংস্কার, মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এই সমস্ত কিছুই জনসংখ্যার সমস্যায় উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই সমস্যা সমাধানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভূমিকার কথা সব অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন। ড. অশোক মিত্রের মতে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার এবং গর্ভনিরোধক বিভিন্ন উপায়ের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য ১০ টাকা ব্যয় করে যে ফল পাওয়া যায়, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাখাতে তা ১ টাকা ব্যয়ের সমতুল্য। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মানুষের স্বাধীনতা বাড়ায়, অন্ধসংস্কার থেকে তাকে মুক্তি দেয়, কাজে দক্ষতা বাড়ায় এবং এ সমস্তই দেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। Jean Dreze ও Amartya Sen তাঁদের Indian Economic Development and Social opportunity (1995) বইটিতে মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কার্যকরী ভূমিকার কথা বিস্তৃতভাবে অলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে স্বাধীন ভারত আর সমাজতন্ত্রী চীন একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে চল্লিশের দশকের শেষের দিকে। চীনে অগ্রাধিকার ছিল শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমিসংস্কারের। তার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান ভারতের চেয়ে অনেক উন্নত। আগেই বলা হয়েছে ১৯৮১-৯১-এর দশকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চীনের তুলনায় অনেক বেশি। এটা ঠিকই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য চীনে যে সব কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক ভারতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের সমস্যা শুধুই তো পরিমাণগত সমস্যা নয়, জনসমষ্টির গুণগত মানবৃদ্ধিও সেই সমস্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক এবং সেই দিক থেকে ভারত শুধু উন্নত দেশগুলির তুলনাতেই নয় চীন এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনাতেও পিছিয়ে আছে।

ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে (Directive Principles) ছিল যে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে (এখন অবশ্য এটা মৌলিক অধিকারের মধ্যে আনার জন্য আইন প্রণয়ন করার কথা ভাবা হচ্ছে)। কিন্তু তার পর চার দশক পেরিয়ে গেলেও সেই আশা পূর্ণ হয়নি। ১৯৯১-এর (census) অনুযায়ী ৩৫২ মিলিয়ন লোক সাক্ষর কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ ৩২৪ মিলিয়ন লোক নিরক্ষর। শতাংশের হিসেবে দেখলে সাক্ষরতার হার ১৯৮১ সালে ৪৩.৭%, ১৯৯১ তে ৫২.২% আর ১৯৯৬ তে ৬৪%। মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় কম। ১৯৬১ সালে পুরুষদের ৬৪%, মেয়েদের সেখানে ৩৯.৩% মাত্র। বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার শোচনীয়রকম কম— ২১ শতাংশেরও কম। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার কম হওয়া আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। শিক্ষিত মেয়েরা পরিবার ছোট রাখার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাছাড়া শিক্ষিত মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়ে বাড়ির বাইরের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে। তখন এই জীবিকার প্রয়োজনেই তারা কম সন্তান চায়। তাই আমাদের জনসংখ্যা নীতির অঙ্গ হিসাবেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের

ব্যাপারে সরকারকে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী, ক্রমবর্ধমান জনশক্তিকে যদি কারিগরি শিক্ষায় নিপুণ করে তোলা যায় তাহলে দেশে বেকারী ও দারিদ্র্যের সমস্যা হ্রাস পাবে এবং ফলে জনসংখ্যার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও খুবই জরুরী। এ বিষয়ে সরকার কিছুটা চেষ্টাশীল হয়েছে সন্দেহ নেই তবে আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন। পরিকল্পনাকালে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে— ১৯৭০ সালে যেখানে প্রতি হাজারে ১২৯ জন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যেত, ১৯৯৪ সালে সেখানে এই সংখ্যা ৭৩। এ বিষয়ে আরও উন্নতির অবশ্যই প্রয়োজন। শিশু মৃত্যুর হার কমে এলে বেশী সন্তান পাওয়ার আকাঙ্খা কমে আসে ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া সাধারণভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হলে দেশে সুস্থ কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তাই তারা কখনই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। বিশেষ করে সুস্থ শরীর এবং মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনের অনেক সুস্থ, সুন্দর বিনোদনের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং এরকম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার প্রবণতা দেখা যায়।

বিভিন্ন পরিকল্পনাতে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানারকম পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন যেগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবিধানগুলি যুক্ত করলে জনসংখ্যা সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব হবে। দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমে গেলে দেশে বেকারীর হার কমবে, খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে, মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ জীবনযাত্রার এক উন্নত মানে পৌঁছতে পারবে।

৫৬.৪ অনুশীলনী

১। বন্ধনীর ভিতর থেকে সঠিক বাক্যাংশ বেছে নিয়ে বাক্য রচনা করুন ঃ

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে গত দশকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (বেড়েছে / কমেছে)।

(খ) জনবিস্ফোরণ দেখা যায় (উন্নত দেশে / উন্নয়নশীল দেশে)।

(গ) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী (শহরে / গ্রামে)।

(ঘ) ভারতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার হার (বেশি / কম)।

(ঙ) ভারতীয় দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণ করে (বাধ্যতামূলকভাবে / ঐচ্ছিকভাবে)।

(চ) ভারতে শিশু মৃত্যুর হার আগের তুলনায় (বেড়েছে / কমেছে)।

(ছ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করলেই (যথেষ্ট / যথেষ্ট নয়)।

(জ) পরিকল্পনাকালে ভারতীয়দের গড় আয়ু (বেড়েছে / কমেছে)।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) উপজীবিকা বণ্টন বলতে কী বোঝায়? ভারতে এর প্রকৃতি কী?

(খ) ভারত উন্নয়নের কোন স্তরে এখন আছে?

(গ) ১৯৮১-৯১-এর দশকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চীনের সঙ্গে তুলনায় কেমন ছিল?

(ঘ) পরিকল্পনার যুগে ভারতের জন্মহার ও মৃত্যুহারের কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

(ঙ) শিক্ষার প্রসার কীভাবে জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে?

(চ) শিশু মৃত্যুর হার কমলে তা জনসংখ্যাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) "দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধিই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা"—বিস্তৃতভাবে আলোচনা করুন।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ভারতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিশ্লেষণ করুন।

(গ) সাম্প্রতিককালে ভারতের জনসংখ্যা যে সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিন।

(ঘ) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা আলোচনা করুন।

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সম্বন্ধে টীকা লিখুন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এর সঙ্গে আর কী ধরনের কর্মসূচী নেওয়া দরকার বলে মনে হয়?

৫৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। সম্পৎ মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী — *সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি*

২। সুব্রত গুপ্ত— *ভারতীয় অর্থনীতি।*

৩। Datt and Sundharam — *Indian Economy, 1999* (S. Chand and Company Ltd.)

৪। A. N. Agarwal — *Indian Economy, 1998.*

৫। Jean Dreze and Amartya Sen —*India : Economic Development and Social Opportunity* (Oxford University Press, 1995)

একক ৫৭ □ ভারতীয় কৃষির বিভিন্ন দিক ও সরকারী নীতি

গঠন

৫৭.০ উদ্দেশ্য

৫৭.১ প্রস্তাবনা

৫৭.২ কৃষিতে কাঠামোগত সংস্কার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন-এর বিভিন্ন দিক।

৫৭.৩ ভূমি সংস্কারের অর্থ, গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য

- ৫৭.৩.১ ভারতের পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা সমূহ
- ৫৭.৩.২ ভারতে ভূমিসংস্কারের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা
- ৫৭.৩.৩ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি
- ৫৭.৩.৪ ভারতে ভূমিসংস্কারের মূল্যায়ন
- ৫৭.৩.৫ ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণ কীভাবে হতে পারে

৫৭.৪ নতুন কৃষি প্রকৌশল ঃ সবুজ বিপ্লব

- ৫৭.৪.১ ভারতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা
- ৫৭.৪.২ নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক
- ৫৭.৪.৩ নতুন কৃষি প্রযুক্তির বাস্তব রূপায়ণ
- ৫৭.৪.৪ সবুজ বিপ্লবের সুফল
- ৫৭.৪.৫ নুতন কৃষি প্রযুক্তির ত্রুটি
- ৫৭.৪.৬ সবুজ বিপ্লব ও ভূমিসংস্কার

৫৭.৫ কৃষি ঋণ — ভূমিকা

- ৫৭.৫.১ কৃষি ঋণের প্রকারভেদ
- ৫৭.৫.২ কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের সমস্যা
- ৫৭.৫.৩ কৃষি ঋণের বিভিন্ন কারণ
- ৫৭.৫.৪ কৃষি ঋণের বাজার

৫৭.৫.৫ ভারতে কৃষি ঋণের কুফল
৫৭.৫.৬ ভারতে কৃষি ঋণের উৎসসমূহ
৫৭.৫.৭ গৃহীত ব্যবস্থা
৫৭.৫.৮ কৃষি ঋণ পুনর্গঠনে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ
৫৭.৫.৯ কৃষি ঋণের উৎস হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
৫৭.৫.১০ জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক
৫৭.৫.১১ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক
৫৭.৫.১২ ভারতের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
৫৭.৫.১৩ কৃষি ঋণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা
৫৭.৫.১৪ কৃষি ঋণ ও ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
৫৭.৫.১৫ গ্রামীণ ঋণদানে অপ্রাতিষ্ঠানীক উৎসসমূহ
৫৭.৫.১৬ কৃষি ঋণ সংক্রান্ত আইনের ভূমিকা
৫৭.৫.১৭ উপসংহার
৫৭.৬ পঞ্চায়েতীরাজ
৫৭.৬.১ পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার
৫৭.৬.২ পঞ্চায়েত ও কৃষি উন্নয়ন
৫৭.৬.৩ পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ কর্মসূচী
৫৭.৬.৪ পঞ্চায়েত ও শিক্ষা
৫৭.৬.৫ পঞ্চায়েত ও সমাজ কল্যাণ
৫৭.৬.৬ পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্মসূচী
৫৭.৬.৭ ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যাপ্তি
৫৭.৬.৮ পঞ্চায়েতী রাজের ঃ কাজের অগ্রগতি ঃ একটি মূল্যায়ন
৫৭.৭ সারাংশ
৫৭.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা
৫৭.৯ অনুশীলনী
৫৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৫৭.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পর আপনারা ভারতের ভূমি সংস্কার, সবুজ বিপ্লবের সূচনা ও তার সুফল, কৃষি ঋণ, গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ভূমি, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সংস্কারে পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন।

৫৭.১ প্রস্তাবনা

ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে গ্রামীণ অঞ্চলে, বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্র বাদ দিয়ে, গ্রামীণ ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, শুধু শহর ও শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারতের কোন অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই কৃষির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, এদের প্রতিকারকল্পে গৃহীত সরকারী নীতি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়ের আলোচনা প্রয়োজন।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিকাশের জন্য শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার এবং এর সমাধানের জন্য সরকারী নীতির গুরুত্বও কম নয়।

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী আয়-ব্যয় ও কর নীতি বিশেষ সাহায্য করে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের আলোচনাও এখানে করা হয়েছে।

৫৭.২ কৃষিতে কাঠামোগত সংস্কার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন-এর বিভিন্ন দিক

পরিকল্পনাকালে সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য (Stated Pattern and Objectives) হল ছোট জোতভিত্তিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিকল্পনাকালে সরকারী কৃষিনীতির তিন প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। একটি হল কৃষিক্ষেত্রে জমির ব্যাপারে এক নতুন কাঠামোগত সংস্কার সাধন। অন্যটি হল কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপযোগী অন্তর্কাঠামো সৃষ্টি এবং তৃতীয়টি হল কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বা প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন।

যে দুটি ব্যবস্থার দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে তা হল (ক) কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীগুলির অর্থাৎ জমিদারী, জায়গীরদারী ইত্যাদি ব্যবস্থার বিলোপ এবং (খ) পঞ্চায়েতী রাজের মারফত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণে ও রূপায়ণে কৃষিগত শ্রেণীগুলির সহযোগিতা লাভের ব্যবস্থা। অন্তর্কাঠামো হল, কৃষিসম্পর্কিত নানারকম পরিষেবার সমষ্টি যা কৃষির সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে। ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনাকালে কয়েকটি উপায় বা অস্ত্র গৃহীত হয়েছে। এগুলি হল—(১) ভূমি সংস্কার, (২) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং (৩) কৃষিতে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা।

৫৭.৩ ভূমি সংস্কারের অর্থ, গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গঠনের উদ্দেশ্যে কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনকে বলা হয় ভূমিসংস্কার। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার ফলে, কিংবা কৃষি কাঠামোগত প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দরুন কৃষি কাঠামোর সংস্কার ঘটতে পারে।

জাতিসঙ্ঘের ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে— দেশের কৃষি জমি ভোগদখলের রীতি নীতি ও প্রথা এবং আইন কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে, তার জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দিতে পারে, তার উদ্যম নষ্ট করতে পারে, উন্নতির পথ রোধ করতে পারে এবং জমির মালিকানার নিরাপত্তার অভাবে তাকে জমিতে পুঁজি-বিনিয়োগে নিবৃত্ত করতে পারে।

ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মূলত তিনটি—

১। ভূমি সংস্কার (Land Reform) কৃষকের শোষণের অবসান ঘটিয়ে জমিতে তার ভোগদখলের স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কৃষককে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে নিরন্তর উৎসাহ দেয়। এর ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ে। চাষীর আয় বাড়ে, যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য সহ সমস্ত পণ্যের মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বাজারের বিস্তৃতি ঘটে।

২। যে পরিমাণ জমির নীট আয় থেকে একটি গড় (Average) পরিবার মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করতে পারে, তাকে অর্থনৈতিক জোত (Economic Holding) বলা হয়। ভারতে অর্থনৈতিক জোত সৃজনের জন্য জমির বণ্টন-বৈষম্য দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩। ভূমি সংস্কার কোটি কোটি চাষীর জীবনে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্য কমায় এবং চাষীর উৎপাদনশীল সম্পত্তি বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ভূমিসংস্কার সামাজিক ন্যায়নীতির সমর্থক একটি নীতি।

৫৭.৩.১ ভারতের পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা সমূহ

ইংরেজ আগমনের আগে ভারতে সর্বত্রই তৎকালীন রাজশক্তি ভূমিতে কৃষকের মালিকানা মেনে নিয়ে কেবল উৎপন্নের একাংশ নিজের প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করত, বাকীটা চাষীরই থাকত। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সেই সময়ের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাগুলি হল— ১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ২. মহালওয়ারী বন্দোবস্ত, ৩. রায়ওয়ারী বন্দোবস্ত এবং ৪. অস্থায়ী বন্দোবস্ত।

৫৭.৩.২ ভারতে ভূমিসংস্কারের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা

ভারতে প্রজাসত্ত্ব সংস্কার এবং জমির নতুন মালিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি হল—

১. খাজনা বা ভূমিরাজস্ব হ্রাস— এখানে গৃহীত সরকারী নীতি হল, এই রাজস্ব কোন ক্ষেত্রেই জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশের বেশী অথবা এক-পঞ্চমাংশের কম হবে না। ১৯৭৮ সালের ভূমি রাজস্ব আইন [Land (Farm Holding) Revenue Act, 1978] অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সেচ-জমি ও অ-সেচ জমিকে রাজস্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় গরীব কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

২. জমিদারী প্রথা ও মধ্যস্বত্ত্বাধিকার বিলোপ (Aboletion of Zamindari System and Inventories) —মাদ্রাজ সরকার ১৯৪৮ সালে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য ১৯৫৪ সালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন দ্বারা জমিদারী প্রথা বিলোপ করে।

ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী, রায়তয়ারী ও মহলওয়ারী বন্দোবস্তের দ্বারা বহুস্তরে বহু মধ্যস্বত্ত্বভোগীর উদ্ভব হয়। আসলে এরা ছিল দূরবর্তী শোষণযন্ত্র (Distant Suction Pipe)।

ভারতে ভূমি সংস্কারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) মধ্যস্বত্ত্বাধিকারের বিলোপ।

(খ) জমিদারদের এ ধরনের নিজস্ব চাষের জন্য কিছু জমি রাখতে দেওয়া হয়, তবে জমির পরিমাণের একটি ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

(গ) জমিদারদের এজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, কিছুটা নগদে এবং কিছুটা সরকারী ঋণপত্রে।

(ঘ) আগে যারা জমিদারের প্রজা ছিল, তারা সরাসরি রাষ্ট্রকে খাজনা দেবে বলে স্থির হয়। এর ফলে অধিকাংশ চাষীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(ঙ) মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের অপসারণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃত চাষীদের হাতে জমির মালিকানা অর্পণ করা। কিন্তু কিছু পরিমাণ জমি মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের হাতে থেকে যায়। এরা ওই জমি প্রজাদের মধ্যে ইজারা বিলি করে। ইজারার (Lease) একটা প্রধান রূপ হল ভাগচাষ প্রথা। প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরো কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এগুলিকে প্রজাস্বত্ত্ব সংস্কার (Tenancy Reform) বলা হয়। সমস্ত রাজ্যেই প্রজাস্বত্ত্ব সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে প্রণীত এইসব আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) সমস্ত রাজ্যেই জোতের সর্বোচ্চ সীমা (ceiling) বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রজা কৃষক (Tenant) ও উপপ্রজা কৃষকদের (Sub-tenant) মধ্যে জমির পূর্ণমালিকানা প্রদান করে সরকারের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(খ) সমস্ত রাজ্যেই প্রজাদের স্বত্ত্বের স্থায়িত্ব (Security of Tenure) সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের আইনে সংস্থানও রাখা হয়েছে যে, প্রজারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের চাষ করা জমিতে মালিকানা অর্জন করতে পারে।

প্রজাস্বত্বের স্থায়ী অধিকার আইনসম্মতভাবে স্বীকৃত হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে এই আইনকে অমান্য করে জমির মালিকরা প্রজাদের সঙ্গে মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রজাস্বত্বের লিখিত দলিল না থাকায় যে কোন অজুহাতে প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এই জমিগুলি কিনে নেয় গ্রামের সম্পন্ন চাষীরা।

৪. ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অপর একটি কার্যক্রম হল বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডীকৃত জোতগুলিকে একত্রিত করা, যাতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অংশে জোতগুলিকে একত্র করার কাজে অনেকটা অগ্রগতি ঘটেছে।

৫৭.৩.৩ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি

প্রথম পরিকল্পনায় জমির মালিকানার ধাঁচ এবং কৃষিকে জাতীয় উন্নয়নের একটি মৌলিক বিষয়রূপে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে অনুসরণীয় নীতির একটি রূপরেখা স্থির করা হয়।

এই নীতিটি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং উপযুক্ত কৃষি কাঠামো গঠন ও সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গৃহীত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বোক্ত নীতিগুলি এবং ওই মর্মে প্রণীত আইনগুলি কাজে পরিণত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিতে কৃষিতে কারিগরী কৌশলের বিকাশ এবং বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমি সংক্রান্ত সরকারী নীতির পুনরায় দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয়। এর দ্রুত রূপায়ণের জন্য বর্তমান আইনগুলির পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করা হয়।

বর্তমান সংবিধান অনুসারে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের অধিকার হল রাজ্য সরকারগুলির। পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি হল সুপারিশ ধরনের।

(ক) ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির পর্যালোচনা।

(খ) ভূমি সংস্কার আইনগুলির ত্রুটি নির্দেশ করা

(গ) আইনগুলির রূপায়ণে (Implementation) ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ করা

(ঘ) কারিগরী কৌশলের বিকাশ ও বর্তমান সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কেন্দ্রীয় ভূমিসংস্কার কমিটি গঠন করে।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার এ বিষয়ে একটি সরকারী নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এতে জমির উর্ধ্বসীমা (Ceiling) যাতে কমে সে ধরনের পরিবর্তনের কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

(ক) জমির ব্যক্তিগত উর্ধ্বসীমার পরিবর্তে এখন থেকে সিলিং হবে পারিবারিক ভিত্তিতে।

(খ) পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তান বোঝাবে।

(গ) এক-ফসলী জমি, দো-ফসলী জমি এবং বাগিচাসহ অন্যান্য জমির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাপের ঊর্ধ্বসীমা হবে।

(ঘ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজনের বেশী হলে অতিরিক্ত সদস্যের জন্য মাথাপিছু অতিরিক্ত জমি রাখতে দেওয়া হবে, তবে এই ক্ষেত্রে পাঁচজন নিয়ে পরিবারের জন্য ধার্য ঊর্ধ্বসীমা দ্বিগুণের বেশী হবে না।

(ঙ) চা, কফি, রবার, কোকো এবং এলাচ বাগিচার জমি ঊর্ধ্বসীমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৫৭.৩.৪ ভারতে ভূমিসংস্কারের মূল্যায়ন

ভারতে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য ও রূপায়ণ কতটা সফল হয়েছে, সেটা বোঝা যাবে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার মূল্যায়ন (Evaluation) থেকে।

ভারতে ভূমি সংস্কার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা (Experiment) চার রকমের হয়েছে যেমন,

১. উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ভূমি সংস্কার (Land Reform "from above)। এ ধরনের ভূমিসংস্কার নীতি তৈরী ও বিধিবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। অনেক সময় রাজ্য সরকার এই নীতি তৈরী করে। অবশ্য এগুলির যথাযথ রূপায়ণের ভার রাজ্য সরকারের।

২. নীচের দিক থেকে কৃষকদের সংগ্রামী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা (Land Reform through militant peasant action "from below")। যেমন, তেলেঙ্গানা ও নকশালবাড়ী।

৩. বিধানসভায় প্রণীত আইনের ফলে উপর থেকে আসা ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে নীচের পর্যায়ে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে ভূমি সংস্কার রূপায়ণ। (যেমন, পশ্চিমবঙ্গে নিয়ন্ত্রিত জমি দখল, (Controlled land seizure) ও অপারেশন বর্গা (Operation Borga) এবং কেরালার গরীব কৃষকদের সংরক্ষণ।

৪. নীচের দিক থেকে ভূমি সংস্কারের আদর্শে প্রণোদিত করে এবং কৃষকদের শান্তিপূর্ণ চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে— যেমন, ভূদান এবং গ্রামদানের ক্ষেত্রে হয়েছে।

অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে আমাদের দেশে ভূমিসংস্কারের যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পি.সি. জোশী ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা ও তার অগ্রগতি মূল্যায়নে নিম্নলিখিত দিকগুলি আলোচনা করেছেন।

১. ভারতে এমন অঞ্চলও আছে, যেখানে প্রজাস্বত্ত্ব আইন স্বত্ত্বেও আমরা অনুপস্থির জমি মালিকানা দেখতে পাই।

২. একই গ্রামে জমির মালিকানা এবং জমিতে চাষ-আবাদের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৩. দেশের অনেক রাজ্যে চাষ না করা জমির মালিকানা থেকে ব্যবসামুখী জমির মালিকানা অথবা জমির মালিকদের বৃহদায়তন চাষ আবাদের দিকে পরিবর্তন।

৪. কৃষিজোতের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করে জমি মালিকদের হাত থেকে কিছু জমি হয়তো কৃষকদের হাতে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে— কিন্তু তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি "কুলাক" (Kulak) অর্থনীতি—অর্থাৎ বৃহৎ কৃষকদের গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি।

৫. দেশে এখনও এমন অঞ্চল আছে, যেখানে গ্রামীণ অর্থনীতি সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের দ্বারা অধ্যুষিত।

৬. অনেক অঞ্চলে কৃষকরা মজুরী অর্থনীতিতে (Wage Economy) এখনও প্রবেশ করেনি।

৭. দেশে অনেক ক্ষেত্রে জমির রেকর্ডের দলিলপত্র ঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি।

পরিকল্পনা কমিশনের Task force-এর মতে—

(ক) রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, (খ) কৃষিশ্রমিক এবং গরীব কৃষকদের নিষ্ক্রিয় মনোভাবের দরুণ নীচের দিক থেকে চাপ সৃষ্টির অভাব, (গ) সর্বাধুনিক জমির রেকর্ডের অভাব, (ঘ) আইনগত বাধা।

এগুলিই হল ভারতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর অসাফল্যের কারণ। ভূদান ও গ্রামদান কর্মসূচীও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে "অপারেশন বর্গা" আংশিকভাবে সফল হয়েছে। পাঞ্জাবে ভূমিসংস্কার একটি "পুঁজিবাদী" কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে।

৫৭.৩.৫ ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণ কীভাবে হতে পারে

ভারতে কৃষিগত পুনর্গঠনের জন্য ভূমিসংস্কারকে যুক্ত করতে হলে—

১. রাজনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করা দরকার যাতে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করার কাজে সেগুলিকে কাজে লাগানো যায়। চীনে যেমন বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার হয়েছে, অথবা জাপানে যেমন উপর দিক থেকে ভূমি ব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে, ভারতে নয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেও সেটা করা সম্ভব হয়নি।

২. সমবায় কাঠামোয় কৃষি-অর্থনীতি গঠন করা প্রয়োজন।

৩. নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটি বিবেচনা করতে হবে। প্রথম পরিপ্রেক্ষিতে দরকার ব্যাপক ভূমিসংস্কার (Comprehensive Land Reform) এবং দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দরকার সংরক্ষণমূলক ভূমি সংস্কার (Protective Land Reform)।

পরিশেষে বলা যায়, জমির স্বত্ত্ব ও প্রজস্বত্ত্বের শর্তাদি নিয়ে ভূমি-ব্যবস্থা গঠিত। এই শর্তগুলি কৃষকের যত অনুকূল হবে, ততই ভূমি-সংস্কার ব্যস্থার রূপায়ণের সাফল্য সূচিত হবে।

৫৭.৪ নতুন কৃষি প্রকৌশল ঃ সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লবের সূচনা পর্বে নূতন কৃষি প্রকৌশল (New Agricultural Technology) সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

প্রকৌশল হল উৎপাদনের কৌশল সংক্রান্ত ধারণা ও জ্ঞান এবং এটি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির একটি উপায়। প্রকৌশলগত পরিবর্তন (Technological Change) বলতে বোঝায় নূতন প্রকৌশলগত ব্যবহারিক কার্যাবলী গ্রহণ ও অনুসরণ করা। খামার বা কৃষিগত প্রকৌশলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ১. যান্ত্রিক প্রকৌশল ও ২. জীববিদ্যাগত প্রকৌশল। এই দুই দিককে নূতন কৃষি-প্রযুক্তির পরস্পর নির্ভর অংশ বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই দুটি দিককে ভিন্নভাবে দেখা যেতে পারে।

নূতন কৃষি প্রযুক্তির যান্ত্রিক দিক ঃ মনুষ্যশক্তি এবং পশুশক্তির (Human and Animal Labour-Power) পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার এই দিকটির উদাহরণ। জমি চাষে গরু মহিষের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার, বিদ্যুৎ বা ডিজেলের ব্যবহার (পাম্পসেট চালাবার জন্য), হার্ভেস্টার, থ্রেশার ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের যন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এগুলি শ্রম-সংক্ষেপক (Labour-Saving) এবং এই সব যন্ত্র ব্যবহৃত হলে চাষের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে।

এখানে জমি চাষের জন্য প্রস্তুত করা, ফসলকাটা, ফসল ঝাড়াই ও বাছাই, সেচের ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, কৃষির প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফসল গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ এইসব স্তরগুলিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সুফল এনে দিতে পারে।

কৃষিতে জীববিদ্যাগত প্রকৌশল বা জৈবিক-রাসায়নিক (Biological-Chemical) দিকটি হল শ্রমনিবিড় (Labour-intensive)। এই প্রকৌশল যে কোন নির্দিষ্ট আয়তনের কৃষিভূমির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কৃষিতে এই নতুন প্রযুক্তির দিকে রয়েছে— উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার, শস্যের আবর্তন ইত্যাদি। এই জৈবরাসায়নিক প্রকৌশল খাবার বা কৃষিগত প্রকৌশলের ক্ষেত্রে নবাগত। কৃষিকার্যে জৈবিক সার অপেক্ষা রাসায়নিক সারে ফলন বেশী বৃদ্ধি পায়।

৫৭.৪.১ ভারতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা

প্রথম পরিকল্পনার পর ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত পূরণের জন্য কৃষির বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রথমে জাপানি প্রথা এবং পরে চীনা প্রথায় চাষ করা শুরু হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সফল হয়নি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে (চতুর্থ পরিকল্পনা কালে) নতুন কৃষি-কৌশল (New Agricultural Strategy) হিসাবে যে উন্নয়ন-নীতি গৃহীত হয়, তার প্রকৃত নাম "নিবিড় কৃষি জেলা প্রকল্প" (Intensive Agricultural District Programme বা IADP)। পরবর্তীকালে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয় "উচ্চফলনশীল বীজ প্রকল্প।" (High Yielding Varieties Programme বা HYVP)। এই দুটি প্রকল্পের মিলিত নাম "সবুজ বিপ্লব" (Green Revolution)।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F.A.O) অন্যতম বিশেষজ্ঞ বোরলগ (Borlaug) যে উচ্চ ফলনশীল বীজ আবিষ্কার করেছেন, ভারত সরকার তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এই নতুন ব্যবস্থায় কৃষি প্রযুক্তির (Mechanical এবং Biological-Chemical) যান্ত্রিক এবং জৈব রাসায়নিক, এই দুটি দিকই গৃহীত হয়েছে।

৫৭.৪.২ নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক

নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক হল—

১. উচ্চ ফলনশীল বীজ

২. রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ

৩. জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

৪. আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষির যন্ত্রীকরণ

৫. মূলধন-নিবিড় (Capital-intensive) উৎপাদন পদ্ধতি

৬. কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন

৭. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কৃষকদের ভরতুকি (Subsidy) প্রদান

৮. কৃষি উৎপাদনের জন্য সরকার কর্তৃক কৃষকদের প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ (Inputs) সরবরাহ করা

৯. সরকারী এজেন্সী (Agency) দ্বারা কৃষিজাত সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করার মত দাম প্রদান (Incentive Price) এবং

১০. জনসংযোগ ও তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে কৃষকদের যাবতীয় আধুনিক তথ্য সরবরাহ করা

৫৭.৪.৩ নতুন কৃষি প্রযুক্তির বাস্তব রূপায়ণ

নতুন কৃষি প্রযুক্তিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য ভারত সরকার ব্লক উন্নয়নের (Block Development) পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রতি ১০০টি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক গঠিত হয়। এই ব্লকগুলি হল, কৃষির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংগঠনের নিম্নতম স্তর। গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতিই এই ব্লকগুলির উদ্দেশ্যরূপে প্রথমে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সেচের উন্নতি, কৃষি বিজ্ঞান চর্চার, কৃষি শিক্ষার ও কৃষি গবেষণার প্রসার শুরু হয়।

১৯৬০-৬১ সালে প্রাথমিক প্রকল্পরূপে (Pilot Project) সারা দেশে ৭টি জেলা নির্বাচন করা হয়। এই কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয় "নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচী (IADP)। চতুর্থ পরিকল্পনাকালের প্রথমে উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবিত হয় ও ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়। এই দুটি প্রকল্পের প্রয়োগের মিলিত ফলই হচ্ছে সবুজ বিপ্লব।

৫৭.৪.৪ সবুজ বিপ্লবের সুফল

ভারত সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ভারত সত্তরের দশক থেকে একটি "সবুজ বিপ্লবের" সুফল ভোগ করছে। ষাটের দশকের শেষ পর্যায় এবং সত্তরের দশক থেকে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে কতকগুলি কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।

IADP এবং HYVP প্রকল্পটি প্রথম দিকে কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও হরিয়ানার ৭টি নির্বাচিত জেলায় প্রযুক্ত হয়। পরে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে, দিল্লী, রাজস্থান প্রভৃতি গম-উৎপাদনকারী অঞ্চলে নতুন কৃষি উৎপাদনকৌশল বিশেষ সুফল সৃষ্টি করে। ধান, জওয়ার, বাজরা, ভুট্টার ক্ষেত্রেও সীমিত পর্যায়ে এই কৌশল সুফলদায়ী হয়েছে। ধানের ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবাংলার নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবাংলায় বর্ধমান, মেদিনীপুরে নতুন কৃষি-উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে দো-ফসলী চাষ সুফল সৃষ্টি করেছে। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর কয়েকটি অঞ্চলেও সবুজ বিপ্লবের সুফল পাওয়া গিয়েছে।

সবুজ বিপ্লবের প্রধান সুফলগুলি হল—

১. কৃষি জমির হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি। পাঞ্জাবে হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনের সর্বাধিক রেকর্ড হল ২৫৭৭ কে. জি.। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হেক্টর প্রতি এত বেশী গম উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি।

২. সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন অনেক বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীল সম্পদের (Productive Assets) পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত আয় বর্তমানে কিছু পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্যে বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের (Employment) কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছে।

৩. দেশে শিল্প-ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন আরম্ভ হয়েছে। ট্রাক্টর, পাম্পসেট, ইস্পাতের লাঙ্গল প্রভৃতি উৎপাদিত হয় শিল্পক্ষেত্রে এবং সেগুলি ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে। অপরদিকে কৃষিভিত্তিক শিল্পও (Agroindustries) সম্প্রসারিত হয়েছে।

৪. সবুজ বিপ্লবের আর একটি সুফল হল কৃষিব্যবস্থাকে বাজারমুখী করে তোলা সম্ভব হয়েছে (Market Oriented)। ভারতে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষির বাণিজ্যকরণ (Commercialization of Agriculture) শুরু হয়েছিল সেটি মূলত দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীতে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিকে যে বাজারমুখী করে তোলা হয়েছে, সেটি শুধু দেশের মধ্যে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতের কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকেই।

সবুজ বিপ্লবের সুফল হিসাবে ভারত খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। এর ফলে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অনেক কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ কমেছে।

৫৭.৪.৫ নতুন কৃষি প্রযুক্তির ত্রুটি

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ব্রায়ান জাভীর মতে— সবুজ বিপ্লবের নুতন কৃষি-কৌশল ভারতের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি। অপরপক্ষে, এর কাহিনী গ্রথিত আছে আমেরিকার বিদেশ নীতির বুননে। এটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সামাজিক বিপ্লব দমন করে সারা পৃথিবী জুড়ে মুনাফা লাভের নিরাপদ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যদি খরা, অনাবৃষ্টি ও বন্যাজনিত অসুবিধা কাটিয়েও সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা সুনিশ্চিত করতে পারত, তবেই সরকারের পক্ষে "সবুজ বিপ্লব'কে "বিপ্লব" বলার দাবী সম্পূর্ণ সার্থক হত।

চিরাচরিত প্রযুক্তিতে ছোট জোত এবং বড় জোত সমান সুবিধা পেত। সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে যে নতুন কৃষিপ্রযুক্তির প্রবর্তিত হয়েছে তার দুটি দিক — যান্ত্রিক এবং জৈব-রাসায়নিক। যান্ত্রিক দিকটি বড় জোতের অনুকূল। কিন্তু জৈব-রাসায়নিক দিকটি মাত্রা নিরপেক্ষ (Scale neutral), অর্থাৎ ছোট বা বড় — উভয় ধরনের জোতই এই দিকটির সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু মাত্রা নিরপেক্ষ হলেও এই জৈব-রাসায়নিক বা বীজ-সার প্রযুক্তি সম্পদ নিরপেক্ষ (Resource neutral) নয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এখানে বড় জোতগুলির বেশী সুবিধা হয়েছে।

ভারতে সবুজ বিপ্লবের ফলে, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা এলেও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা লাভ ও দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি— এই দুটি আপাতবিরোধী ঘটনা এখানে একই সঙ্গে ঘটেছে। তাই বলা যায়, সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্যসমূহের অন্যতম— আয়-বৈষম্য হ্রাস— সফল হয়নি।

নতুন প্রযুক্তিতে দরিদ্র চাষীদের কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পায়নি। এতে যন্ত্রশক্তি অধিক পরিমাণে প্রয়োগের ফলে এই নতুন উৎপাদন পদ্ধতি শ্রম-নিবিড় (Labour-intensive) না হয়ে মূলধন-নিবিড় (Capital-intensive) হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সবুজ বিপ্লব খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনলেও কৃষকদের ক্ষেত্রে সার, বিদ্যুৎ এবং জলসেচের জন্য পাম্পসেট চালু করার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার সৃষ্টি করেছে।

৫৭.৪.৬ সবুজ বিপ্লব ও ভূমিসংস্কার

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্রিটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভূমি সংস্কার, শিল্প বিপ্লব ও অর্থনৈতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল।

অনেকে মনে করেন, সবুজ বিপ্লব ভারতীয় কৃষিতে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনকে সঠিক গুরুত্ব দেয়নি। ভূমি সংস্কার না করে কেবলমাত্র সার, সেচ, বীজ ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদন হয়তো বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু তার সুফলকে দেশের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করা যায় না। এর জন্য ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মূল লক্ষ্য ছিল ছোট জোত ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। দেশের খাদ্যাভাব দূর করা, খাদ্যের আমদানি কমানো এবং খাদ্যশস্য সহ সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা—এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। সেজন্য নতুন প্রযুক্তি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ভূমি সংস্কার সমান গুরুত্ব লাভ করেনি। অর্থাৎ পরিকল্পনা কমিশন কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোগত (structural) পরিবর্তন না এনে পরিমাণগত পরিবর্তনকেই প্রধান বলে গণ্য করেছেন।

সবুজ বিপ্লবের সুবিধাগুলি ধরে রাখতে হলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ব্যাপক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যদি জমির পুনর্বণ্টন হয়, যদি এর সঙ্গে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি যোগ হয় এবং কৃষকরা যদি সমবায় সমিতিগুলির (Cooperative Society) কাছ থেকে ঋণ নেবার সুবিধা পায়, তবেই বিপুল সংখ্যক কৃষিকাজে নিযুক্ত মানুষ সবুজ বিপ্লবের সুবিধা পেতে পারে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির নতুন মালিকদের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করার যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে সবুজ বিপ্লবের সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিতর্কের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে— কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমি সংস্কার বেশী গুরুত্বপূর্ণ না, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ভালভাবে প্রয়োগ করতে গেলে প্রথমে ব্যাপক ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য ভূমি-সংস্কার এবং নতুন প্রযুক্তি এই দুয়েরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি উপায় শুধু পরস্পর নির্ভরশীলই নয়, এরা একে অন্যের পরিপূরক।

৫৭.৫ কৃষি ঋণ — ভূমিকা

কৃষিপ্রধান ভারতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণগুলির মধ্যে কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের ওপর যে ঋণভার (Agricultural Indebtedness) রয়েছে তা অন্যতম।

উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য শিল্পের মত কৃষিক্ষেত্রেও অর্থ অপরিহার্য। বীজ, সার, সেচকার্য, কৃষিশ্রমিকের মজুরি, উন্নত কৃষি উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, কৃষিকাজের আরম্ভ থেকে ফসল বিক্রয় পর্যন্ত কৃষকের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ, উপযুক্ত দাম না পাওয়া পর্যন্ত ফসল ধরে রাখা — এই সব নানা কারণে কৃষিতে অর্থের প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত, সমবায় অথবা যৌথ চাষ (Collective Farming), যে সাংগঠনিক অবস্থায় উৎপাদন হোক না কেন— কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের দুটি উৎস সাধারণত দেখা যায়।

১. কৃষির আয় থেকে সৃষ্টি সঞ্চয় এবং ২. ঋণ

উন্নত দেশে কৃষির অতীত ও চলতি সঞ্চয় থেকে কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সম্ভব। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের কৃষি, উন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থসংস্থানের জন্য ঋণের ওপরেই প্রধানত নির্ভর করতে হয়।

৫৭.৫.১ কৃষি ঋণের প্রকারভেদ

সময় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষিঋণের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। সময় বা কার্যকাল অনুযায়ী তিন শ্রেণীর কৃষি ঋণের প্রয়োজন হয়— স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

১. প্রতি বছর ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাকে কৃষির "চলতি পুঁজি" বলে। এজন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন।

২. কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ ক্রয়ের জন্য, কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন জমির ছোটখাট উন্নতির জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয়, তা হল মাঝারি মেয়াদী ঋণ। এই ধরনের ঋণ ১৫ মাসের বেশী সময়ের জন্য প্রয়োজন এবং অনধিক ৫ বছরের মধ্যেই পরিশোধযোগ্য।

৩. জমির স্থায়ী উন্নতি, নতুন জমি ক্রয়, পতিত জমি উদ্ধার, জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা তৈরী, মূল্যবান কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ, খামারবাড়ি নির্মাণ, পুরাতন ঋণ পরিশোধ— ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন। এই ধরনের ঋণ ১৫/২০ বছরের আগে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

৫৭.৫.২ কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের সমস্যা

কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের সমস্যা অনেক। এখানে আমরা ওই সব সমস্যার কথা আলোচনা করবো।

১. গরীব ও প্রান্তিক চাষী একবার ঋণ নিলে জীবনে তার পক্ষে আর তা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে সাধারণ চাষীর এই অবস্থার এখনও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

২. ১৯৫১ সালের তুলনায় নব্বই-এর দশকে সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী অনুৎপাদনশীল দেনা (যে দেনা কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না) বা (Unproductive Loan) কমেছে এবং মাথাপিছু উৎপাদনশীল ঋণ বেড়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের মতে এ তথ্য থেকে যদি মনে হয় যে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, তাহলে ভুল হবে। উৎপাদনশীল ঋণের অনুপাত বৃদ্ধির কারণ হল ধনী ও বড়জোতের কৃষকদের মধ্যে উৎপাদনশীল ঋণের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া।

৩. সাধারণ ক্ষুদ্র জোতের চাষীর দেনার বোঝা সম্বন্ধে আলোচনায় সচরাচর লক্ষ্য করা যায়,— চাষীর নিরক্ষরতা, জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি, ফসল বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, চাষীর অপচয়মূলক ব্যয়ের স্বভাব ইত্যাদিকে তার ক্রমবর্ধমান দেনার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, কৃষিতে বড়ো জোতের মালিক ও ক্ষুদ্র চাষীর মধ্যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কই হল, অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও চাষীর দেনার মূল কারণ। এই প্রতিকূল উৎপাদন সম্পর্ক চাষীর অবস্থাকে এক ভূমিদাসের (Bonded Labour) পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে।

৫৭.৫.৩ কৃষি ঋণের বিভিন্ন কারণ

নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারণে কৃষকরা সর্বদা ঋণ নিতে বাধ্য হয়—

(ক) কৃষকের স্বার্থের প্রতিকূল ভূমি ব্যবস্থা।

(খ) কৃষকের দেনার বেশিরভাগই হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুদে-আসলে জমে ওঠা বিপুল ঋণ।

(গ) অধিকাংশ ছোট জোতের চাষীরা যে আধুনিক কৃষি প্রকৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করে না— এর জন্য তাদের রক্ষণশীল মনোভাব দায়ী নয়। প্রতিকূল উৎপাদন সম্পর্ক তাদের নিঃসম্বল এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগে অক্ষম করে রেখেছে।

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে কাজের এবং উপার্জনের বিকল্প উৎসের অভাবে দরিদ্র কৃষকরা সময়ে অসময়ে মহাজনের কাছেই হাত পাততে বাধ্য হয়। ফলে তার দেনা আর শেষ হয় না।

(ঙ) ফসল বিক্রয়ের ও কৃষি ঋণের ভাল ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে আদৌ ছিল না। স্বাধীনতার পর ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এ বিষয়ে কিছুটা উন্নতি হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী হয়নি। ফলে অভাবী কৃষকদের মহাজনের উপর নির্ভরশীলতা থেকেই গেছে।

(চ) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হার এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised Unemployment) কৃষিঋণের জন্য খানিকটা দায়ী। কারণ, জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে চাষের জমির খণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্তকরণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে জমি থেকে কৃষকের আয় কমেছে। ফলে চাষীর নিয়মিত দেনার পরিমাণও বেড়েছে।

(ছ) সবশেষে বলা যায়, মামলা-মোকদ্দমা, সামাজিক রীতি পালনে কৃষকের ক্ষমতা না থাকলেও অপচয়মূলক ব্যয়ের অভ্যাস দূর হয়নি। এই সব অনুৎপাদনশীল (Unproductive) ব্যয় ও ভোগ ব্যয় (Consumption Expenditure) কৃষকের কৃষির জন্য ঋণ ছাড়াও অন্যান্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।

৫৭.৫.৪ কৃষি ঋণের বাজার

অন্যান্য বাজারের মত কৃষি ঋণের বাজারেও দুটি দিক রয়েছে— কৃষিঋণের চাহিদা ও যোগান। কৃষি ঋণের চাহিদার একটি বড় অনুপাতই চলতি ব্যয়ের জন্য এবং চলতি ব্যয়ের একটি বড় অনুপাত আবার পরিবারের সদস্যদের জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন হয়। কৃষি ঋণের যোগানের ক্ষেত্রে— ভারতের গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক বিভিন্ন বাজার, যেমন— জমি লীজের বাজার, শ্রমের বাজার, ঋণের বাজার ও উৎপন্ন শস্যের বাজারের মধ্যে তার ক্ষমতার দ্বারা অভ্যন্তরীণ সংযুক্তি ঘটায় অর্থাৎ কৃষকরা একজন ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৫৭.৫.৫ ভারতে কৃষি ঋণের কুফল

কৃষি ঋণ ভারের অর্থনৈতিক কুফল হল, কৃষকদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশই কমতে থাকে।

সামাজিক কুফল হল, দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত কৃষক মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয় বলে তার কোন সামাজিক মর্যাদা থাকে না।

নৈতিক কুফল হল, চিরন্তন ও ক্রমবর্ধমান ঋণভার ভারতের কৃষক সমাজকে স্বাধীন জীবিকা ও জীবন ধারণের সুস্থ ও স্বাভাবিক উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে।

৫৭.৫.৬ ভারতে কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

ভারতে কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের উৎসগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

১. অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস এবং ২. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির মধ্যে আছে (ক) গ্রামীণ মহাজন (খ) আত্মীয় পরিজন (গ) গ্রামীণ ব্যবসায়ী (ঘ) জমিদার-জোতদার এবং (ঙ) কমিশন-এজেন্ট নামে পরিচিত ব্যবসায়ীরা।

অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি হল— (ক) সমবায় ঋণদান সমিতি (খ) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (গ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (ঘ) জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (ঙ) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (চ) তপসীলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (ছ) সমবায় ও গ্রামীণ ঋণের সর্বোচ্চ (Apex) সংস্থা হিসাবে কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশের জাতীয় ব্যাঙ্ক (NABARD) এবং (জ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)।

৫৭.৫.৭ গৃহীত ব্যবস্থা

কৃষি ঋণের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. গ্রামীণ ঋণ পুনর্গঠনের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ।

২. কৃষি ঋণ প্রদানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভূমিকা এবং

৩. কৃষি ঋণভার সংক্রান্ত আইনের ভূমিকা।

৫৭.৫.৮ কৃষি ঋণ পুনর্গঠনে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিগুলি গ্রামীণ ঋণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব সুপারিশ করেছে, সেগুলি এখানে আলোচিত হল। গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করার জন্য এবং গ্রামীণ জীবনে ব্যাঙ্ক মূলধনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) ১৯৫৩ সালে তার বিবরণ পেশ করে।

১৯৫৩ সালে নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) গঠিত হয়। এই কমিটি সুসংহত গ্রামীণ ঋণের কাঠামো গঠন করার সুপারিশ করে।

১৯৬৯ সালে একটি গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয় (All India Rural Credit Review Committee)। এই কমিটি ঋণ সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫৭.৫.৯ কৃষি ঋণের উৎস হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্ক ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ সরবরাহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা বলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার তিনটি স্তর (Three Tier) আছে— রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ, জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহ এবং প্রাথমিক ঋণদান সমিতি। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয়। আবার জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলিকে ঋণ দেয়। প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলি সরকারের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করে।

১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতিষ্ঠানগত গ্রামীণ ঋণের (Institutional Rural Credit) ৪৯ শতাংশ এসেছে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি থেকে। তবুও ভারতের সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি সর্বত্র সমানভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ দেখাতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলির প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে।

৫৭.৫.১০ জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক

জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (National Bank for Agricultural Rural Development বা NABARD) কাজ আরম্ভ করে ১৯৮২ সালের জুলাই থেকে। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলিকে পুণঃঋণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটীর ও গ্রামীণ শিল্প, গ্রামীণ কারিগর, হস্তচালিত শিল্প এবং এগুলির সঙ্গে জড়িত কাজের জন্য সবরকমের উৎপাদন ও বিনিয়োগ ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

RBI-এর কৃষি ঋণদান বিভাগের সমস্ত কাজ এবং কৃষি পুনঃ-ঋণসরবরাহ ও উন্নয়ন নিগম (The Agricultural Re-Finance and Development Corporation) অধিগ্রহণ করে এই ব্যাঙ্ক সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি-উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থানের প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করছে। এতদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে যে পুনঃঋণদানের সুবিধা দিত, সেই কাজও বর্তমানে NABARD সম্পাদন করছে। NABARD-এর শেয়ার মূলধন প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা থাকলেও পরবর্তীকালে ৫০০ কোটি টাকা হয়।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য NABARD টাকা সংগ্রহ করে ভারত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক এজেন্সী (Multilateral and Bilateral), বাজার এবং জাতীয় গ্রামীণ ঋণ (দীর্ঘমেয়াদী ঋণ) তহবিল থেকে।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য NABARD স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভৃতি সব রকমের ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

NABARD রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক সংস্থাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ দেয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিবর্তন করার ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কের আছে।

জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাকে NABARD অনধিক ২৫ বছরের জন্য পুনঃঋণ সরবরাহ (Refinance) হিসাবে ঋণ দিতে পারে। ১৯৯৫ সাল থেকে NABARD-এর আর একটি কাজ হচ্ছে, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের (The Rural Infrastructure Development Fund) কাজ তদারকি করা এবং এই তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে মাঝারি ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে ঋণ দেওয়া।

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর (IRDA) রূপায়ণের জন্য NABARD গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ ঋণের উৎস হিসাবে এই ব্যাঙ্কই এখন সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

৫৭.৫.১১ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Land Development Bank)

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank) নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই ব্যাঙ্ক কৃষি ছাড়াও সবরকমের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য না দেখাতে পারলেও, ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কৃষিমূলধনের উৎস হিসাবে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আশা করা যায়।

৫৭.৫.১২ ভারতের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

১৯৭৫ সালের অক্টোবরে ভারতে পাঁচটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Regional Rural Bank of India) স্থাপিত হয়। ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে ১৯৬টি এই ধরনের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে,

১. স্থানীয় সঞ্চয় সুসংহত করা।

২. কৃষিক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করা এবং জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মুখপাত্র হিসাবে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা।

৩. গুদামঘর তৈরী করা ও তা বজায় রাখার জন্য ঋণ দেওয়া।

৪. কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

৫. নিজ অঞ্চলে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির গুণগত ভূমিকা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ভিন্ন ধরনের। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামীণ ঋণ বা কৃষি মূলধন সরবরাহ করা।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহযোগী ব্যাঙ্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। সুতরাং সরকারের ঘোষিত নীতিই এই ব্যাঙ্কগুলির কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হবে— এই আশা করা যায়।

কৃষি ঋণের উৎস — বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

(তালিকা)

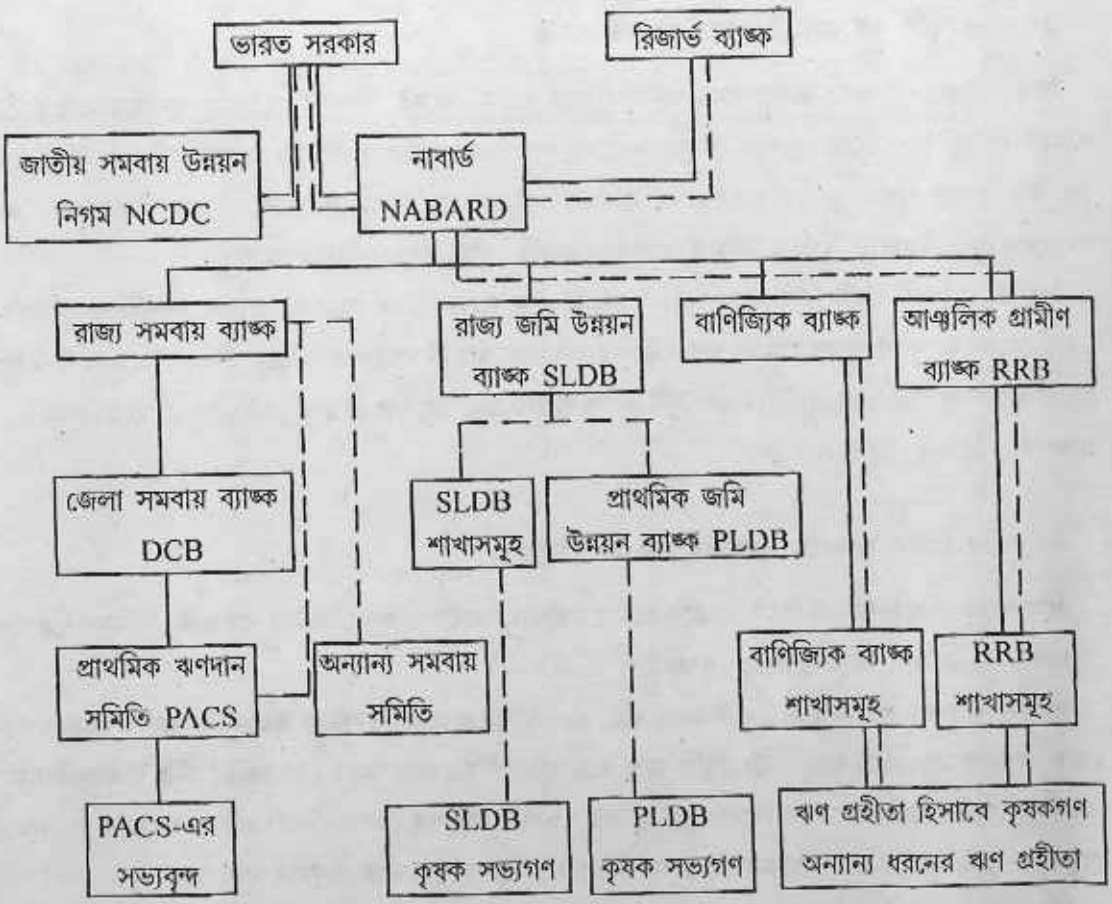

৫৭.৫.১৩ কৃষি ঋণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর ঋণ সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। এক্ষেত্রে ১৯৫৫ সাল থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে। পরোক্ষভাবে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে। ভারতের খাদ্য নিগমের (Food Corporation of India) প্রয়োজনেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে—একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের, ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সমবায় ঋণ কাঠামোর এবং অন্যদিকে ব্যাঙ্ক ও সরকারী দপ্তরের মধ্যে কৃষিঋণ সংক্রান্ত কাজের সংযোজনার অভাব ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করেছে।

৫৭.৫.১৪ কৃষি ঋণ এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

কৃষিজ উন্নয়নের জন্য ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা প্রথম থেকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পুরাতন কৃষিঋণ দপ্তরের কাজকর্মের প্রসার, সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বৃদ্ধি, গ্রামীণ ঋণ কাঠামোগত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ এবং কৃষিঋণ পুনঃসংস্থান নিগম স্থাপনে ও তার পরিচালনায় প্রধান অংশগ্রহণ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষি দপ্তর আছে। এর মাধ্যমে RBI বিভিন্ন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষির জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার পরামর্শে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে কৃষিঋণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিরীকরণ (Stabilisation)—এই দুটি পৃথক ঋণের জন্য তহবিল (Fund) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ককেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

৫৭.৫.১৫ গ্রামীণ ঋণদানে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ

গ্রামাঞ্চলে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসাবে গ্রামীণ মহাজন, আত্মীয়পরিজন, গ্রামীণ ব্যবসায়ী, জমিদার-জোতদার এবং কমিশন এজেন্ট নামে পরিচিত ব্যবসায়ীরা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের ৯২.৮ শতাংশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি মাত্র ৭.২ শতাংশ সরবরাহ করত। অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির মধ্যে তখন দুই শ্রেণীর গ্রামীণ মহাজন মিলে মোট ঋণের ৭১.৬ শতাংশের যোগান দিত। এই তথ্য থেকে সে সময়ের গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতিতে মহাজনদের প্রবল নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের মাত্রা অনুমান করা যায়।

কিন্তু ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে এই ৩০ বছরে কৃষি ও গ্রামীণ ঋণে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অবদান ৯২.৮ শতাংশ থেকে কমে ৩৮.৮ শতাংশে নেমে আসে। তার মধ্যে মহাজনদের অংশ ৭১.৬ শতাংশ থেকে কমে

মাত্র ১৬.৯ শতাংশ হয়েছে। এর দ্বারা মহাজনদের চড়া সুদে ঋণ দেওয়া থেকে চাষীদের মুক্ত করার জন্য গৃহীত সরকারী পদক্ষেপগুলির সাফল্য প্রমাণিত হয়।

৫৭.৫.১৬ কৃষি ঋণ সংক্রান্ত আইনের ভূমিকা

কৃষি ঋণের সমস্যার সমাধানে গৃহীত তৃতীয় ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আইনগত ব্যবস্থা। কৃষিঋণভার সংক্রান্ত আইনগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই ধরনের আইনের উদ্দেশ্য দুই রকমের। প্রথমত, পুরাতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা। দ্বিতীয়ত, নতুন ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাজনী ব্যবসায়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

এই ধরনের আইনগত ব্যবস্থায় কৃষকের ঋণভার আংশিক লাঘব হয়েছে। কিন্তু এই আইন প্রকৃত সমস্যার মূল স্পর্শ করেনি। পুরানো দেনা সম্পূর্ণ মকুব করে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর দ্বারা পরিলক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতির পথেই কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের মাথাপিছু আয়ের স্থায়ী বৃদ্ধির মধ্যেই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান রয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যগুলিতে একদিকে পুরানো ঋণ মকুবের, ঋণের দায়ে হাতছাড়া হওয়া জমি কৃষকের হাতে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ায়, পুরানো ঋণ আদায়ের মামলা রদ এবং গরীব ও ছোট চাষীদের কৃষি-ঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠানগত ও আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

৫৭.৫.১৭ উপসংহার

অধ্যাপক এ. এম. খুসরুর সভাপতিত্বে গঠিত কৃষিঋণ পর্যালোচনা কমিটি (ACRC) ১৯৮১ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে মন্তব্য করা হয়েছে, "দ্বৈত অর্থনীতি বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে বটে, কিন্তু মহাজনরা চলে যায়নি।" কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি এখনও রয়েছে এবং আগের তুলনায় কিছুটা কম হারে সুদ নিলেও ব্যাঙ্ক প্রভৃতির তুলনায় তারা অনেক চড়া সুদের হারে প্রধানত অনুৎপাদনশীল ও ভোগব্যয়ের জন্য ঋণ দিচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির যথেষ্ট প্রসার এবং আমানত জমার বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও এখনও তারা গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। এখনও গ্রামীণ পরিবারগুলির মাত্র ৩০ শতাংশ গ্রামীণ ঋণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলির দ্বারস্থ হয়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি এতদিনেও কৃষি ও গ্রামীণ ঋণের সমস্যার প্রান্ত সীমায়ও ভালভাবে পৌঁছাতে পারেনি।

৫৭.৬ পঞ্চায়েতীরাজ

সমগ্র কৃষি ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ কৃষির বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাফল্যলাভ করেনি। এই সমস্যার অন্যতম সমাধান হচ্ছে কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণের পথে পথিকৃৎ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চায়েতীরাজ।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলন যেমন একদিকে দরিদ্র জনসাধারণের আত্মরক্ষার আন্দোলন, তেমনি মিশ্র অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলন ছাড়াও কৃষকদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবার আর একটি উপায় বা সংগঠন রয়েছে। সেটি হল পঞ্চায়েতীরাজ। পঞ্চায়েতীরাজ হল একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৯ সালে। ভারতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে, গ্রামীণ জীবনের বিবিধ কাজে গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ হল এর উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কে অশোক মেটা কমিটির (১৯৭৮) এই হল দৃষ্টিভঙ্গী।

পঞ্চায়েতীরাজ হল গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্ব-শাসন ব্যবস্থা। এর কাঠামোটি তিনটি তল বা স্তরে বিভক্ত। সবচেয়ে নীচের তলায় গ্রাম পর্যায়ে হল গ্রাম পঞ্চায়েত। তার উপর তলায়, কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ব্লক পর্যায়ে হল পঞ্চায়েত সমিতি। তার ওপরে জেলা স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নিয়ে হল জেলা পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয় গ্রামবাসীদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে। তার সভাপতি ও উপসভাপতি হল যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় পঞ্চায়েত সমিতি। আর জেলাপরিষদ গঠিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধানদের নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে। পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গী হল গ্রামের মহিলা, যুবক, চাষী ও কারিগরদের বিভিন্ন সমিতি। অল্প খরচে, অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদে ন্যায়বিচারের জন্য গ্রামীণ আদালত বা ন্যায়পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের কৃষি-উৎপাদন, গ্রামীণ শিল্প, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, মা ও শিশুর কল্যাণ, এজমালী গো-চারণ-ভূমি, পথঘাট, পুকুর, কূপ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ হল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাজের অন্তর্গত।

৫৭.৬.১ পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার

সীমা বহির্ভূত অতিরিক্ত বেনামী জমি উদ্ধার করা, সেই খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা, খাস জমির প্রাপকদের আইনগত অধিকার সুনিশ্চিত করা, বর্গাদারদের আইনগত অধিকার দেওয়া, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। পাশাপাশি বর্গাদারদের ও খাস জমির প্রাপকদের ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে পঞ্চায়েত সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ভূমি সংস্কার আন্দোলনকে একটি বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছে।

৫৭.৬.২ পঞ্চায়েত ও কৃষি উন্নয়ন

গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি এবং পশুপালন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অপরদিকে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্যাঙ্কের ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত আই. আর. ডি. পি. (IRDP), সি.এস.এম.আই. (CSMI), এস. এফ. সি. পি. (SFCP) ইত্যাদি কর্মসূচীর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের কাজ এবং তাদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের

মূল দায়িত্ব পঞ্চায়েতই বহন করেছে। বর্তমানে "জীবনধারা" নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে জলের উৎস বর্তমানে রয়েছে, তার সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর সংযুক্ত করে সেচের সমৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। কিছু নির্বাচিত ব্লকে এই বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে পঞ্চায়েত।

৫৭.৬.৩ পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ কর্মসূচী

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী কমিউনিটি হেল্‌থ্‌ ভলান্টিয়ার এবং হেল্‌থ্‌ গাইড ইত্যাদি পদে যাঁরা কাজ করেন, প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চায়েত তাঁদের তত্ত্বাবধান করে। পরিবার কল্যাণ এবং টীকা দেওয়ার কাজকর্মের সঙ্গে পঞ্চায়েত যুক্ত।

গ্রামীণ এলাকায় হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

৫৭.৬.৪ পঞ্চায়েত ও শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন কর্মসূচী এবং জেলা যোজনার টাকায় স্কুল বাড়ি তৈরী এবং মেরামতির কাজ, পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের কাজে পঞ্চায়েত প্রশংসনীয় অবদান রাখতে পেরেছে।

৫৭.৬.৫ পঞ্চায়েত ও সমাজ কল্যাণ

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতগুলি সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিশুবিকাশকেন্দ্র ও অঙ্গানওয়ারী কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান করে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন বিধবা মহিলাদের জন্য ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং কৃষকদের জন্য ভাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ এবং তাদের টাকা দেওয়ার কাজ পঞ্চায়েতই করছে। জীবনবীমা নিগমের (LIC) উদ্যোগে প্রবর্তিত ভূমিহীন শ্রমিকদের দলগত বীমা পরিকল্পনাও পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত হয়।

৫৭.৬.৬ পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্মসূচী

ইন্‌ল্যান্ড ফিসারিজ প্রোগ্রাম বা মৎস্য চাষ প্রকল্প, মৎস্যচাষীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মৎস্য দপ্তরের প্রকল্প, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের অন্তর্ভুক্ত "লোকদীপ" কর্মসূচী, নির্বাচিত কিছু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ব্লকের লোকেদের দ্বারা গঠিত লোকশিল্প কমিটির মাধ্যমে লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিচর্চার কাজ পঞ্চায়েতের সাহায্যে সম্পন্ন হচ্ছে।

কর আদায়ের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির জন্য পঞ্চায়েত বিভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতকে উৎসাহদায়ক অনুদান দেবার ব্যবস্থা করে। উন্নয়নমূলক কাজকর্মে গ্রাম পঞ্চায়েত এই অর্থ ব্যয় করতে পারে।

৫৭.৬.৭ ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্যাপ্তি

মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড ছাড়া ভারতের আর সব কটি রাজ্যেই পঞ্চায়েতীরাজ সম্প্রসারিত হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম ও পন্ডিচেরী ছাড়া সর্বত্রই পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তিত হয়েছে।

৫৭.৬.৮ পঞ্চায়েতীরাজের কাজের অগ্রগতি ঃ একটি মূল্যায়ন

বাস্তবক্ষেত্রে পঞ্চায়েতীরাজের ৪টি প্রধান ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রুটিগুলি হল—

১. সরকারী প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতের কাজকর্মে সংগতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচিত গ্রামীণ প্রতিনিধিদের অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশও করে।

২. পঞ্চায়েতগুলি সরকারী অনুদান আদায় করার ব্যাপারে যতটা উৎসাহী, গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে কর প্রভৃতির মাধ্যমে নিজস্ব আর্থিক সম্বল সংগ্রহে ততটা উৎসাহী নয়।

৩. অধিকাংশ রাজ্যেই ভূস্বামী ও গ্রামীণ ধনীরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থসাধন করে।

৪. গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্যের দরুন পঞ্চায়েতী সংস্থাগুলির যেভাবে কাজ করা উচিত, সেভাবে তারা কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ পঞ্চায়েতীরাজের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত হয়নি।

তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অল্পদিন পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তিত হলেও এরই মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজে এরা সফলভাবে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা একদিকে গ্রামীণ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে, অন্যদিকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে গ্রামীণ জনসাধারণের কাজে এনে দিয়েছে।

৫৭.৭ সারাংশ

ভারতে কৃষির বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এই বিভিন্ন সমস্যাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— ১. প্রতিষ্ঠান গত সমস্যা এবং ২. প্রকৌশলগত সমস্যা। প্রথমটির মধ্যে রয়েছে—ভূমিসংস্কার। কৃষিঋণ এবং কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণ। দ্বিতীয়টির মধ্যে রয়েছে— কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত বা উৎপাদন পদ্ধতিগত সমস্যা। এই দুটি সমস্যার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থাও রয়েছে— সরকার গৃহীত ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য আরও ব্যবস্থা।

৫৭.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

- **অন্তকাঠামো ঃ** অন্তকাঠামো হল নানারকম সংশ্লিষ্ট পরিষেবার সমষ্টি, যা কোন মূল কাজের পক্ষে অপরিহার্য।
- **সাংগঠনিক সংস্কার ঃ** বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পরিবর্তনের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা।
- **ভূমি সংস্কার ঃ** কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গঠনের উদ্দেশ্যে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনকে বলা হয় ভূমি সংস্কার।
- **অর্থনৈতিক জোত ঃ** যে পরিমাণ জমির নীট আয় থেকে একটি গড় পরিবার মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে, তাকে অর্থনৈতিক জোত বলা হয়।
- **কুলাক ঃ** বৃহৎ কৃষকদের গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি।
- **প্রজাকৃষক ঃ** যে সমস্ত কৃষক অন্যের জমিতে ইজারা ব্যবস্থায় চাষ করে।
- **সবুজ বিপ্লবের দুটি প্রকল্প ঃ** "নিবিড় কৃষি জেলা প্রকল্প" এবং "উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রকল্প"।
- **মাত্রানিরপেক্ষ ঃ** যখন কৃষিতে গৃহীত কোন পদ্ধতি জোতের আয়তনের উপর নির্ভর করে না, যেমন— কৃষিতে জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ।
- **শ্রমনিবিড় ঃ** যে উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধন অপেক্ষা শ্রমের নিয়োগ বেশী হয়।
- **মূলধন নিবিড় ঃ** যে উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রম অপেক্ষা মূলধনের নিয়োগ বেশী হয়।

৫৭.৯ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন কী?

(খ) সবুজ বিপ্লব কী?

(গ) ভূমি সংস্কার বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) কৃষিতে উন্নয়নের বিকেন্দ্রিকতা কী?

(ঙ) কোন বৎসরে পঞ্চায়েতী রাজের সূচনা হয়?

(চ) কৃষি ঋণের প্রতিষ্ঠানগত উৎস কী কী?

(ছ) কৃষি ঋণের অ-প্রতিষ্ঠানগত উৎস কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

২। (ক) সবুজ বিপ্লব ও ভূমি সংস্কারের সম্পর্ক কী?

(খ) ভারতের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ কী কী?

(গ) ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতীরাজের ভূমিকা কী?

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের কৃষি ঋণ বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভূমিকা কী?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

৩। (ক) ভারতে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।

(খ) ভারতে কৃষিঋণের বাজার কোন অর্থে খণ্ডিত? এই খণ্ডিত বাজারের বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা কর।

(গ) ভারতে কৃষিঋণের প্রধান উৎসগুলি বর্ণনা কর। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এইসব উৎসের আপেক্ষিক গুরুত্বের কী কোনও পরিবর্তন হয়েছে?

(ঘ) সবুজ বিপ্লব বলতে কী বোঝেন? সবুজ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য কী কী? দেশের সব রাজ্যে সবুজ বিপ্লব সমান সফল হয়নি কেন?

(ঙ) সবুজ বিপ্লব কী? ভারতীয় কৃষিকে সবুজ বিপ্লব কীভাবে প্রভাবিত করেছে?

(চ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

(ছ) ভারতে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলি কী? ভারতে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে?

(জ) গ্রামীণ ঋণের পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলির সুপারিশ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১. গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি (১৯৪৯)।

২. নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (১৯৫৪)।

৩. নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা কমিটি (১৯৬৯)।

(ঝ) গ্রামীণ ঋণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্কের (NABARD) ভূমিকা আলোচনা কর।

(ঞ) ভারতে সাম্প্রতিককালের কৃষি সংস্কারের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি সংস্কারের তাৎপর্যের উপর মন্তব্য কর।

৫৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। J. Bhagwati and S. Chakravarty — Contributions to Indian Economic Analysis.

২। Economic Survey — 1988-89, 1999-2000, 1995-96.

৩। Indian Economics — R. Dutt and Sundaram.

৪। An Aspect of Indian Agriculture — Economic Weekly, Annual Number, 1962.

একক ৫৮ □ শিল্প-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা ও গৃহীত ব্যবস্থা

গঠন

৫৮.০ উদ্দেশ্য

৫৮.১ প্রস্তাবনা

৫৮.২ ১৯৫১ সালের শিল্পোন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন

৫৮.২.১ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের কাজ

৫৮.২.২ ১৯৫১ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতির মূল্যায়ন

৫৮.৩ ১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি

৫৮.৩.১ ১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতির উদ্দেশ্য ও বিষয়

৫৮.৩.২ মন্তব্য

৫৮.৪ ১৯৭৩ সালের ভারত সরকারের শিল্প লাইসেন্স নীতি

৫৮.৪.১ উদ্দেশ্য

৫৮.৪.২ বিষয়

৫৮.৪.৩ মূল্যায়ন

৫৮.৫ পরবর্তী শিল্প লাইসেন্স নীতিসমূহ

৫৮.৫.১ ১৯৭৫ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি

৫৮.৫.২ ১৯৮৭ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি

৫৮.৫.৩ শিল্প লাইসেন্স নীতিসমূহের সামগ্রিক মূল্যায়ন

৫৮.৫.৪ ১৯৯১ সালের নয়া শিল্পনীতি ও শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ

৫৮.৫.৫ মূল্যায়ন

৫৮.৬ ভারতীয় বেসরকারী শিল্পে কেন্দ্রীকতা বা কেন্দ্রীভবন

৫৮.৬.১ শিল্পে কেন্দ্রীভবন কাকে বলে?

৫৮.৬.২ শিল্পে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের মাত্রা পরিমাপ ও একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশন

৫৮.৬.৩ একচেটিয়া কারবার ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসার পার্থক্য

৫৮.৬.৪ কমিশনের মতে একচেটিয়া ব্যবসা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ের অগ্রগতির কারণ

৫৮.৬.৫ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সরকারের ভূমিকা

৫৮.৬.৬ কেন্দ্রীকতার কুফল
৫৮.৬.৭ কেন্দ্রীকতার সুফল
৫৮.৬.৮ সুপারিশ
৫৮.৬.৯ একচেটিয়া কারবার এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায় প্রতিরোধ আইনের কয়েকটি দিক
৫৮.৬.১০ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধে এবং ভারতে একচেটিয়া মূলধন বৃদ্ধির প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা
৫৮.৭ শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা — কাকে বলে
৫৮.৭.১ রুগ্ন শিল্প— সংজ্ঞার পরিবর্তন
৫৮.৭.২ শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ড
৫৮.৭.৩ শিল্প রুগ্নতা— সমস্যার বিভিন্ন দিক
৫৮.৭.৪ শিল্প রুগ্নতার লক্ষণ
৫৮.৭.৫ শিল্প রুগ্নতার কারণ ঃ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ
৫৮.৭.৬ শিল্প রুগ্নতার ফলাফল
৫৮.৭.৭ শিল্প রুগ্নতার সম্ভাব্য প্রতিকার
৫৮.৭.৮ গৃহীত ব্যবস্থা
৫৮.৮ শিল্পক্ষেত্রে অর্থসংস্থান
৫৮.৮.১ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের পুঁজি
৫৮.৮.২ ভারতের শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় মূলধনের উৎস
৫৮.৮.৩ দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাসমূহ
৫৮.৮.৪ বৃহদায়তন শিল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাগুলির পৃথক আলোচনা
৫৮.৮.৫ কাজের মূল্যায়ন
৫৮.৮.৬ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ঋণদানকারী বিভিন্ন সংস্থা
৫৮.৮.৭ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে রাজ্যের সাহায্য
৫৮.৮.৮ কাজের মূল্যায়ন
৫৮.৯ সারাংশ
৫৮.১০ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা
৫৮.১১ অনুশীলনী
৫৮.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৫৮.০ উদ্দেশ্য

ভারতের শিল্পনীতিতে শিল্প লাইসেন্স বা শিল্প গঠনের অনুমতি প্রদান করার ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট হয়। শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল শিল্পোন্নয়ন ও নতুন শিল্পের গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণবিধি।

৫৮.১ প্রস্তাবনা

ভারত সরকারের শিল্পনীতি প্রধানত মিশ্র অর্থব্যবস্থার (Mixed Economy) উপর ভিত্তিশীল কারণ ধনতন্ত্র এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্র কোনটিই আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠন করাই ভারতের উদ্দেশ্য। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় একটি সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) এবং একটি বেসরকারী ক্ষেত্র (Private Sector) থাকে। মিশ্র অর্থব্যবস্থার একটি সমস্যা হচ্ছে, সরকারী ক্ষেত্রের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সীমারেখা কী হবে তা নিরূপণ করা এবং সেই অনুযায়ী নীতি গ্রহণ করা।

৫৮.২ ১৯৫১ সালের শিল্পোন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন

১৯৪৮ সালে ঘোষিত স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারের প্রথম শিল্পনীতি এবং ১৯৫৬ সালে ঘোষিত সরকারের দ্বিতীয় শিল্প নীতির মধ্যবর্তীনীতি হচ্ছে ১৯৫১ সালে গৃহীত শিল্পোন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় শিল্পে উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯৫১ সালের আইনে সরকারকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

৫৮.২.১ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের কাজ

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের কাজ ঃ

১. উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করা

২. উৎপাদনের কর্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য আনা

৩. শিল্পের অগ্রগতির পরিমাপ করা

৪. প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার (installed capacity) পূর্ণতর ব্যবহারের সুপারিশ করা

৫. বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের উপায় নির্দেশ করা

৬. নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর বণ্টনে সাহায্য করা।

এছাড়া এই আইনের নিম্নলিখিত বিধানগুলিও উল্লেখযোগ্য—

(ক) সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা অথবা পুরাতন শিল্পকে সম্প্রসারিত করা চলবে না। অনুমোদন করার আগে এই শিল্পের অবস্থান সম্বন্ধে সরকার শর্ত আরোপ করতে পারেন।

(খ) যে সমস্ত শিল্পের উৎপাদনে অবনতি ঘটেছে অথবা যে সমস্ত উৎপন্ন জিনিসের মানের অবনতি ঘটেছে সেই সমস্ত শিল্পের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে সরকার তদন্ত করতে পারবে। যে সমস্ত শিল্প জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা যে সমস্ত শিল্পের পরিচালনা অংশীদারদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে সেগুলি সম্বন্ধেও সরকার তদন্ত করতে পারবে।

(গ) যে সমস্ত শিল্প সরকারের উন্নতিমূলক নির্দেশ পালনে অসমর্থ হবে সেগুলিকে সরকার নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে।

(ঘ) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রেজিষ্ট্রীকৃত হতে হবে। তালিকাভুক্ত শিল্পের কোন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময়ও সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন (licenec) গ্রহণ করতে হবে। পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠান নতুন সামগ্রী উৎপাদন করার প্রয়াসী হলেও তার জন্য অনুমোদন নিতে হবে।

কোন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার পর সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারে, যেমন—মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, সামগ্রী বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা, লোকসানমূলক ক্রিয়াকলাপ নিষেধ করা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা অথবা তার মান নির্ধারণ করে নির্দেশ প্রদান করা।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এই আইন অনুযায়ী শিল্পনীতি পরিচালনা করার অনুকূল অভিমত প্রদান করেছিলেন।

৫৮.২.২ ১৯৫১ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতির মূল্যায়ন

উপরোক্ত আইনটিকে বেসরকারী ক্ষেত্রে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সরকারের অনুমোদন ছাড়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা অথবা পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ না করতে পারা বেসরকারী ক্ষেত্রের ওপর সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

কিন্তু ভারতের মত মিশ্র অর্থনীতিতে যেখানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ প্রতিষ্ঠা করার নীতি গৃহীত হয়েছে, সেই দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং সমাজতন্ত্রের দ্রুত প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

৫৮.৩ ১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি (Industrial Licensing Policy, 1970)

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকার কর্তৃক পুরাতন শিল্প লাইসেন্স নীতির পরিবর্তন করে একটি নূতন শিল্প লাইসেন্স নীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫১ সালের শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন বিধির পর্যালোচনা এবং একচেটিয়া ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৬৭ সালের শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন বিধির পর্যালোচনা এবং একচেটিয়া ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৬৭ সালের হাজারী কমিটি এবং শিল্প লাইসেন্স প্রথার সম্পূর্ণ তদন্ত করার পর ১৯৬৯ সালের দত্ত কমিটি (Dutta Committee) যে সুপারিশ প্রদান করেন তার ভিত্তিতেই শিল্প লাইসেন্স নীতি ঘোষিত হয়েছিল।

৫৮.৩.১ ১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতির উদ্দেশ্য ও বিষয়

১৯৭০ সালের আইনটির উদ্দেশ্য হল ঃ

১. অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে বাধা দান

২. একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং

৩. একচেটিয়া কারবারমূলক ও প্রতিযোগিতা বিরোধী কারবারী আচরণ নিষিদ্ধকরণ।

এই আইন অনুযায়ী দেশের সামগ্রিক শিল্প ক্ষেত্রটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ঃ

১. সংরক্ষিত ক্ষেত্র (Reserved Sector)

২. মূল ক্ষেত্র (Core Sector বা Heavy Investment Sector)

৩. মূলক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ভারী শিল্প ক্ষেত্র (Non-core Heavy Industries Sector)

৪. মধ্যবর্তী ক্ষেত্র (Middle Sector)

৫. লাইসেন্স বহির্ভূত ক্ষেত্র (Unlicensed Sector)

৬. রপ্তানী ও আমদানী ক্ষেত্র (Export-Import Sector) এবং

৭. যৌথ ক্ষেত্র (Joint Sector)

১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতিতে ক্ষুদ্রশিল্প এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের সংজ্ঞা (মূলধন যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকা) অপরিবর্তিত ছিল।

হাজারী কমিশন (১৯৬৯) বিনা লাইসেন্সে কারখানা স্থাপনের জন্য মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার সুপারিশ করেছিলেন।

৫৮.৩.২ মন্তব্য

১৯৭০ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতিতে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমন বেড়েছিল, অপরদিকে সমগ্র শিল্প বিনিয়োগের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তবে লাইসেন্স মুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে অথবা সরকারের আওতার বাইরের শিল্পগুলির আমদানীর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সুবিধা কীভাবে দেওয়া হবে, এই শিল্প লাইসেন্স নীতিতে তার উল্লেখ করা হয়নি।

৫৮.৪ ১৯৭৩ সালের ভারত সরকারের শিল্প লাইসেন্স নীতি

ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি নূতন শিল্প লাইসেন্স নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু এই নীতিতে এমন কিছুই বলা হয়নি যা সম্পূর্ণভাবে নূতন বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

৫৮.৪.১ উদ্দেশ্য

এই নীতির দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—

১. বৃহৎ শিল্পসংস্থার সম্পত্তির সীমা ৩৫ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২০ কোটি টাকায় নিয়ে আসা এবং

২. যে সব শিল্পে বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি যোগ দিতে পারবে তার তালিকাকে আরও সংহত করা।

৫৮.৪.২ বিষয়

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির অন্তর্ভুক্ত ১৭টি মূল শিল্পের সঙ্গে আরও ১টি শিল্প যোগ হয়েছিল। এই নীতিতে বৃহৎ শিল্পভবন ও বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ঢুকতে দেওয়া হলেও নূতন শিল্পনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে এই নূতন নীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বলা হয়েছিল— যে সব শিল্পের সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি টাকার নীচে, তারা জমি বাড়ি ও যন্ত্রপাতি মিলিয়ে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ব্যাপারে লাইসেন্স গ্রহণ করা থেকে রেহাই পাবে।

এই শিল্প লাইসেন্স নীতিতে সমবায় শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতিতে মিশ্র অর্থনীতি বজায় রেখেও যৌথ উদ্যোগের (Joint Sector) কথা বলা হয়েছিল।

৫৮.৪.৩ মূল্যায়ন

অনেকে এই নীতিকে 'প্রগতিশীল" আখ্যা দিয়েছেন। বৃহৎ শিল্পভবন ও বিদেশি কোম্পানীগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করে এই শিল্পনীতি প্রগতিশীল হবার চেষ্টা করেছে সন্দেহ নেই। রুগ্ন শিল্পগুলি সম্পর্কে সরকারের লাইসেন্স সম্পর্কিত নীতি কী হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এই নীতিতে ছিল না। কিন্তু এই নীতি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

৫৮.৫ পরবর্তী শিল্প লাইসেন্স নীতিসমূহ

৫৮.৫.১ ১৯৭৫ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি

১৯৭৩ সালের পর ১৯৭৫ সালে আবার একটি শিল্প লাইসেন্স নীতি গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের নীতিতে কিছু পরিবর্তন আসে। এখানে ২১টি শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স তুলে নেওয়া হয় এবং আরও ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানী এবং একচেটিয়ামূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ব্যবসায় যথেচ্ছভাবে সম্প্রসারিত করার অনুমতি (license) দেওয়া হয়। তবে বিদেশী কোম্পানীগুলি এই শর্তে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবে যে তাদের যা অতিরিক্ত উৎপাদন হবে, তা বিদেশে রপ্তানী করতে হবে অথবা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাজারে বিক্রয় করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন শক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও যথেষ্ট উদার করা হয়।

এরপর ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮২, ১৯৮৫ সালে শিল্প লাইসেন্স নীতি সংশোধিত হয়।

৫৮.৫.২ ১৯৮৭ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি

১৯৮৭ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি নতুন করে গঠিত হয় এবং এতে কড়াকড়ি কিছু শিথিল করা হয়।

১৯৮৭ সালের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ২৫টি শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স পুরোপুরি বাতিল করা হয়। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত ছিল। প্রথমত সংশ্লিষ্ট সংস্থাটিকে MRTP (Monopolis and Restrictive Trade Practices), FERA (Foreign Exchange Regulation Act) বা পরবর্তীকালে FEMA (Foreign, Exchange Management Act) আইনের আওতার বাইরে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত কোন বড় শহরে এই শিল্প সংস্থাগুলি স্থাপন করা চলবে না।

এই দুটি শর্ত পালিত হলে এই ২৫টি শিল্প সম্পূর্ণভাবে লাইসেন্স মুক্ত হয়ে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৫৮.৫.৩ শিল্প লাইসেন্স নীতিসমূহের সামগ্রিক মূল্যায়ন

শিল্প লাইসেন্স নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হল বাঞ্ছিত পথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে চালানো, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং শিল্পে কেন্দ্রীয়করণ যাতে না হতে পারে সেই চেষ্টা করা। আমাদের দেশে লাইসেন্স নীতি যে ভাবে কার্যকর হচ্ছে তাতে তার উদ্দেশ্যগুলি যে পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছে তা বলা যায় না।

একথা বরং বলা যায় যে, ১৯৭০ সালে শিল্প লাইসেন্স নীতি সংশোধিত হবার পর থেকে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন (Economic Concentration) এবং একচেটিয়া কারবারীদের সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

রুগ্ন শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগ কীভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে শিল্প লাইসেন্স নীতিতে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি।

যৌথ উদ্যোগের সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রেও সরকারের শিল্প লাইসেন্স নীতি এমনভাবে কার্যকর হয়নি যাতে আঞ্চলিক উন্নয়নের বৈষম্য দূর হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, এমনকি সরকারী ক্ষেত্রেও শিল্প প্রকল্পে ক্ষতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে লাইসেন্স প্রদানে অযথা বিলম্ব হেতু (যেমন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল্‌স্ প্রকল্প) প্রকল্পের খরচ অনেক বেড়ে গেছে।

দেশের শিল্পগুলি যাতে বিদেশী শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়, সেজন্য এই নীতিতে বলা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট শিল্প বাবদ বিদেশী কোম্পানীগুলিকে সাধারণত অন্যত্র বিনিয়োগ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলিকে (Multi National Company) যে আনুকূল্য দেখাচ্ছে, তাতে শিল্প লাইসেন্স নীতির এই ধারা বিশেষ কার্যকর হচ্ছে না।

৫৮.৫.৪ ১৯৯১ সালের নয়া শিল্পনীতি ও শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ

বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সের নিদারুণ সংকট এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ধারাবাহিক ঘাটতি— এই দুটি সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৯১ সালের শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় এবং এই নীতিতে গৃহীত অনেক পরিবর্তনের অন্যতম হচ্ছে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ।

১৯৯১ সালের শিল্পনীতিকে স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতির মেরু পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। দেশের নিরাপত্তাও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র, সামাজিক কারণে প্রয়োজনীয়, পরিবেশগত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র, বিপজ্জনক প্রকৃতির দ্রব্য এবং সমাজের উচ্চকোটির ভোগ্যদ্রব্য বাদে আর সমস্ত শিল্পক্ষেত্র থেকে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এখন কেবলমাত্র ১৮টি শিল্পে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক রয়েছে (কয়লা, অ্যালকোহল, পেট্রোলিয়াম, চিনি, সিগারেট, ইলেকট্রনিক্স, মোটর গাড়ি ইত্যাদি।)

১৯৯৩-এর এপ্রিল মাসে আরও ৩টি শিল্প থেকে লাইসেন্স ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই সব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি সম্প্রসারণের জন্য সরকারী অনুমতি নিতে হবে না।

৫৮.৫.৫ মূল্যায়ন

যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে শিল্প লাইসেন্স নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যগুলি যাতে ঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়, তা সুনিশ্চিত করতে পারলে শিল্প লাইসেন্স নীতি দেশের শিল্পোন্নয়নে এবং শিল্পক্ষেত্রে আঞ্চলিক সুষম উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত।

অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকারের (M. S. Thakery) মতে, শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থাটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীগুলির সপক্ষে কাজ করেছে। পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে এবং আমদানি-পরিবর্ত নীতির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ অবহেলিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্প লাইসেন্স নীতির ত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু দেশে অবাধ শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প লাইসেন্স নীতি তুলে দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

৫৮.৬ ভারতীয় বেসরকারী শিল্পে কেন্দ্রীকতা বা কেন্দ্রীভবন (Industrial Cocentration in the Private Sector in India)

৫৮.৬.১ শিল্পে কেন্দ্রীভবন কাকে বলে

শিল্পে কেন্দ্রীভবন বা কেন্দ্রিকতা বলতে বোঝায়—

১. কোনও নির্দিষ্ট শিল্পপণ্য উৎপাদনে একটি বা অল্প কয়েকটি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ বা প্রাধান্য এবং

২. সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে একটি বা কয়েকটি ব্যবসায় গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বা প্রাধান্য।

এই কেন্দ্রীভবন সরকারীও হতে পারে, কারণ আমরা জানি, স্বাধীনতার পর ভারতের শিল্পনীতি একটি বিশাল সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) গড়ে তুলেছে। এখানে আমরা বেসরকারী ক্ষেত্রে (Private Sector) শিল্পে কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে আলোচনা করব।

৫৮.৬.২ শিল্পে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের মাত্রা পরিমাপ ও একচেটিয়া কারবার অনুসন্ধানী কমিশন

ভারতে শিল্পের অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্যে প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবীশের সভাপতিত্বে ১৯৬০ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে এই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে কেন্দ্রীভবনের মাত্রাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

প্রথমত, দ্রব্য উৎপাদনে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত, কয়েকটি ফার্মের অংশ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের চেয়ে বেশী হওয়া। দ্বিতীয়ত, অল্প কয়েকজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কতটা অর্থনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তা নির্ণয় করা।

একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৪ সালে আর একটি কমিশন (Monopoly Enquiry Commission) গঠিত হয়। এই কমিশন শিল্পে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা পরিমাপের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাঁদের মতে, একটি শিল্পপণ্য উৎপাদনে রত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ৩টি প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের ৭৫% বা তার চেয়ে বেশী অংশ উৎপাদন বা নিয়ন্ত্রণ করলে ওই শিল্পে উচ্চমাত্রায় কেন্দ্রীভবন অনুপাত (High Concentration Ratio) রয়েছে মনে করা যেতে পারে।

উৎপাদনের মোট অংশ ৭৫%-এর কম কিন্তু ৬০% এর বেশী হলে ওই শিল্পে মধ্যম মাত্রায় কেন্দ্রীভবন অনুপাত (Medium Concentration Ratio) বর্তমান। আবার ৫০% থেকে ৬০% উৎপাদন সর্ববৃহৎ ৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গেলে সেই শিল্পে নিম্নমাত্রায় কেন্দ্রীভবন অনুপাত (Low Concentration Ratio) বর্তমান।

এই কেন্দ্রীকরণ দু'রকমের হতে পারে— উৎপাদন সংক্রান্ত কেন্দ্রীকরণ ও দেশব্যাপী আন্তঃশিল্প কেন্দ্রীকরণ। প্রথমটি উৎপাদন সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টি হল, বিভিন্ন জিনিসের সরবরাহ, দাম এবং উৎপাদন পদ্ধতি কয়েকটি মুষ্টিমেয় ফার্মের একটি গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

৫৮.৬.৩ একচেটিয়া কারবার ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসার পার্থক্য

মনোপলি কমিশনের মতে, একচেটিয়া ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য হল,

নিজেদের একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের জন্য বড় বড় শিল্প গোষ্ঠী শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশে বাধা দেয়। অন্যায্য ও অত্যন্ত চড়া দামে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে। সুযোগ পেলেই গোপনে পণ্য মজুত করে (Cornering of Commodities) পণ্য করায়ত্তকরণ করে।

খুচরো ব্যবসায়ীরা কী দামে পণ্যগুলি বিক্রয় করবে, তা এরাই ঠিক করে দেয়।

বাজারে যাতে প্রতিযোগিতার দরুন পণ্যের দাম কমে না যায়, সেজন্য এদের নিজেদের মধ্যে চুক্তি হয়। আঞ্চলিক বাজার বিভাজনও চুক্তির মাধ্যমে হয়। এটাই হল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসা (Restrictive Trade Practices)।

৫৮.৬.৪ কমিশনের মতে একচেটিয়া ব্যবসা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ের অগ্রগতির কারণ

আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ করতে পারি—

১. বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচ

২. যৌথমূলধনী কারবারের অগ্রগতি

৩. ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা (যা বর্তমানে বিলুপ্ত)

৪. এক কোম্পানীর টাকা অন্য কোম্পানীর শেয়ারে লগ্নী করা (অর্থাৎ হোল্ডিং কোম্পানী গঠন)

৫. বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানীগুলি কর্তৃক একই গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন লোককে নিজেদের পরিচালকরূপে গ্রহণ

৬. স্বাধীনতার পর দ্রুতবেগে শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ

৭. নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উপকরণের বণ্টন ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলির সুবিধা

৮. লাইসেন্স প্রথা ও পদ্ধতি

৯. পুঁজি সংগ্রহের অনুমতি নেবার ব্যবস্থা

১০. বিদেশী মুদ্রার সংকট দুর করার জন্য আমদানী সংকোচনের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিল্পপতিদের সংরক্ষণের সুবিধা ও সাহায্য দান

১১. দেশী-বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা স্থাপন

১২. ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বড় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণের ব্যাপারে বাড়তি সুবিধা দান

১৩. পেটেন্ট আইন।

এই সব কারণগুলি ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে অর্থাৎ বেসরকারী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

৫৮.৬.৫ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সরকারের ভূমিকা

যে সব কারণে এদেশে একচেটিয়া পুঁজির উৎপত্তি ও দ্রুত বিস্তার ঘটেছে, তা সরকারের বিপরীত নীতি এবং বারংবার প্রগতিশীল ঘোষণা সত্ত্বেও যে ঘটেছে তা নয়। বরং বলা যেতে পারে, ১৯৪৮ সালে অর্থনৈতিক কর্মসূচী কমিটির রিপোর্ট এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে গৃহীত সরকারী নীতিগুলি থেকে ভিন্নতর পদক্ষেপ গ্রহণে উচ্চস্তরের সরকারী সিদ্ধান্তের দ্বারাই তা ঘটেছে। সরকারী উদ্যোগের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রগুলি ধীরে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের জন্য তথা বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীগুলির জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং তা একচেটিয়া পুঁজির বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছে।

এছাড়া, একদিকে সরকার কর্তৃক কার্যকর একচেটিয়া কারবার বিরোধী আইন প্রণয়নে ও প্রয়োগে অক্ষমতা এবং অন্যদিকে একচেটিয়া কারবারী গোষ্ঠীগুলির প্রসারে সহায়তার জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল, আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণও এজন্য সবিশেষ দায়ী।

৫৮.৬.৬ কেন্দ্রীকতার কুফল

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কুফলগুলির মধ্যে কমিশন চড়া দাম, গুণগত মানের অবনতি, এবং ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের প্রতি বিরোধিতা — এই তিনটির উল্লেখ করেছে। তাছাড়া কমিশন মনে করে ক্ষুদ্র শিল্পপতিগণকে শিল্পক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করা হলে দেশে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও বণ্টনের বৈষম্য বাড়বে।

৫৮.৬.৭ কেন্দ্রীকতার সুফল

কমিশনের মতে কেন্দ্রীভবনের অর্থনৈতিক সুফল হচ্ছে—

১. এটা সমাজের পুঁজি গঠন বাড়াতে সাহায্য করেছে ও তার মধ্য দিয়ে দেশে নতুন নতুন শিল্পস্থাপনে সাহায্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

২. বড় বড় কারবারীরা দেশের শিল্পগুলির পক্ষে দরকারী। উচ্চ পর্যায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্মীর যোগান দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩. বড় বড় কারবারীরা দেশে বিদেশী শিল্পপতি ও পুঁজি আকর্ষণ করে তার শরিকানায় দেশে অনেক নতুন শিল্প স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

৫৮.৬.৮ সুপারিশ

কমিশন ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও একচেটিয়ামূলক এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী আচরণ সংকুচিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করে—

১. ৩ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের অনুসন্ধান করার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করা।

২. নির্বাচনী প্রচারের জন্য কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে রাজনীতিবিদদের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করার প্রথা বন্ধ করা।

৩. সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে দুর্নীতি দূর করা

৪. বেসরকারী ক্ষেত্রের একচেটিয়া কারবার দমন বা সংকুচিত করার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে তার প্রতিযোগিতামূলক কারবার স্থাপন করা

৫. অসৎ ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ক্রেতা সমবায় সমিতি (Consumer Cooperative Society) গঠনে উৎসাহ দেওয়া।

৬. বেসরকারী একচেটিয়া কারবার দমনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দেওয়া।

৫৮.৬.৯ একচেটিয়া কারবার এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায় প্রতিরোধ আইনের কয়েকটি দিক

১৯৭০ সালে মনোপলি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে একচেটিয়া এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায় আইন (MRTP Act, 1970) প্রণীত হয়। এই আইনের ভিত্তিতে একটি স্থায়ী ও বিধিবদ্ধ কমিশন গঠিত হয়েছে।

এই আইন অনুযায়ী প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসায়কে (Dominant Firm Practices) একচেটিয়া ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

তাছাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায় হিসাবে ধরা হয়েছে এমন ব্যবসায় প্রবণতা যাতে কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা একাধিক ফার্ম প্রতিযোগিতার পথ এড়িয়ে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেদের করায়ত্ত করতে চায়। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়েছে।

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বড় বড় শিল্পভবনগুলি ছাড়াও কোনও ফার্মকে এই আইন অনুযায়ী তখনই প্রভাবশালী ফার্ম বলে বিবেচনা করা হবে যখন তার নিজস্ব সম্পদ এবং কোটি টাকার কম হবে না এবং যখন সেই ফার্ম ভারতে কোনও দ্রব্যের অন্তত এক তৃতীয়াংশের যোগান দাতা হবে।

এক্ষেত্রে MRTP আইনের একটা ফাঁক আছে। MRTP আইন অনুযায়ী সরকারকে স্থির করতে হবে যে লাইসেন্স বা কোন সুযোগ পাবার জন্যে আবেদনকারী ফার্ম বৃহৎ শিল্পভবন হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা। বড় বড় শিল্পগুলি এই আইনের ফাঁকের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ব্যবসায়ে আলাদা আলাদা ইউনিট তৈরী করেছে যাতে আলাদাভাবে ফার্ম হিসাবে (শিল্পভবন হিসাবে না) তারা সরকারের কাছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারে। MRTP আইনটি ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সালে সংশোধন করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালের এটি সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানী আয় বাড়ানো। এই সংশোধনী অনুযায়ী যে সব কোম্পানীর লাইসেন্সপ্রাপ্ত, তাদের রপ্তানী উৎপাদন বাড়াবার জন্যে অনেক বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল।

১৯৮২ সালের সংশোধনী অনুযায়ী শুধু রপ্তানী আয় বাড়ানোই নয়— উৎপাদন ও উৎপাদনীশক্তি বাড়াবার জন্য বড়বড় প্রভাবশালী ফার্ম ও শিল্পভবনগুলিকে অনেক বিধিনিষেধের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৪-৮৬ সালের বাজেটে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং MRTP কোম্পানীগুলির ক্ষেত্র সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা ২০ কোটি টাকা থেকে এক লাফে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে MRTP আইনের সংশোধন করে ঊর্ধ্বতম সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। উদার অর্থনৈতিক নীতির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সরকার এমন একটি নির্দেশ ঘোষণা করেছেন যাতে MRTP আইনটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ ও একচেটিয়া সংস্থাগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে।

৫৮.৬.১০ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ এবং ভারতে একচেটিয়া মূলধন বৃদ্ধির প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা

ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোন ফার্ম বা শিল্পগোষ্ঠীর একচেটিয়া ক্ষমতার একটি বিকল্প হতে পারে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ব (State Monopolies) অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণ করে বেসরকারী একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে MRTP আইনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ এবং একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রতিরোধ করা, শিল্পোন্নয়নের গতিরোধ করা নয়।

সরকারের অর্থনৈতিক নীতি যেভাবে উদার করা হয়েছে, তাতে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা হয়ত আরও আসতে পারে, অথবা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তাতে একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কমবে না।

৫৮.৭ শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা — কাকে বলে (Industrial Sickness)

আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল কোন কোন শিল্পের রুগ্নতা। এই রুগ্নতা দেখা যায় বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় প্রকার শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রে।

১৯৮৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত রুগ্ন-শিল্প কোম্পানী (বিশেষ বিধান) আইনে [Sick Industrial Companies (Special Provisions)] Act, 1985 বলা হয়েছে—

একটি রুগ্ন শিল্পকে (অন্তত সাত বছরের রেজিস্টার্ড) এইভাবে চিহ্নিত করা যায়—

যে কোন একটি আর্থিক বৎসরের শেষে যা জমে-ওঠা লোকসানের পরিমাণ তার নীট সম্পত্তির মূল্যের সমান অথবা বেশী, এবং যার ওই আর্থিক বছরে এবং ঠিক তার আগের আর্থিক বছরে আর্থিক লোকসানও হয়েছে।

কোন শিল্পের নীট সম্পত্তি (বৃহদায়তন শিল্প) = ১. নীট সম্পত্তি = মোট দায়িত্ব (Liabilities) – (চলতি দায়িত্ব + দীর্ঘকালীন ঋণ)

২. মোট দায়িত্ব (Liabilities) = চলতি দায়িত্ব + স্থগিত (deferred) দায়িত্ব + শেয়ার (Equity)

৩. চলতি দায়িত্ব = মজুরী + স্বল্পকালীন ঋণ + দেয় কর ইত্যাদি (Payable Tax etc.)

৪. দীর্ঘকালীন ঋণ = স্থগিত দায়িত্ব (Deferred Liabilities) অর্থাৎ স্থগিত দায়িত্ব হচ্ছে সেই ধরনের দায়িত্ব বা Liabilities যা বর্তমানে এড়িয়ে গেলেও দীর্ঘকালে বহন করতেই হয়, যেমন— দীর্ঘকালীন ঋণ, ডিবেঞ্চার, আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে প্রাপ্ত ঋণ প্রভৃতি)

৫. Equity = প্রদত্ত মূলধন (Paid up Capital) + স্থগিত আয় [(Retained Earnings (Reserves)]।

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে রুগ্নতার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে।

যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থা (ক) আগের হিসাব বছরে নগদ টাকা লোকসান দিয়েছে এবং চলতি-হিসাব বছরে সম্ভবত লোকসান দেবে এবং যার জমে ওঠা নগদ লোকসানের পরিমাণ বিগত পাঁচ বছরে তার সর্বোচ্চ নীট সম্পত্তির ৫০% এর সমান বা তার বেশী অথবা (খ) যে সংস্থা পর পর চার কিস্তি সুদ শোধ দিতে পারেনি, অথবা মেয়াদী ঋণের আসল পরিশোধের দুটি ৬ মাসের কিস্তি শোধ করতে পারেনি এবং ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের সীমা নিয়ে অনিয়মিত লেনদেন দূর হচ্ছে না।

অতি ক্ষুদ্র (Tiny) অথবা বিকেন্দ্রিত শিল্প ক্ষেত্রে অবস্থিত শিল্প সংস্থার বেলায় উপরোক্ত (ক) অথবা (খ) এর যে কোন একটি অবস্থা দেখা দিলে তাকে রুগ্ন সংস্থা বলে গণ্য করা হবে।

৫৮.৭.১ রুগ্ন শিল্প — সংজ্ঞার পরিবর্তন

১৯৮৯ সালের জুনে রুগ্ন-শিল্প ইউনিট সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করা হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট রুগ্ন বলে বিবেচিত হবে যদি কোন হিসাব বছরের শেষে সঞ্চিত ক্ষতির পরিমাণ সেই কোম্পানীর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ নীট সম্পদের ৫০ শতাংশ অথবা তার বেশী হয়। বৃহৎ শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রেও বছরের পর বছর লোকসান হতে থাকাকে রুগ্নতার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

১৯৮৮ সালের জুন মাসের শেষে পূর্ববর্তী সংজ্ঞা অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে রুগ্ন ইউনিটের সংখ্যা ছিল ১১৭২ এবং তাদের ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৪৪টি শিল্প ইউনিটকে আর্থিক ক্ষেত্রে লাভজনক করা যায় কিনা সে বিষয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল— তার মধ্যে ৩৫০টি শিল্পকে লাভজনক করা যেতে পারে বলে বিবেচনা করা হয় এবং তার মধ্যে ২৩৪টি ইউনিটকে একটি বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছিল।

১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট রুগ্ন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২,২৪,০১২টি এবং তার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ইউনিট ছিল ২,২১,৪৩৬টি।

ক্ষুদ্র শিল্পের বাইরে রুগ্ন ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২৪৭৬টি এবং তার মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে, সরকারী ক্ষেত্রে এবং সমবায় ক্ষেত্রের রুগ্ন ইউনিট ছিল যথাক্রমে ২০০২টি, ২৯১টি এবং ১৮৩টি ইউনিট।

৫৮.৭.২ শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ড

রুগ্ন শিল্প কোম্পানী আইন ১৯৮৫ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ১৯৮৭ সালের মে মাসে শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ড (Board for Industrial and Financial Reconstruction, BIFR) গঠিত হয়। ১৯৯৯

সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই বোর্ড ৪০০১টি শিল্প ইউনিটের কাগজপত্র গ্রহণ করে। এর মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির সরকারী উদ্যোগও আছে।

বোর্ড কর্তৃক ৬১৮টি শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠনের আপীল কর্তৃপক্ষ (Appellate Authority of Industrial and Financial Reconstruction Board) কর্তৃক ২৮টি শিল্প ইউনিটকে পুনর্বাসনের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া ২২৩ ইউনিটকে আর রুগ্ন নয় বলে ঘোষণা করা হয়। বোর্ড ৬৫৮টি রুগ্ন শিল্প ইউনিটের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার জন্য সুপারিশ প্রদান করে।

৫৮.৭.৩ শিল্প রুগ্নতা — সমস্যার বিভিন্ন দিক

শিল্প-রুগ্নতার বিভিন্ন দিক (Different Dimensions of Industrial Sickness) সময়ের হিসাবে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়।

প্রথমটি ষাট-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

১. শিল্পে রুগ্নতার ব্যাধি ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু। এটা সত্তরের দশকে প্রকট হয়ে ওঠে এবং আশির দশকে গুরুতর আকার ধারণ করে।

(ক) দেশে প্রধান প্রধান সমস্ত শিল্পে রুগ্ন শিল্প সংস্থা দেখা দিয়েছে।

শিল্প-রুগ্নতার প্রকোপ বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন ও লৌহ-ইস্পাত শিল্পেই বেশি।

(খ) ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই শিল্প-রুগ্নতা ছড়িয়ে পড়েছে।

(গ) অ-ক্ষুদ্র রুগ্ন সংস্থাগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানত মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও রাজস্থানে।

২. অনাদায়ী ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণের দিক থেকে বলা যায়—

(ক) রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা সর্বাধিক হলেও (মোট রুগ্ন শিল্প সংস্থার প্রায় ৯৯%) এদের মধ্যে অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ সর্বাপক্ষো কম।

(খ) তুলনায় অ-ক্ষুদ্র অর্থাৎ বৃহদায়তন রুগ্ন শিল্প-সংস্থার সংখ্যা অনেক কম হলেও এদের অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ হল মোট ঋণের প্রায় ৪৭.৪%।

রুগ্ন শিল্পের দ্বিতীয় আলোচনাকাল হচ্ছে আশির দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

এসময়ের মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রুগ্ন সংস্থার সংখ্যা এবং অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ— এ দুইই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫৮.৭.৪ শিল্প রুগ্নতার লক্ষণ

শিল্প-রুগ্নতার যে প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখা যায়, (Symptoms of Industrial Sickness), এবার আমরা সেগুলি আলোচনা করব।

১. উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ে অক্ষমতার ফলে কাঁচামাল অর্থপ্রস্তুত দ্রব্য এবং সম্পূর্ণ তৈরী দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মজুত ভাণ্ডার (Inventories)।

২. স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধ ও বিধিবদ্ধ দায় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের অভাবে কোন শিল্প সংস্থা যখন খরিদ করা কাঁচামালের দাম দিতে পারে না, শ্রমিক-কর্মীদের মজুরী ও বেতন দিতে দেরী করে, স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের Provident Fund-এ নিজের দেয় চাঁদা, উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর প্রভৃতি সরকারের কাছে জমা দিতে অপারগ হয়।

৩. এই ধরনের সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-জাত-আয় (Return on Investment) থেকে মুনাফার হার বাজার চলতি সুদের হারের তুলনায় কম হয়ে থাকে।

৪. মেয়াদী ঋণের সুদ প্রদানে বা কিস্তি শোধে অক্ষমতাও শিল্প সংস্থার রুগ্নতার অন্যতম লক্ষণ।

৫. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে শিল্প সংস্থার চলতি বিত্ত-সম্পত্তি ও চলতি দেনার (Ratio of Current Assets to Current Liabilities) অনুপাত যদি সমান সমান না হয়ে তার কম হয় (Less than 1 : 1), তাহলে সংস্থাটিকে রুগ্ন বলে গণ্য করতে হবে। ওই অবস্থায় সংস্থাটির নগদ অর্থের লোকসান হবে এবং তারল্য (Liquidity) কমতে থাকবে। তেমনি সংস্থাটির মোট দায় ও নীট সম্পত্তির মূল্যের অনুপাত (Ratio of Total Liabilities to Net Worth of Debt Equity Ratio) যদি কমতে থাকে, তাহলেও সংস্থাটি ব্যাধিগ্রস্ত বলে বুঝতে হবে।

৬. কোন সংস্থাকে অন্তত সেই পরিমাণ উৎপাদনও বিক্রয় করতে হয় যাতে তার স্থির ও পরিবর্তনীয় খরচ ওঠে, গড় খরচ দামের সমান হয়,— এই অবস্থাকে শিল্প সংস্থার আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু (Break-even Point) বলা হয়। উৎপাদন ও বিক্রয় হার কম হলে গড় ব্যয় দামের বেশী হয়। এতে শিল্প সংস্থাটির উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটা অব্যবহৃত থাকে (Unutilised Capacity)। এটি শিল্প-রুগ্নতার একটি গুরুতর লক্ষণ।

৫৮.৭.৫ শিল্প-রুগ্নতার কারণ ঃ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ

শিল্প-রুগ্নতার কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— বাহ্যিক কারণ (External Causes) এবং অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal Causes)। বাহ্যিক কারণগুলির উৎপত্তি ঘটে শিল্প-সংস্থার বাইরে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পণ্যের উৎপাদন, দাম ও বিক্রয় সম্পর্কে এবং কাঁচামালের যোগান ও ঋণ প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী নীতি, পরিবহন, বিদ্যুতের যোগান, বাজারের চাহিদার অবস্থা প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির উপরে সংস্থার কোনও প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ নেই।

উপরের এই বাহ্যিক কারণগুলি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রে সাধারণভাবে উৎপাদন কম হয়েছিল। এর ফলে যে মন্দাভাব এসেছিল, তার প্রভাবে বহু শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পগুলির মধ্যে অনেকেরই মন্দার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মতন ক্ষমতা ছিল না। এই মন্দার কারণে অনেক শিল্পই রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এর কারণগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চাহিদাজনিত বাধা (Demand Constraint), শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহজনিত বাধা (Raw material constraint), উপযুক্ত সরকারী বিনিয়োগের অভাব (lack of adequate public investment), বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত বাধা (Power Constraint), পরিবহনজনিত অসুবিধা (Transport Constraint) এবং শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতিজনিত অসুবিধা (Industrial relations constraint) প্রভৃতিই প্রধান।

এ ছাড়া পরপর তিন বছর পরিকল্পনা ছুটি (Plan Holidays) এই শিল্প-রুগ্নতার সংকটকে তীব্র করে তোলে। তার সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যস্তরের বৃদ্ধি: "স্ট্যাগফ্লেশন" ও "নিশ্চলতার নীতি" এই শিল্প-রুগ্নতার সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

অপরদিকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের 'নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ" নীতি অনুসরণ করার ফলে ক্ষুদ্র ও রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির অস্তিত্ব আরও বিপন্ন করে তুলেছে।

ভারতের অর্থনীতিতে প্রয়োজনের নামে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের যে আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল গড়ে তোলা হয়েছে, তা রাজনৈতিক প্রভাবহীন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির রুগ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমদানী, রপ্তানী, শিল্প-লাইসেন্স, শুল্ক, কর ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী নিয়মগুলি লাভজনক শিল্পগুলিকে রুগ্ন করে ফেলেছে।

অভ্যন্তরীণ কারণগুলির উৎপত্তি ঘটে সংস্থার অভ্যন্তরে যেমন, ব্যবস্থাপনার অভাব, অদক্ষতা, অপচয়, পরিচালন কর্তৃপক্ষের ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল নীতি, শ্রমিক বিবাদ ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সংস্থার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার সাধ্য।

অভ্যন্তরীণ কারণগুলির মধ্যে শিল্প ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি, ব্যয়াধিক্য, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার অভাব ও ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ, অতিরিক্ত স্থির খরচ, যন্ত্রপাতির অপচয় পূরণকারী (Depreciation) ব্যবস্থার অভাব এবং উৎপাদিত সামগ্রীগুলির ভবিষ্যত চাহিদা সম্পর্কে ভুল হিসাব কষা ইত্যাদি শিল্প-ইউনিটগুলি কাজকর্মে ক্রমাগত ক্ষতি হবার জন্য দায়ী বলা যায়।

৫৮.৭.৬ শিল্প রুগ্নতার ফলাফল

শিল্প-রুগ্নতার ফলাফল ভারতের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মারাত্মক হয়ে ওঠে।

১. একটি শিল্প-সংস্থা রুগ্ন ও বন্ধ হয়ে গেলে কেবল অব্যবহৃত ও সীমিত সম্পদের অপচয় হয় যে তা নয়। সংস্থাটিতে বিনিয়োজিত (Already invested) সঞ্চয় ও পুঁজি ও অব্যবহৃত-যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, সবই নষ্ট হয়। এই ক্ষতি ভারতের মত গরীব দেশের পক্ষে অপূরণীয়।

২. শিল্প-সংস্থা রুগ্ন হলে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আশঙ্কা ও হতাশা দেখা দেয়। সংস্থাটি কোম্পানীরূপে গঠিত হলে এবং এটি আকারে বড় হলে বাজারে তার শেয়ারের দাম দারুণ কমে যায়।

৩. এক বা একাধিক শিল্পে নিযুক্ত ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মাঝারি— সব রকম শিল্প-সংস্থার মধ্যে একটি সংযোগ সৃষ্টি হয়। এ রকম পরস্পর সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে যে কোন একটি সংস্থা রুগ্ন হয়ে পড়লে, দেনা-পাওনা সূত্রে, কিংবা খরিদ্দার-যোগানদার সূত্রে অথবা ঋণদাতা-খাতক কিংবা মালিক ও অধীন সংস্থা সূত্রে শিল্প রুগ্নতা ক্রমে ক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. শিল্প-সংস্থাগুলির রুগ্নতা বেকার সমস্যাকে আরও তীব্র করে তোলে।

৫. শিল্প-সংস্থা রুগ্ন হলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ে। ঋণ অনাদায়ী হলে ঋণদাতা সংস্থাগুলির লোকসানই শুধু হয় না, অন্যান্য শিল্প সংস্থাগুলিকে তাদের ঋণ দেবার সামর্থ্যও কমে যায়।

৬. কর-রাজস্ব, শুল্ক, চুঙ্গি, সারচার্জ ইত্যাদি বাবদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং পৌরসভাগুলির যে রাজস্ব আদায় হয়, শিল্প-রুগ্নতায় আক্রান্ত শিল্পগুলির কাজ থেকে সেই রাজস্ব আদায় হয় না। সুতরাং শিল্প রুগ্নতার ফলে সরকারের রাজস্বেরও ক্ষতি হয়।

৫৮.৭.৭ শিল্প রুগ্নতার সম্ভাব্য প্রতিকার (Remedial Measures)

শিল্প-রুগ্নতার সমস্যার প্রতিকারে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়ে ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে একটি সরকারী নির্দেশিকার মারফত সরকারী নীতি প্রকাশিত হয়। নির্দেশিকাটি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও আর্থিক সংস্থাগুলির পক্ষে অবশ্য পালনীয়। নীতি-নির্দেশিকাটির মুখ্য নির্দেশগুলি নীচে দেওয়া হল—

১. নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সরকারের মন্ত্রীদপ্তরগুলিকে দেওয়া হয়েছে। শিল্প-রুগ্নতা সম্পর্কে নজর রাখা, এবং পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তারা স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠন করতে পারবে।

২. শিল্প-রুগ্নতার ক্ষেত্রে সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আর্থিক সংস্থাগুলি নজরদারী ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করবে। রুগ্ন সংস্থাটির কাছে তাদের অনাদায়ী পাওনার সম্পর্কে তারা সাধারণ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. প্রয়োজন বোধে সরকার রুগ্ন সংস্থাটির অধিগ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪. বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন—উৎপাদনী শক্তির সদ্ব্যবহার করা, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সহজলভ্য করা, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৫৮.৭.৮ গৃহীত ব্যবস্থা

রুগ্ন-শিল্প-সংস্থার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের মত প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করে পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধা দিয়েও ভারত সরকার রুগ্ন-সংস্থা পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করেছে।

১. যে সব সুস্থ শিল্প-সংস্থা রুগ্ন শিল্প-সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজের সঙ্গে একীভূত করবে, তাদের আয়কর আইনে (১৯৭৭ সালের সংশোধিত আয়কর আইনের ৭২-এ ধারায়) বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

২. ১৯৮২ সালের জানুয়ারী থেকে ক্ষুদ্র, রুগ্ন সংস্থাগুলি যাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারে, সেজন্য তাদের "মার্জিন-মানি"র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের চেষ্টার পরিপূরক হিসাবে একটি "উদারীকৃত মার্জিন-মানি"র ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় পুনর্বাসনের জন্য রুগ্ন সংস্থাকে রাজ্য সরকার যতটা পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেবে, কেন্দ্রও সমপরিমাণে সাহায্য দেবে (৫০ : ৫০)।

৩. শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (Industrial Reconstruction Bank of India or IRBI) : ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার IRCI (Industrial Reconstruction Corporation of India) নামে কোম্পানী আইনে গঠিত একটি সংস্থা স্থাপন করে। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে সরকার IRBI গঠন করে। IRBI স্থাপিত হয়ে IRCI কে অধিগ্রহণ করে ও IRBI-এর সঙ্গে একীভূত হয়। IRBI রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির প্রধান সর্বভারতীয় ঋণ ও পুনর্গঠন সংস্থারূপে কাজ করছে। IRBI এই ধরনের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসনে নিযুক্ত অন্যান্য সংস্থাগুলির অনুরূপ কাজকর্মের সংযোজকের ভূমিকা পালন করছে।

৪. শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য বোর্ড (Board of Industrial and Financial Reconstruction or BIFR) : ১৯৮৫ সালের দুর্বল শিল্প কোম্পানী আইন (বিশেষ ব্যবস্থা) [Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act.] অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৮৭ সালের জানুয়ারীতে BIFR স্থাপন করে। সংস্থাটি ঐ সময় থেকেই কাজ শুরু করে। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হল—

(ক) কোম্পানীরূপে গঠিত রুগ্ন শিল্প সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক, ত্রাণমূলক, প্রতিকারমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি নির্ধারণ করা এবং স্থিরীকৃত ব্যবস্থাগুলি দ্রুত বলবৎ করা।

(খ) যে সব শিল্পের নীট সম্পত্তির মূল্য (Net Worth) সম্পূর্ণ ক্ষয় পেয়েছে এবং যাদের নীট সম্পত্তির মূল্যের ৫০% বা তার বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তারা BIFR-এর কাছে গেলে, ঐ সংস্থা তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ দেবে।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে আইনের সংশোধন করে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকেও BIFR-এর অধীনে আনা হয়েছে। BIFR-এর সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক। FERA আইনও Urban Land Ceiling আইন ছাড়া BIFR-এর রায় অন্যান্য সমস্ত আইনের ঊর্ধে রাখা হয়।

৫। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা—

(ক) কার্যকর পুঁজির অভাব দূর করার জন্যে ঋণদান।

(খ) কম সুদের হারে ঋণ পরিশোধ আদায় করা।

(গ) একটি সুবিধামত সময়ের জন্য সুদ আদায় স্থগিত রাখা (Moratorium) এবং

(ঘ) হিসাবের পাওনার একটি অংশ আদায় স্থগিত রাখা।

উপরের চারটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কও কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে।

(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থাপিত "রুগ্ন শিল্প সংস্থা সেল" (Cell) রুগ্ন সংস্থাগুলি সম্পর্কে তথ্য বিনিময় কেন্দ্ররূপে কাজ করা এবং সরকার, অন্যান্য ব্যাঙ্ক, ঋণতাদা সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে সংযোজন সংস্থারূপে কাজ করা।

(খ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং অপারেশন ও ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের সমস্ত আঞ্চলিক অফিসে রাজ্যস্তরে আন্তঃসংস্থা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সংযোজনের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(গ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও মেয়াদী ঋণদাতা সংস্থাগুলির কাজের সংযোজনার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্ট্যান্ডিং কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছে।

(ঘ) ভারতের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে (IDBI) একটি বিশেষ সেল স্থাপন করা হয়েছে। তার কাজ হল রুগ্ন সংস্থার কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলির অনুরোধে অনুসন্ধান করা এবং

(ঙ) ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রের রুগ্ন সংস্থাগুলির জন্য একটি নির্দেশিকা (Guideline) প্রচার করেছে।

(চ) শিল্পক্ষেত্রে বিদায় নীতি (Exit Policy in the Industrial Sector) : বহুদিন থেকেই শিল্পক্ষেত্রে যে রুগ্নতা (Industrial Sickness) দেখা যাচ্ছে, সেটা শুধু বেসরকারী ক্ষেত্রেই নয়, সরকারী ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারত সরকার কর্তৃক ৫৫টি উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রুগ্ন বলে চিহ্নিত হয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে বিদায় নীতি রুগ্ন শিল্পের সমস্যা দূর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ব্যবস্থা। তাই আমরা পৃথকভাবে 'শিল্পক্ষেত্রে বিদায় নীতি' আলোচনা করব।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের (World Bank) কাছ থেকে ঋণ ও সাহায্য নিয়ে ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার চলছে, তার প্রধান অঙ্গ হল কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের (Structural Adjustment) কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য হল অতিরিক্ত সরকারী ব্যয় (বিশেষ করে ঘাটতি ব্যয়) কমিয়ে বাজেটে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, ভরতুকি তুলে দিয়ে অনুৎপাদনমূলক ব্যয় বন্ধ করা এবং লোকসানের ভারে রুগ্ন হয়ে থাকা জাতীয় শিল্পোদ্যোগ তুলে দেওয়া।

রুগ্ন শিল্পোদ্যোগ যদি লাভজনক সংস্থায় পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং কর্মহীন শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায়ের (Golden Handshake) আগেই বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিয়ে দিতে হবে।

এই বিদায় নীতি কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিষদ (International Development Association) থেকে ঋণ নিয়ে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০০ কোটি টাকা দিয়ে একটি জাতীয় পুণর্নবীকরণ তহবিল (National Renewable Fund) গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই তহবিলের পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

সরকার দ্বারা গঠিত জাতীয় পুণর্নবীকরণ তহবিল শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অসময়ে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করবে। ভারত সরকারের একটি যুক্তি অবশ্যই বিবেচ্য তাহল, চিররুগ্ন সংস্থাগুলি সহ সরকারী ক্ষেত্রকে রাজস্ব খাতে প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়। এটা দিতে না হলে সরকারের বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব এবং বিকল্প উন্নয়নমূলক খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা সম্ভব।

১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির রুগ্নতার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে— কারিগরী অনগ্রসরতা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, ব্যয় বাহুল্য, উৎপাদনে অপ্রতুলতা এবং উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহারে অক্ষমতা, পরিচালন ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি। প্রত্যেকটি রুগ্ন শিল্পকে যাতে তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে BIFR-র কাছে পাঠানো যায়, সেজন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে।

কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা সরকারী ক্ষেত্রের চেয়ে বেসরকারী ক্ষেত্রে আরও বেশি। কাজেই সরকারী সংস্থার বেসরকারীকরণ করে শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতার প্রতিবিধান করা যাবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। সরকারী নীতি হল লাভজনক শিল্পগুলির ২০ শতাংশ শেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হবে, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ শেয়ার বেসরকারী ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সরকারী যুক্তি হল, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে গেলে অলাভজনক সংস্থাগুলিকে গুটিয়ে আনতেই হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগীদের সুযোগ দিতে হবে যাতে লাভজনক প্রথায় নিজেদের মূলধন তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

কিন্তু যে জিনিসটা সরকারের দিক থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়নি তা হল, কেন সরকারী উদ্যোগগুলি লাভ করতে পারছে না, কেন তার কারণগুলি খুঁজে বার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

৫৮.৮ শিল্পক্ষেত্রে অর্থসংস্থান

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রধান প্রয়োজন হল উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন। প্রকৃতপক্ষে মূলধন গঠনের (Capital Formation) অসুবিধাই আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

৫৮.৮.১ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের পুঁজি

শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ এই তিন উদ্দেশ্যেই পুঁজির প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন।

যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি কেনার জন্য যে পুঁজির দরকার, তাকে স্থির পুঁজি (Fixed Capital) বা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন (Long-term Capital) বল হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা যত বেশী পুঁজিনির্ভর বা পুঁজিপ্রধান (Capital Intensive) হয়, তত বেশী পরিমাণে স্থির পুঁজির প্রয়োজন হয়।

শ্রমের মজুরী, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি ব্যয়ের জন্য যে পুঁজি দরকার তাকে চলতি পুঁজি বা কার্যকরী মূলধন (Working or Circulatng Capital) বলা হয়। চলতি পুঁজি একবারে বেশী দিনের জন্য নিযুক্ত করা যায় না। উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে এই মূলধন ফেরৎ পাওয়া যায়। এ জন্য এই মূলধনকে বলা হয় স্বল্পমেয়াদী মূলধন।

দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী মূলধনের মাঝামাঝি আর এক ধরনের মূলধন আছে— যাকে মাঝারি মেয়াদের পুঁজি বলে। স্বল্পমেয়াদী মূলধন সাধারণত এক বৎসরের জন্য হয়। দীর্ঘমেয়াদী মূলধন পাঁচ বৎসর বা তার বেশী সময়ের জন্য হয়। মাঝারিমেয়াদী মূলধনের মেয়াদ সাধারণত এক বৎসরের বেশী ও অনধিক পাঁচ বৎসর।

৫৮.৮.২ ভারতের শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় মূলধনের উৎস

আমাদের দেশে শিল্প অনুযায়ী নির্দিষ্ট এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তায় বিভিন্নতা দেখা গেলেও শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য নিম্নলিখিত উৎসগুলিই প্রধান।

ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই তিন ধরনের স্থির ও চলতি পুঁজির অর্থসংস্থানের উৎসগুলিকে অভ্যন্তরীণ (Internal) ও বাহ্যিক (External)- এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

বৃহৎ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি হল — শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা আদায়ীকৃত পুঁজি, কোম্পানীর সঞ্চয় তহবিল এবং উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফা। বাহ্যিক উৎসগুলি হল— ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ, জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত আমানত, ব্যাঙ্ক ও শিল্প ঋণদানকারী সংস্থা থেকে সংগৃহীত ঋণ।

৫৮.৮.৩ দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাসমূহ

শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের অভাব দূর করার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতে একের পর এক অনেকগুলি দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নীচে এই ধরনের কয়েকটি সংস্থার নাম দেওয়া হল—

১. ভারতের শিল্প ঋণ সরবরাহ সংস্থা (১৯৪৮)

২. জাতীয় শিল্পোন্নয়ন নিগম (১৯৫৪)

৩. ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ নিগম (১৯৫৫)

৪. ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (১৯৬৪)

৫. ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইন্ডিয়া (১৯৬৪)

৬. পূর্বতন ভারতের শিল্পপুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (১৯৭১) এবং বর্তমান শিল্পবিনিয়োগ ব্যাঙ্ক (১৯৯৭)

৭. ভারতের রপ্তানী আমদানী ব্যাঙ্ক (১৯৮২)

৮. জীবনবীমা নিগম (১৯৫৬) এবং অন্যান্য সাধারণ বীমা নিগম.

৯. পর্যটন শিল্প অর্থসংস্থান নিগম (১৯৮৮)

১০. আবাসন অর্থসংস্থান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

১১. পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থসংস্থান কোম্পানী ইত্যাদি

৫৮.৮.৪ বৃহদায়তন শিল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থাগুলির পৃথক আলোচনা

ভারতের বিভিন্ন ধরনের শিল্পে অর্থ-সংস্থানের উদ্দেশ্যে অনেক সংস্থা গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই এ ধরনের আর্থিক সংস্থা গঠনের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমরা এখন সেই সব আর্থিক সংস্থাগুলির পৃথক আলোচনা করব। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে ঋণপ্রদানের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রথম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক হিসাবে ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়েছিল **ভারতের শিল্প ঋণ সরবরাহ সংস্থা** (Industrial Finance Corporation of India বা IFCI)। IFCI একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Corporation) হিসাবে ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি নিয়ে স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সালে এটি শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (Industrial Development Bank) অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯৯২ সালের অক্টোবর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বিধিবদ্ধ (Statutory) প্রতিষ্ঠান থেকে একটি কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং সমবায় সমিতিগুলিকে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করা।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন নিগম (National Industrial Development Corporation Limited বা NIDC) ১৯৫৪ সালে এটি একটি লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে স্থাপিত হয়।

NIDC-র প্রধান কাজ হল—

১. নতুন ধরনের শিল্পস্থাপনের অথবা নতুন কোন দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে তার কর্মসূচী রচনা ও তা কাজে পরিণত করা।

২. শিল্পগুলিকে কারিগরী ও কৌশলগত পরামর্শ দেওয়া।

৩. শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ঋণ দেওয়া।

৪. পরিকল্পিত উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে অর্থপ্রদান করা।

৫. বিভিন্ন শিল্প পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা এবং

৬. রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা বিদেশের কোন সংস্থা দ্বারা NIDC-র সাহায্য গ্রহণ করা।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের সমর্থনে, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অংশীদারীতে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ নিগম (Industrial Credit and Investment Corporation of India বা ICICI) স্থাপিত হয়েছে।

এর উদ্দেশ্য ও কাজ হল—

১. শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশগ্রহণে উৎসাহদান।

২. শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ ও তাদের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ঋণ দান এবং

৩. শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা ও পুঁজির বাজারের Capital Market) সম্প্রসারণ করা।

অধিক পরিমাণে ঝুঁকি মূলধন (Equity Capital) ও মেয়াদী ঋণ (Term Loan) দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India বা IDBI) স্থাপিত হয়। প্রথমে এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থারূপে কাজ করলেও ১৯৭৫ সালে একটি আইনের দ্বারা IDBI কে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত করা হয়। IDBI প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ দিয়ে থাকে। এর কাজ হল—

১. শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী সংস্থা (Coordinating Agency) ও শীর্ষ সংস্থারূপে (Apex Agency) কাজ করা,

২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ব্যাপারে পুণঃঋণ সরবরাহের (A Refinancing Device) অন্যতম উপায় হিসাবে কাজ করা,

৩. বুনিয়াদী শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করা এবং

৪. রপ্তানী বিলগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে পুনর্বাট্টা দেওয়া।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইন্ডিয়া (Unit Trust of India) ১৯৬৪ সালে একটি সরকারী সংস্থারূপে স্থাপিত হয়। এর কাজ হল—

১. দেশের স্বল্প ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করা ও তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা,

২. শিল্পক্ষেত্রে এই সঞ্চয়কে লাভজনকভাবে ঝুঁকিসহ বিনিয়োগের খাতে প্রবাহিত করা এবং

৩. ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশে শিল্পপুঁজির ভিত ও পুঁজির বাজার শক্তিশালী করা।

১৯৭১ সালে IDBI এর উদ্যোগে স্থাপিত পূর্বতন শিল্প পুনর্গঠন নিগমকে (Industrial Reconstruction Bank of India) ১৯৯৭ সালে শিল্প বিনিয়োগ ব্যাঙ্কে (Industrial Investment Bank) রূপান্তরিত করা হয়।

বর্তমান শিল্প বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের কাজ হল—

১. শিল্প ইউনিটগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

২. বিদেশী মুদ্রায় ঋণ সরবরাহ করা।

৩. শিল্প ইউনিটগুলির ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নেওয়া এবং শিল্পোন্নয়নের হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

৪. ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণপ্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে রুগ্ন ইউনিটগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

১৯৮২ সালে ভারতের রপ্তানী আমদানী ব্যাঙ্ক (Export Import Bank of India) স্থাপিত হয়। এর কাজ হল—

১. আমদানী ও রপ্তনীর কাজে নিযুক্ত সব অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং এর মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রধান অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গ্রহণ করা।

২. এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ অর্থের পুনঃসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং

৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান সংক্রান্ত যে কাজ IDBI এতকাল করে এসেছে, সেসব কাজ এই EXIM ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা। এছাড়া জীবনবীমা নিগম (Life Insurance Corporation) স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া। এছাড়া সাধারণ বীমা নিগম (General Insurance Corporation) স্থাপিত হয়েছে একই উদ্দেশ্যে।

৫৮.৮.৫ বৃহৎ শিল্পে ঋণদানকারী সংস্থাগুলির কাজের মূল্যায়ন

শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদনাকারী সংস্থাগুলিকে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বলে গণ্য করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের সূত্রপাত হয় এবং শিল্পের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নানা ধরনের অর্থসংস্থানকারী বা ঋণদাতা সংস্থা অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়ে দেশে এখন অর্থসংস্থানকারী অন্তর্কাঠামোটি (Financial infra-structure) আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বেড়ে উঠেছে। বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, ভবিষ্যতে বৃহৎ শিল্পের অর্থসংস্থানে এরা আরও উদ্যোগী হবে।

৫৮.৮.৬ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ঋণদানকারী বিভিন্ন সংস্থা

আধুনিক ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি স্টেট ফিন্যান্স করপোরেশন এবং স্টেট এইড টু ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ পেয়ে থাকে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির নাম নীচে দেওয়া হল—

১. রাজ্য অর্থ নিগম সমূহ (State Finance Corporations of India)

২. ভারতের ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক।

৩. রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম (State Industries Development Corporation বা SIDC)।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank)।

৫. শিল্পে রাজ্য সরকারের সাহায্য (State Aid to Small Industries)।

৬. ঋণ জামিনদার নিগম (Credit Guarantee Corporation)।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়ন করা যদিও রাজ্য সরকারের কাজ, তবুও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

১৯৫৪ সালে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য অর্থনিগম (State Finance Corporation) স্থাপিত হয়। IFCI-এর কাছ থেকে ঋণ পায় না, এ রকম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে রাজ্য অর্থ নিগম (SFC) মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করে।

১. এই SFC গুলি সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির জামিন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করে অনধিক ২০ বছরের মেয়াদে প্রত্যক্ষ ঋণ দেয়।

২. অন্য সূত্র থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত অনধিক ২০ বছরের মেয়াদে ঋণের গ্যারান্টি দেয়।

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করে।

৪. ১০ লক্ষ টাকা অথবা এই প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ— যেটি কম, সেটিই কোন শিল্পকে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদান করার সর্বোচ্চ পরিমাণ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

৫. SFC জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে, তবে আমদানীকৃত মূলধনের অধিক আমানত গ্রহণ করা চলবে না।

৬. শিল্প ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে শুধু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং সমবায় সমিতিগুলিকে। কিন্তু SFC প্রাইভেট কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, এবং একচেটিয়া কারবারেও ঋণ প্রদান করতে পারে।

১৯৫৫ সালে স্রফ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (National Small Industries Corporation Limited বা NSIC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ হল—

১. সরকারী অর্ডার পাওয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত পরিমাণে কারিগরী সাহায্য ও অর্থ প্রদান করা,

২. বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতির সহায়ক সামগ্রী যাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি উৎপাদন করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা,

৩. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির নেওয়া ঋণের অগ্র-প্রতিশ্রুতি (Underwriting) অথবা প্রতিশ্রুতি (Guarantee) প্রদান করা,

৪. বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্রশিল্পের সুবিধার জন্য সচল (Mobile) মেরামতী কারখানা, সচল প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা,

৫. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দী মূল্য প্রদানের (Instalment Purchase) ব্যবস্থা করা এবং

৬. প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করা এবং এই শিল্পের ঋণের গ্যারান্টি দেওয়া।

১৯৮৯ সালে, IDBI এর সহযোগী হিসাবে ভারতের ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Small Industries Development Bank of India বা SIDBI) স্থাপিত হয়। এর কাজ হল—

১. বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন নিগমগুলিকে সাহায্য করা,

২. ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দেওয়া ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করা,

৩. ঋণ ও দাদনের পুনঃঅর্থসংস্থান করা,

৪. অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা এবং

৫. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পমেয়াদী বিল পুনর্বাট্টার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেই রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমগুলি (State Industrial Development Corporation বা SIDC) কাজ করে। যৌথ ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রেও এই নিগম অর্থ সাহায্য করে।

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণ দিচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্রশিল্পে যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছে তার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক ও ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণ হল ৮৮ শতাংশ এবং তার মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার অধীন ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের পরিমাণ হল ৪০ শতাংশ।

১৯৭১ সালে ক্রেডিট গ্যারান্টি করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া (Credit Guarantee Corporation of India) নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল—

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কম ঝুঁকিতে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিতে বেশী পরিমাণে ঋণ দিতে উৎসাহিত করা এবং

২. ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে যে ঋণ দেয়, সে ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে জামিনদার হিসাবে কাজ করা।

৫৮.৮.৭ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে রাজ্যের সাহায্য

রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজস্ব সম্বল থেকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ সাহায্য রাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। এই কাজ রাজ্য সরকারগুলি দু'রকম ব্যবস্থা অনুযায়ী করে—

১. রাজ্য সরকারের শিল্প সাহায্য আইনের (State Aid to Industries Act) ধারা অনুসারে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনধিক ১০ হাজার টাকা ঋণের দরখাস্ত বিবেচনা ও মঞ্জুর করে

২. তাছাড়া প্রায় সব রাজ্যেই এখন রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম (State Industrial Development Corporation বা SIDC) স্থাপিত হয়েছে। এরা মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, জল, বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহন, সরকারের কর, (Tax) সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা ও কাঁচামালের সুবিধা ইত্যাদি সুযোগ দেয়।

৫৮.৮.৮ ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানকারী সংস্থাগুলির কাজের মূল্যায়ন

মোট আর্থিক সহায়তা, সাহায্য-প্রাপ্ত শিল্পগুলির প্রকৃতি, সাহায্যের বিবিধ উদ্দেশ্য, ক্ষেত্রগত সাহায্য, ঋণ সাহায্যের অঞ্চলগত বণ্টন এবং সাহায্যের ধরনের দিক থেকে ভারতে বর্তমানে অর্থসংস্থানকারী অন্তর্কাঠামোটি (Financial Infrastructure) আয়তনে ও বৈচিত্র্যেও বেড়ে উঠেছে।

৫৮.৯ সারাংশ

ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলগত সুষম অগ্রগতির পথে বহু সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সরকার সৃষ্ট লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি। এটি বর্তমানে বিলোপ করা হয়েছে। আর একটি সমস্যা হচ্ছে শিল্পে কেন্দ্রীভবন। এই কেন্দ্রীভবনের সমস্যা প্রতিরোধে অতীতে গৃহীত বিভিন্ন আইনকে বর্তমানে শিথিল করা হয়েছে। এছাড়া শিল্পের রুগ্নতাও একটি সমস্যা এবং এর প্রতিরোধে গৃহীত সরকারী ব্যবস্থাও রয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান একটি বড় সমস্যা। এই অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসগুলিকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি— অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে প্রতিটি শিল্পের নিজস্ব পুঁজি এবং শেয়ার। বাহ্যিক উৎসের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের আমানত, স্টক ও সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বিদেশী ঋণ ইত্যাদি। বৃহদায়তন শিল্পে অর্থসংস্থানকারী বিভিন্ন সংস্থা আছে। ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেও অর্থসংস্থানকারী বিভিন্ন সংস্থা আছে। এই বিভিন্ন সংস্থার কাজের মূল্যায়নের প্রয়োজনও আছে।

৫৮.১০ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

- **বহুজাতিক কোম্পানী ঃ** যে কোম্পানীর শাখা বিভিন্ন দেশে আছে, তাকে বলা হয় বহুজাতিক কোম্পানী।
- **MRTP আইন ঃ** শিল্পে কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধকল্পে ১৭০ সালে সরকার দ্বারা প্রণীত "একচেটিয়া এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসার আইন"।
- **শিল্প লাইসেন্স ঃ** তালিকাভুক্ত শিল্পের কোনও নতুন প্রতিষ্ঠান এবং নতুন কোনও শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের দেওয়া অনুমতিপত্র।
- **পণ্য করায়ত্তকরণ ঃ** গোপনে পণ্য মজুত করে অন্যায্য ও অত্যন্ত চড়া দামে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করা এবং এইভাবে পণ্যের করায়ত্তকরণ করা।
- **শেয়ার ঃ** কোনও কোম্পানীর মোট মূলধনকে কতকগুলি সমমূল্যের অংশে বিভক্ত করে সেই অংশগুলির মালিকানাসূচক পত্র বাজারে বিক্রয় করা হয়। কোম্পানীর এই মালিকানাপত্রকে শেয়ার বলে।
- **ডিবেঞ্চার ঃ** যে অঙ্কের টাকা ঋণ করা হবে তা শেয়ারের মতো সমান সংখ্যক কতকগুলি অংশে ভাগ করে প্রত্যেকটি অংশকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বলা হয়।

৫৮.১১ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। (ক) ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালের শিল্প লাইসেন্স নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?

(গ) ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ভারতে একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

(ঘ) ভারতে রুগ্ন শিল্পের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। শিল্পগুলির রুগ্নতার কারণ কী কী? শিল্পক্ষেত্রে প্রতিরোধ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

(ঙ) ভারতের শিল্প ঋণ সংস্থার কাজের বিবরণ দিন।

(চ) শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাজের ক্ষেত্র ও অগ্রগতির সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(ছ) ভারতের ইউনিট ট্রাস্টের কাজের উদ্দেশ্য আলোচনা করে এর মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

২। (ক) ১৯৫১ সালের শিল্পোন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(খ) শিল্পে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের মাত্রা পরিমাপ করুন।

(গ) শিল্প এবং আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

(ঘ) বৃহদায়তন শিল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানকারী সংস্থা কী কী?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

৩। (ক) ভারতের শিল্পনীতি প্রথম কোন সালে ঘোষিত হয়?

(খ) শিল্পক্ষেত্রে বিদায়নীতি কাকে বলে?

(গ) শিল্প-রুগ্নতা কী?

(ঘ) IRBI কী?

(ঙ) BIFR কী?

(চ) ভারতে শিল্পের রুগ্নতার দুটি কারণ দেখান।

(ছ) শেয়ার কী?

(জ) স্টক ও সিকিউরিটি কী?

(ঝ) ডিবেঞ্চার কী?

(ঞ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ঋণদানকারী বিভিন্ন সংস্থা কী?

৫৮.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Reserve Bank of India : Economic Survey, 1992-93

২। Draft Five Year Plan : Govt of India

৩। Dutta R and Sundaram : Indian Economics.

৪। Agarwal : Indian Economics.

একক ৫৯ □ কর ব্যবস্থা, সরকারী ব্যয়, সরকারী ঋণ ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক—গৃহীত ব্যবস্থা

গঠন

৫৯.০ উদ্দেশ্য

৫৯.১ সরকারী নীতি

৫৯.১.১ সরকারী নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র

৫৯.১.২ ফিসক্যাল পলিসি কীভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক হয়

৫৯.২ ঘাটতি অর্থসংস্থান কাকে বলে?

৫৯.২.১ বিভিন্ন ধরনের বাজেট ঘাটতি

৫৯.২.২ ভারতে ঘাটতি অর্থসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

৫৯.২.৩ ঘাটতি অর্থসংস্থানের বিপক্ষে যুক্তি

৫৯.২.৪ ঘাটতি অর্থসংস্থানের সঞ্চয়ের উপর প্রভাব

৫৯.৩ ভারতের কর ব্যবস্থা— সরকারী নীতির একটি অংশ

৫৯.৩.১ ভারতের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৫৯.৩.২ ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটি ও সমস্যা

৫৯.৩.৩ কর ব্যবস্থা সংস্কারকল্পে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

৫৯.৩.৪ ভারতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

৫৯.৪ ভারতে সরকারী ব্যয়ের ধারা

৫৯.৪.১ বিভিন্ন ধরনের সরকারী ব্যয়

৫৯.৪.২ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

৫৯.৪.৩ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল

৫৯.৫ ভারতের সরকারী ঋণ

৫৯.৫.১ ভারত সরকারের বিভিন্ন ধরনের ঋণ

৫৯.৫.২ ভারতে সরকারী ঋণ বৃদ্ধি ও তার ফল

৫৯.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক

৫৯.৬.১ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত তালিকা

৫৯.৬.২ রাজ্য সরকারের অধীনে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত তালিকা

৫৯.৬.৩ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টন

৫৯.৬.৪ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা

৫৯.৬.৫ কেন্দ্রীয় অনুদান

৫৯.৬.৬ অর্থ কমিশন বা ফিন্যান্স কমিশন

৫৯.৬.৭ কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের মূল্যায়ন

৫৯.৭ কেন্দ্রীয় বাজেট

৫৯.৮ সারাংশে

৫৯.৯ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

৫৯.১০ অনুশীলনী

৫৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৫৯.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পর আপনারা সরকারী নীতি, কর ব্যবস্থা, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, ব্যয় ও ঋণ অর্থ কমিশন, বাজেট ও অনুদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫৯.১ সরকারী নীতি

কতকগুলি বাঞ্ছিত ফল লাভ ও অবাঞ্ছিত ফল পরিহারের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যয় এবং রাজস্ব সংগ্রহের কর্মসূচীর প্রয়োগই হল ফিসক্যাল পলিসি (Fiscal Policy)। যেভাবে সরকারী তহবিল খরচ হয় এবং রাজস্ব সংগ্রহ করা হয় ফিসক্যাল পলিসি তা আলোচনা করে। সরকারের ব্যয়ের সংস্থানের জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে ও তার কর্ম নির্বাহের জন্য ব্যয় করে। তার ফলে দেশবাসীদের কাছ থেকে সরকারের কাছে একটি আর্থিক প্রবাহ যেমন প্রবাহিত হয়, তেমনি সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীর কাছে আরেকটি আর্থিক প্রবাহ প্রবাহিত হতে থাকে। এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবাহেরই নানারূপ অর্থনৈতিক ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই দুটি প্রবাহ হল ফিসক্যাল পলিসির আলোচ্য বিষয়।

৫৯.১.১ সরকারী নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র

উন্নত ও স্বল্পোন্নত তথা বিকাশমান দেশের ফিসক্যাল পলিসির লক্ষ্য এক নয়। আধুনিক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ফিসক্যাল পলিসির চিরাচরিত উদ্দেশ্য হল, অর্থনৈতিক স্থিতি ও বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং সমাজকল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রভৃতি। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশ ভারতে ফিসক্যাল পলিসির উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশ।

ফিসক্যাল পলিসি বার্ষিক ও স্বল্পমেয়াদী (১ বৎসর) হলেও সেগুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র না থাকলে ওই সব খণ্ড পলিসিগুলি পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। ফলে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা আরও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল পলিসির প্রয়োজন হয়।

দীর্ঘমেয়াদী ফিসক্যাল পলিসির (১ বছরের বেশী এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোন সময়ের জন্য হতে পারে) সাহায্যে পূর্ব পরিকল্পিত দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলি পূরণে সাফল্য লাভ করা যায়।

৫৯.১.২ ফিসক্যাল পলিসি কীভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক হয়

অন্যান্য দেশের মত ভারতেও ফিসক্যাল পলিসির বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন— আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত নীতি এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যাতে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

বর্তমানে সমিষ্টগত অর্থনৈতিক (Macroeconomic) উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী নীতি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে স্বীকৃত।

পূর্ণোন্নত দেশে সরকারী নীতির লক্ষ্য হচ্ছে— পূর্ণ নিয়োগ (Full Employment), অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Economic Stability) এবং উচ্চ উন্নয়নের হার (High rate of Growth) বজায় রাখা। কিন্তু ভারতের মত

উন্নয়নশীল দেশে এই তিনটি লক্ষ্য ছাড়াও অন্যান্য লক্ষ্য হচ্ছে, মূলধন গঠন, বিনিয়োগে উৎসাহ, স্থিতিশীল মূল্যস্তর ইত্যাদি।

৫৯.২ ঘাটতি অর্থসংস্থান কাকে বলে?

সরকারের বাজেটে রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যখন বেশী ধরা হয়, তখন তাকে বলা হয় ঘাটতি বাজেট। এই বাজেট ঘাটতির জন্য অর্থসংস্থান করতে হলে সরকারের পক্ষে দুটি পথ খোলা থাকে। একটি হচ্ছে পূর্বতন সঞ্চিত সম্পদ বা তহবিল (Accumulated Balances) থেকে টাকা তোলা, অপরটি হচ্ছে টাকা ধার করা। অন্যান্য দেশের সরকারের মত ভারত সরকারও তিনটি উৎস থেকে টাকা ধার করতে পারে— (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এবং (গ) ব্যাঙ্ক নয় এরূপ প্রতিষ্ঠান অথবা জনসাধারণ। এভাবে বাজেটের ঘাটতি দূর করাকে বলা হয়— ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit Financing)।

৫৯.২.১ বিভিন্ন ধরনের বাজেট ঘাটতি

বাজেট ঘাটতির পক্ষে তিন প্রকার ঘাটতি নিহিত থাকে— (ক) আর্থিক ঘাটতি বা ফিসক্যাল ঘাটতি (Fiscal Deficit) (খ) রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit) এবং (গ) বাজেট ঘাটতি (Budgetary Deficit)।

৫৯.২.২ ভারতে ঘাটতি অর্থসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

সঠিকভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে যদি এই উৎসটিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও বিকাশে ঘাটতি ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

১. ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে বিপুল অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, নতুন 'সৃষ্ট' টাকা ছাড়া সেই সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ কম। নতুন সৃষ্ট টাকার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হবে। অপরদিকে এর ফলে লোকের ক্রয়শক্তি এবং কার্যকর চাহিদা (Effective Demand) বৃদ্ধি পাবে। কেইন্‌সীয় গুণক তত্ত্ব (Multiplier Theory) অনুযায়ী যদি ঘাটতি অর্থসংস্থানের দ্বারা উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হয়; তবে তা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে নূতন সৃষ্ট টাকার দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশে টাকার চাহিদাও বাড়ে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন টাকার সৃষ্টি করে এই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. ভারতের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এখনও এমন ক্ষেত্র আছে যাকে বলা হয়— মুদ্রা ব্যবহার বহির্ভূত (non-menetised sector) ক্ষেত্র। পরিকল্পিত উন্নয়ন যতই ঘটতে থাকবে, ততই মুদ্রা-ব্যবহার-বহির্ভূত ক্ষেত্রটি সঙ্কুচিত হতে থাকে। এমন দেশের মধ্যে টাকার চাহিদাও বাড়ে। ওই বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য নূতন সৃষ্ট টাকার প্রয়োজন হতে থাকে।

৫৯.২.৩ ঘাটতি অর্থসংস্থানের বিপক্ষে যুক্তি

ঘাটতি অর্থসংস্থানের বিপক্ষে যুক্তি হল—

১. ভারতের মত বিকাশমান দেশে অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবশক্তির পাশাপাশি অতি প্রাথমিক পুঁজিদ্রব্যেরও অভাব রয়েছে। সেই কারণে, অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত মানবশক্তি যতটা পরিমাণে উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত হয়, সেই অনুপাতে মোট উৎপাদন বাড়ে না। অবশ্য শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশলের সাহায্যে উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে।

২. উপযুক্ত অন্তর্কাঠামোর অভাব, উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় নূতন পুঁজি গঠনের পরিবর্তে পুঁজি ভেঙে ভোগব্যয় (Capital Consumption) ঘটতে পারে।

৩. বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য যদি সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (RBI) এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহ, উভয়ের কাছ থেকেই টাকা ধার করে, তবে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুণক তত্ত্ব (Money-Creation Multiplier) কার্যকর হয়। স্বাভাবিকভাবেই তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন মুনাফার হারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ফাটকাজাতীয় (Speculative) খাতে বিনিয়োগের উপকরণগুলি প্রবাহিত হতে পারে।

তাই সরকারের উচিত হল ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতিটি সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োগ করা। অর্থাৎ—

১. ভারতের অর্থনীতি তার বর্তমান অবস্থায় ঘাটতি ব্যয়ের ধাক্কা কতটা সহ্য করতে পারবে সেটা বিচার করে সীমাবদ্ধ পরিমাণে ওই হাতিয়ারটি প্রয়োগ করা;

২. ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা যেটুকু অর্থসংস্থান ঘটবে তা দ্রুত উৎপাদনশীল পরিকল্পনার রূপায়ণে যথাসম্ভব ব্যবহার করা।

৫৯.২.৪ ঘাটতি অর্থসংস্থানের সঞ্চয়ের উপর প্রভাব

ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কিনা, সেটা অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে, যেমন—

১. দেশে কতটা আর্থিক আয়ের (Money Income) সৃষ্টি হয়েছে, ২. মূল্যস্তরের গতি প্রকৃতি, ৩. বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ, ৪. দেশে করের প্রান্তিক হার (Marginal rate of Taxation), ৫. ব্যবসায়ীদের অর্জিত মুনাফা ও শ্রমিকদের অর্জিত মজুরী প্রভৃতি।

যদি ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি না পায় এবং শ্রমিকদের স্বল্প উৎপাদনী শক্তি থাকার দরুন উৎপাদন বৃদ্ধির হারও যদি খুব অল্প হয় ও অব্যবহৃত সম্পদ সদ্ব্যবহারে যদি সাফল্য অর্জিত না হয়, তবে তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় এবং দেশের সঞ্চয় ব্যাহত হয়।

৫৯.৩ ভারতের কর ব্যবস্থা — সরকারী নীতির একটি অংশ

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, কোন অর্থনীতিতে সরকারী নীতি (Fiscal Policy) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী নীতির একটি অংশ হিসাবে ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করব— ভারতের কর ব্যবস্থা (Tax System of India)—যা সরকারী নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৫৯.৩.১ ভারতের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস হচ্ছে দুটি— কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত আয়। চলতি খাতে (Current Account) মোট আয়ের মধ্যে কর-রাজস্ব ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৭-৯৮-এর মধ্যে বেড়েছে ৩০.৪, কর-বহির্ভূত আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশ।

১. ভারতে কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে রাজস্ব সংগ্রহে প্রত্যক্ষ করের (Direct Tax) থেকে পরোক্ষ করের (Indirect Tax) আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি। এর কারণ হল, পরোক্ষ কর ঝরোর পক্ষেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় এবং এই কর বসিয়ে খুব সহজেই তা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব। বর্তমানে রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্ত মোট রাজস্বের ৬৬ শতাংশেরও বেশী আসে পরোক্ষ কর থেকে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মোট রাজস্বের ৮০ শতাংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে। পরোক্ষ করের ওপর এই নির্ভরতার জন্য অনেকে মনে করেন যে, ভারতের কর ব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল (Regressive)।

২. প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর স্থিতিস্থাপকতা (Tax Elasticity) এবং কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব প্রবহমান রাখার ক্ষমতা (Tax buoyancy) আপেক্ষিকভাবে কম। ভারতে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কর রাজস্বের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Tax Revenue) এককের অপেক্ষা কম (<১) এবং পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এটা এককের অপেক্ষা বেশী (>১)।

৩. কর ও আয়ের অনুপাত দিয়ে একটা দেশে করের বোঝা কম কি বেশী তা পরিমাপ করা হয়। এখন তৃতীয় বিশ্বের বিকাশমান গরীব দেশগুলির মধ্যে যাদের করের বোঝা সবচেয়ে বেশি, ভারত তাদের অন্যতম।

৪. ভারতে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অ-কৃষিক্ষেত্রে করের বোঝা বেশি। অথচ জাতীয় আয়ের ৩৭ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। এখানে কৃষি ব্যবস্থায় করের চাপ আপেক্ষিকভাবে কম (Relatively Undertaxed)। এই কৃষিক্ষেত্রে করধার্য করার অধিকার রয়েছে রাজ্যসরকারের হাতে।

৫. বর্তমানে ভারতে উদার অর্থনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পরোক্ষ করের উপর অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে। অন্তঃশুল্কের হারও কমানো হয়েছে। তাছাড়া MODVAT বা সংশোধিত সংযোজিত মূল্যের উপর কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। VAT বা সংযোজিত মূল্যের উপর কর বলতে বোঝায়, একটি পণ্যের উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে যে পরিমাণ মূল্য যোগ হয়, সেই স্তরে ঠিক সেই মূল্যের উপর এই কর ধার্য হয়।

৫৯.৩.২ ভারতের কর ব্যবস্থার ত্রুটি ও সমস্যা

ভারতের মত এত বড় দেশে কর ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি (Shortcoming) ও সমস্যা (Problem) রয়েছে।

১. বিভিন্ন রাজ্যে কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি মাত্র নীতি (Principle) অনুসরণ করা হয় না। বিশেষ করে রাজ্যগুলিতে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে করগুলি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন রাজ্যে নিয়মের বিভিন্নতা লক্ষ্যণীয়।

২. আবার ভারতের কর ব্যবস্থা জটিল ও অনমনীয়।

৩. কর সংগ্রহের ব্যয়ও অত্যন্ত বেশি।

৪. ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর করের প্রতিকূল প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

৫. ভারতে কর-রাজস্বে স্থিতিস্থাপকতার অভাব রয়েছে।

৬. এখানে কর ব্যবস্থা গতানুগতিক (Traditional) ও অবৈজ্ঞানিক (Unscientific)।

৫৯.৩.৩ কর ব্যবস্থা সংস্কারকল্পে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

১৯৫৪ সালে কর অনুসন্ধানী কমিটি (Taxation Enquiry Commission) করাঘাত, করপাত, উপযুক্ত কর ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন প্রতিরোধ কর ব্যবস্থার ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে তার বিবরণ পেশ করে।

১৯৫৬ সালে প্রফেসর ক্যালডর (Kaldor's Reprot on Indian Tax Reform) প্রত্যক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ওপর বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি সম্পদ কর, মূলধনের মুনাফার উপর কর, দান কর এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের ওপর কর বসানোর সুপারিশ করেন।

১৯৬৭ সালে ভূতলিঙ্গম কমিটি ভারতীয় করব্যবস্থার সরলীকরণ ও সংস্কারকল্পে তার বিবরণ পেশ করে।

১৯৭১ সালে প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধানী কমিটি বা ওয়াংচু কমিটি কর ফাঁকি বন্ধ করা এবং কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট আয়ের ওপর কর আরোপ সম্বন্ধে তার বিবরণ পেশ করে।

১৯৭৬ সালে শ্রী এল. কে. ঝা-এর নেতৃত্বে গঠিত পরোক্ষ কর তদন্ত কমিটি পরোক্ষ করের আমূল সংস্কার সম্বন্ধে ১৯৭৭ সালে তার বিবরণ পেশ করে।

১৯৭৭ সালে প্রত্যক্ষ কর আইন কমিটি বা চোক্সী কমিটি একটি অন্তবর্তীকালীন বিবরণ পেশ করে।

১৯৯১ সালে কর সংস্কার কমিটি বা চেলাইয়া কমিটির সুপারিশগুলি নব্বই-এর দশকে গৃহীত উদার অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫৯.৩.৪ ভারতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

ভারতে অধিকাংশ প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) ধার্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রত্যক্ষ কর ধার্য করে, সেগুলি হল,

১. ব্যক্তিগত আয়কর (Personal Income Tax), ২. কোম্পানী আয়কর (Corporate Income Tax), ৩. সম্পদ কর (Wealth Tax), ৪. মূলধন মুনাফা কর (Capital Gains Tax), ৫. উত্তরাধিকার কর (Estate Duty)।

এছাড়া ব্যক্তিগত ব্যয় কর কেবলমাত্র ১ বৎসরের জন্য (Personal Expenditure Tax) ধার্য করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রত্যক্ষ করগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আয়কর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধান পরোক্ষ কর হল ৩টি— অন্তঃশুল্ক (Excise Duty), বহিঃশুল্ক (Customs Duty) এবং বিক্রয় কর (Sales Tax)।

৫৯.৪ ভারতে সরকারী ব্যয়ের ধারা

কর-ব্যবস্থা, ঘাটতি ব্যয়ের মত সরকারী ব্যয়ও ফিসক্যাল নীতির একটি অঙ্গ। কোন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে (Macro Economics) সরকারী ব্যয় (Public Expenditure) মোট ব্যয়ের (Total Expenditure) একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের বিভিন্ন ধরন আমরা পরে আলোচনা করব (একটি সারণির সাহায্যে)। প্রথমে আমরা সাধারণভাবে সরকারী ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়কে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়—এই দুইভাবে বিভক্ত না করে উন্নয়নমূলক ব্যয় (Development Expenditure) এবং উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় (Non-Development Expenditure)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মাধ্যমে যদি মূলধন সৃষ্টি না হয় বা মূলধন ক্রয় করার জন্য কোন বরাদ্দ না থাকে, তবে সেই ব্যয় ভোগব্যয়ে পর্যবসিত হয়। মূলধন সৃষ্টি বা মূলধন ক্রয়জনিত ব্যয় অবশ্যই বিনিয়োগ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯১-৯২ সালে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৭.২

শতাংশ। ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে এটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫.৬ শতাংশ। এই অনুপাত কমে যাবার প্রধান কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন ব্যয়ের (Capital Expenditure) হ্রাস। ১৯৯১-৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট মূলধন ব্যয় ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ৩.৮ শতাংশ। এটা ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে হয়েছে ২.৬ শতাংশ। তবে প্রতিরক্ষা খাতে মূলধন ব্যয়ের (Defence Capital Expenditure) পরিমাণ ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে ১২৬৩১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ১৭৯২৬ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ে সরকারী ঋণের ওপর সুদ প্রদান বাবদ ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে মোট ব্যয়ের ৭৪ শতাংশ পরিকল্পনা - বহির্ভূত ব্যয় ধরা হয়েছে এবং মোট ব্যয়ের ২০ শতাংশ ঋণ বাবদ সুদ প্রদানের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

উন্নয়ন-বহির্ভূত ব্যয়ের আধিক্য হওয়ার অর্থ হল সরকারের ভোগজনিত ব্যয়ের (Consumption Expenditure) পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

৫৯.৪.১ বিভিন্ন ধরনের সরকারী ব্যয়

এখানে একটি সারণির সাহায্যে (Table) সরকারী ব্যয়ের বিভিন্ন ধরন দেওয়া হল—

ভারতে সরকারী ব্যয়ের বিভিন্ন ধরন

সরকারী ব্যয়

পরিকল্পনা বহির্ভূত বা উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় (ভোগব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত)	বিনিয়োগ ব্যয় বা উন্নয়নমূলক ব্যয় বা পরিকল্পনাজনিত ব্যয়	হস্তান্তর ব্যয়
(ক) ঋণের উপর সুদ প্রদান	(ক) পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে বাজেট বরাদ্দ	(ক) ভরতুকি
(খ) সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও মহার্ঘ্য ভাতা	(খ) বাজেট সম্পদ থেকে মূলধন গঠন	(খ) পেনশন
(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবা	(গ) পরিকল্পনা খাতে রাজ্যগুলিকে ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে অর্থ প্রদান প্রভৃতি	(গ) ত্রাণ বাবদ ব্যয় প্রভৃতি।
(ঘ) প্রতিরক্ষাজনিত ব্যয় ভোগব্যয়)	(ঘ) প্রতিরক্ষা জনিত ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয়) প্রভৃতি	
(ঙ) প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতি।		

৫৯.৪.২ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

এখানে সংক্ষেপে ভারতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির কারণগুলি দেওয়া হল—

১. জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ২. উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়ে বৃদ্ধি, ৩. জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি, ৪. সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সম্প্রসারণ (Administrative Expenditure), ৫. নগরীকরণ (Urbanisation), ৬. উন্নয়নের কার্যক্রম, ৭. প্রতিরক্ষাজনিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়, ৮. ভরতুকি প্রভৃতি।

৫৯.৪.৩ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল

এবার ভারতে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects of the Rise in Government Expenditure in India) সংক্ষেপে দেওয়া হল—

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃদ্ধি, ২. সমাজ-পরিষেবার বিস্তার, ৩. কর্মসংস্থানে বৃদ্ধি, ৪. সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ৫. আয় বৈষম্য দূরীকরণ, ৬. মূল্যস্তরে বৃদ্ধি প্রভৃতি।

৫৯.৫ ভারতের সরকারী ঋণ

ভারতে সরকারী ঋণের সুব্যবস্থা ও অব্যবস্থা নির্ভর করে অনুৎপাদক (Unproductive) ঋণের অনুপাতে উৎপাদক (Productive) ঋণের পরিমাপের ওপর এবং বৈদেশিক ঋণের ওপর ধার্য করা সুদের হারের ওপর। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের সরকারী ঋণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক।

৫৯.৫.১ ভারত সরকারের বিভিন্ন ধরনের ঋণ

ভারতে সরকারী ঋণ সাধারণত তিন ধরনের—১. অভ্যন্তরীণ, ২. বৈদেশিক এবং ৩. অন্যান্য দায়।

১. অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে আছে— (ক) চলতি বাজার থেকে ঋণ, (খ) অন্যান্য (যেমন পুরানো ঋণের অবশিষ্ট) ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য বন্ড, (গ) স্পেশ্যাল বেয়ারার বন্ড, (ঘ) ট্রেজারী বিল, (ঙ) স্পেশ্যাল ফ্লোটিং ও অন্যান্য ঋণ এবং (চ) স্পেশ্যাল সিকিউরিটিজ।

২. বৈদেশিক ঋণ— অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজনে এবং বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশী ঋণের প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক ঋণ সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করা হয়, পরিশোধও হয় বৈদেশিক মুদ্রায়।

৩. ভারত সরকারের অন্যান্য দায় স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পোস্টাল বীমা, লাইফ অ্যানুয়িটি ফান্ড প্রভৃতি সরকারের অন্যান্য দায়ের অন্তর্গত।

ভারতে পরিকল্পনার জন্য সম্বল সংগ্রহে (Mobility of Resources) সরকার ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৫৯.৫.২ ভারতে সরকারী ঋণ বৃদ্ধি ও তার ফল

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে The National Council of Applied Economic Research (NCAER) দেশের সমস্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদের হার বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করে একটি বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিষদের মতে ঋণের ওপর সুদের হার বৃদ্ধি করলেই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০০ কোটি টাকা সরকারী ঋণ পাওয়া সম্ভবপর ছিল।

১৯৭৮ সাল থেকে সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি মুদ্রা বিনিময় হার (Current Exchange Rate) পরিবর্তনশীল হওয়ায় বৈদেশিক ঋণের মোট মূল্যও পরিবর্তনশীল।

সম্প্রতি জনসাধারণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করার জন্য সরকার যে সব প্রকল্প প্রস্তুত করেছেন, তাতে সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা খাতে ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিও অন্যতম প্রধান কারণ।

সরকারী ঋণে এই বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫৯.৬ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। পৃথিবীতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে (Unitary State) রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় একটি কেন্দ্রের বা সরকারের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ওই সব রাষ্ট্রের সমস্যা প্রধানত আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার ও বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে (Federal State) দুই প্রস্থ বা দ্বিকেন্দ্রিক সরকার থাকার জন্য তাদের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বতন্ত্রতা দেখা যায়।

এখানে সমস্যা হচ্ছে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্বের উৎস সমূহের বণ্টন অথবা কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে কোন বিশেষ সূত্র থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বণ্টন।

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তাতে ১৯৪৩ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকেই মোটামুটি অনুসরণ করা হয়েছে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি তিনটি তালিকায় বিভক্ত— (ক) ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় তালিকা (Union list), (খ) রাজ্য তালিকা (State list), এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে যুগ্ম তালিকার গুরুত্ব খুবই কম।

৫৯.৬.১ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত তালিকা

কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে কর ও শুল্কগুলি (Taxes and Duties in the Union list) হল—

১. কৃষি আয় বাদে অন্যান্য ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কর

২. কোম্পানী আয়কর

৩. আমদানী-রপ্তানী শুল্ক

৪. মদ ও ওষুধ এবং প্রসাধনী দ্রব্যে ব্যবহৃত মাদক দ্রব্য বাদে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty)

৫. কৃষি জমি বাদে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকার কর (Estate and Succession Duties)

৬. ব্যক্তি ও কোম্পানীর মালিকানাধীন কৃষি জমি বাদে অন্যান্য সম্পত্তির মূলধনী মূল্যের ওপর কর (Capital Value of Assets)

৭. স্ট্যাম্প ডিউটি (Stamp Duty)

৮. স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ারের আগাম বাজারের লেনদেনের ওপর স্ট্যাম্প ডিউটি বাদে অন্যান্য কর

৯. সংবাদপত্র বিক্রয় ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ওপর কর

১০. রেলের যাত্রীভাড়া ও মাশুলের ওপর কর

১১. রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনে যাত্রী ও পণ্য মাশুল (Terminal Taxes) এবং

১২. আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে মাল বেচাকেনার ওপর কর।

৫৯.৬.২ রাজ্য সরকারের অধীনে কর ও শুল্ক সংক্রান্ত তালিকা

রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে কর ও শুল্কগুলি হল—

১. ভূমি রাজস্ব (Land Revenue)

২. সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের ওপর কর

৩. কৃষি আয়ের ওপর কর

৪. জমি ও বাড়ির ওপর কর

৫. কৃষি-জমির উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির ওপর কর

৬. মদ ও মাদক দ্রব্যের ওপর উৎপাদন শুল্ক

৭. চুঙ্গি কর (Taxes on Entry of Goods)

৮. সংসদের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষ খনিজ দ্রব্যের ওপর কর

৯. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপর কর

১০. গাড়ী ও নৌকার ওপর কর

১১. আর্থিক দলিল বাদে অন্যান্য দলিলের ওপর কর

১২. বাস ও অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবাহিত যানের যাত্রীদের ও মালের ওপর কর

১৩. প্রমোদ (Entertainment), বাজিধরা ও জুয়ার (Gambling) ওপর কর

১৪. পথ ও সেতু ব্যবহারের ওপর কর (Toll Tax)

১৫. বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও নিয়োগের ওপর কর

১৬. মাথাপিছু প্রদেয় শুল্ক (Capitation Fee) এবং

১৭. সংবাদপত্রে বিজ্ঞান বাদে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের ওপর কর।

এছাড়া, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকায় যার উল্লেখ নেই, তেমন বিষয়ের ওপরেও কেন্দ্রীয় সরকার কর বসাতে পারে।

৫৯.৬.৩ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টন

রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের ওপর কর ও শুল্ক ধার্য করার অধিকার উপরোক্ত দুটি তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সমূহের রাজস্বের উৎসগুলি তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসগুলি সম্প্রসারণশীল।

এইজন্য রাজ্যসরকারগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আয়-ব্যয়ের বণ্টন সম্পর্কে দুটি নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে—১. প্রশাসনিক সুবিধা (Administrative Convenience) এবং ২. রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য (Fiscal Independence)।

রাজস্বের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে সুবিধা, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা— এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তেমনি ওই নীতিগুলি এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যেন তা থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতে পারে। সর্বত্র এই নীতিগুলি

পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা কঠিন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আয়-ব্যয় বণ্টন ব্যবস্থা কমবেশি পরিমাণে ঐতিহাসিক কারণ ও বাস্তব সুবিধা—এই দুটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের বণ্টন ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়।

৫৯.৬.৪ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা—

১. স্ট্যাম্প কর, ভেষজ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির ওপর ধার্য কর এবং এ ধরনের আরও কয়েকটি কর কেন্দ্র ধার্য করে। কিন্তু এর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্য সরকারগুলিও ভোগ করে।

২. অ-কৃষি সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকার কর, পরিবহনের সীমা কর, রেল মাশুলের ওপর ধার্য রাজ্য কর, ইত্যাদি কয়েকটিকে কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে। কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট সরকার ভোগ করে।

৩. অ-কৃষি আয়কর প্রভৃতি কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত হিসাব অনুসারে বণ্টিত হয়।

৪. তামাক, দেশলাই, প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের ওপর অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ধার্য, সংগ্রহ এবং ভোগ করতে পারে অথবা প্রয়োজন বোধে এই রাজস্বের একাংশ কিংবা সবটুকুই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করতে পারে।

৫৯.৬.৫ কেন্দ্রীয় অনুদান

রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে প্রতি বছর আর্থিক সাহায্য (Grants-in-aid) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সাহায্য দুই ধরনের হতে পারে— (ক) নির্দিষ্ট ধরনের অনুদান (Specific Grants) এবং সাধারণ অনুদান (General Grants)। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে নির্দিষ্ট ধরনের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে সাধারণ অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

৫৯.৬.৬ অর্থ কমিশন বা ফিন্যান্স কমিশন

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান প্রবর্তিত হবার দুবছরের মধ্যে এবং তার পরবর্তীকালে প্রতি ৫ বছর অন্তর ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি করে ফিন্যান্স কমিশন নিয়োগ করবেন। ঐ কমিশনের কাজ হবে—

১. কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা

২. কেন্দ্রীয় অনুদানের জন্য রাজ্য সরকারগুলির আবেদনপত্র বিবেচনা করা

৩. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সুপারিশ করা। কমিশনের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণভাবে বা অংশত গ্রহণ, পরিবর্তন বা বর্জন করতে পারেন।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন বা অর্থসাহায্যের কোন বিধিবদ্ধ নীতি নেই, কারণ এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য বিরাজমান।

এ পর্যন্ত দশটি ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছে। একাদশ ফিন্যান্স কমিশনের (২০০০-২০০৫) প্রকাশিত সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন ফিন্যান্স কমিশন দ্বারা কর ও শুল্করাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি—

আয়কর— (ক) কোন রাজ্যের জনসংখ্যা, (খ) রাজ্য কর্তৃক কর-রাজস্ব সংগ্রহ, (গ) বিভিন্ন রাজ্যের অনগ্রসরতা ও বিশেষ সমস্যা।

আবগারী শুল্ক— (ক) কোন রাজ্যের জনসংখ্যা, (খ) মাথাপিছু আয়, (গ) অনগ্রসরতা।

এছাড়া অন্যান্য কর এবং শুল্ক রাজস্বের বণ্টনের জন্য বিভিন্ন নীতি রয়েছে।

আর্থিক অনুদান—(ক) কোন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা, (খ) উন্নয়ন রাজস্ব এবং উন্নয়ন-বহির্ভূত রাজস্বের ঘাটতি, (গ) প্রশাসনিক মান উন্নয়ন, (ঘ) প্রাকৃতিক ও অন্যান্য ধরনের বিপর্যয়।

ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশগুলি যে রাজ্যগুলির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বরাদ্দ অর্থের ওপরেই রাজ্যগুলির নিজস্ব পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদান নির্ভর করে।

৫৯.৬.৭ কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের মূল্যায়ন

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির হাতে রাজস্বের যে উৎস দেওয়া হয়েছে, তা প্রধানত অস্থিতিস্থাপক ও সীমিত। এছাড়া রয়েছে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা। এমনকি বিভিন্ন রাজ্য বর্তমানে কেন্দ্র থেকে যে ঋণ পায়, তার থেকে বেশী অর্থ সুদে-আসলে কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের জন্য দিতে হয়। তাই বর্তমানে রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সংশোধনের দাবী উঠেছে।

এখানে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির হাতে অর্থ হস্তান্তরের সমস্যাগুলি হল— একদিকে ফিন্যান্স কমিশনের বিধিবদ্ধ অনুদান, আর অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) উন্নয়নমূলক অনুদান— রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য প্রতিবিধান হল ফিন্যান্স কমিশন উভয়েরই ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত।

৫৯.৭ কেন্দ্রীয় বাজেট

ভারতে কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারের ফিসক্যাল পলিসি বা আয়-ব্যয় নীতি প্রতিফলিত হয়। দেশের মানুষের কাছ থেকে কর, শুল্ক, ঋণ ইত্যাদি আয় রূপে অর্থের একটি প্রবাহ (এবং তার ভিতর দিয়ে প্রকৃত দ্রব্য সামগ্রীর প্রবাহ) সরকারের কাছে অবিরামভাবে প্রবাহিত হয়। এর পাশাপাশি আবার সরকারের ব্যয় রূপে আর একটি আর্থিক প্রবাহ (এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত দ্রব্য সামগ্রীর একটি প্রবাহ) সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীর কাছে প্রবাহিত হয়। এই দুটি বিপরীতমুখী প্রবাহ আর্থিক প্রবাহ হিসেবে মনে হলেও চরিত্রে আয়-ব্যয়-ঋণ বা ফিসক্যাল প্রবাহ।

ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—উভয় বাজেটেই দুটি ভাগ রয়েছে—(ক) চলতি বা রাজস্ব খাতের বাজেট এবং (খ) মূলধনী বাজেট।

এই দুটি ভাগেই আয় ও ব্যয়ের খাতে তিনটি করে হিসাব থাকে—

(ক) এক বছর আগের প্রকৃত আয়-ব্যয় হিসাব, (খ) বর্তমান বছরের বাজেটের ও সংশোধিত বাজেটের আয়-ব্যয় হিসাব, (গ) আগামী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের হিসাব।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন শূন্য বা জিরো-ভিত্তিক বাজেট, (Zero-Based Budgeting বা ZBB) অন্যান্য দেশের মত ভারতেও বাজেট তৈরীর একটি কৌশল বা পদ্ধতি (Technique) অনুসরণ করা হয়। এখানে প্রতি বছর ব্যয়ের প্রতিটি খাত সম্পর্কে নূতন করে মূল্যায়ন করতে হয়— অর্থাৎ ধরে নিতে হয়, এই খাতে খরচের অঙ্কটা হল শূন্য (০)। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয়ের বাঞ্ছিত পরিমাণ স্থির করাই ZBB-র উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এখানে চলতি খাতে আয় হল কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব। চলতি খাতে ব্যয় হল— সাধারণ প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সেবামূলক প্রভৃতি বিবিধ ব্যয়। মূলধনী খাতে আয় হল—ঋণ পরিশোধ বাবদ আদায়, নতুন ঋণ প্রভৃতি। মূলধনী খাতে ব্যয় হল— সাধারণ প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সেবামূলক প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদপ্তর বাজটে তৈরী করলে বিভিন্ন ব্যয় মঞ্জুর করার জন্য সংসদে একটি বিল (Finance Bill) পাশ করা হয়। তারপর ওই অনুমোদিত বরাদ্দ অর্থব্যয়ের অনুমতি দেবার উদ্দেশ্যে একটি ব্যয়মঞ্জুরী বিল (Appropriation Bill) পাশ করা হয়।

আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেটে দুই রকম বিভাজন করা হয়— উল্লম্ব বিভাজন (Vertical Division) এবং অনুভূমিক বিভাজন (Horizontal Division)।

কেন্দ্রীয় বাজেটের উল্লম্ব বিভাজন

আয়	ব্যয়
১। কর রাজস্ব	১। ভোগ ব্যয়
২। কর = বহির্ভূত রাজস্ব	২। বিনিয়োগ ব্যয়
মোট আয়	মোট ব্যয়

কেন্দ্রীয় বাজেটে অনুভূমিক বিভাজন

চলতি বাজেট	
আয়	ব্যয়
মূলধনী বাজেট	
আয়	ব্যয়

ওপরে আলোচিত পদ্ধতি অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট তৈরী করা হয়।

৫৯.৮ সারাংশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির অর্থসংক্রান্ত আয়ব্যয়ের নীতি বা Fiscal নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কর রাজস্ব। এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নতুন টাকার সৃষ্টি করে সরকারের ঘাটতি মেটাবার উদ্দেশ্যে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে। ভারতে এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ করের গুরুত্ব বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আছে। রাজ্যসরকারগুলিও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করতে পারে।

সরকারী ব্যয় ফিসক্যাল নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারী ঋণ ও তার বৃদ্ধি ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক মোট রাজস্বের বণ্টনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মোট রাজস্ব কীভাবে বণ্টন করা হবে সেই উদ্দেশ্যে নীতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ফিন্যান্স কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে অনুদান দেয়। প্রতি বছর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট তৈরী করা হয়।

৫৯.৯ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

- **অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব ঃ** যখন কোনও দেশের জনসংখ্যার একটি অংশ কাজে ইচ্ছুক হয়েও কাজে নিযুক্ত হতে পারে না তখন তাকে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলা হয়।

- **পূর্ণ নিয়োগ ঃ** কাজ করতে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিই যখনই কাজে নিযুক্ত হয়; অর্থাৎ এই অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব থাকে না।

- **বাণিজ্যচক্র বিরোধী বাজেট নীতি ঃ** বাণিজ্যচক্রের উর্ধগতির সময় সরকারী ব্যয় হ্রাস করা এবং বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা।

- **বাজেট ঘাটতি ঃ** কোনও বছরে যদি রাজস্ব ব্যয় ও মূলধনী ব্যয়, রাজস্ব প্রাপ্তি ও মূলধনী আয়ের থেকে বেশী হয়, তবে সেই ঘাটতিকে বলা হয় বাজেট ঘাটতি।

- **কর রাজস্বের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঃ** আয়বৃদ্ধির ফলে যখন কর রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; এই স্থিতিস্থাপকতা ১ এর বেশি, ১ এর কম অথবা ১ এর সমান হতে পারে।

- **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঃ** কোনও আর্থিক বছরে কোনও দেশের অভ্যন্তরে মোট যে উৎপাদন হয় তার বাজারমূল্যকে বলা হয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

- **ফিন্যান্স কমিশন ঃ** কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টন এবং কেন্দ্র দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে দেওয়া অনুদান সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর এই কমিশন গঠিত হয়।

৫৯.১০ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১।(ক) দান কর কী?

(খ) কৃষিজাত আয়কর কী?

(গ) মূলধন-মুনাফা কর কী?

(ঘ) কোন বৎসরে এবং কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে প্রফেসর ক্যালডরের নূতন কর সম্বন্ধে সুপারিশগুলি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল?

(ঙ) চেলাইয়া কমিটি কোন সালে গঠিত হয়েছিল?

(চ) ভারতে চারটি প্রত্যক্ষ করের নাম বলুন।

(ছ) ঘাটতি ব্যয় কী?

(জ) ফিসক্যাল পলিসি কাকে বলে?

(ঝ) ভোগ ব্যয় কী?

(ঞ) কেন্দ্রীয় অনুদান কী?

(ট) উন্নয়নমূলক ব্যয় কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

২। (ক) বিভিন্ন ধরনের বাজেট ঘাটতি কী কী?

(খ) ভারতের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(গ) বিক্রয় কর কী?

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের সরকারী ব্যয় কী কী?

(ঙ) সরকারী ঋণ বৃদ্ধির কারণ কী?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

৩। (ক) ভারতের কর কাঠামোয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর মন্তব্য করুন।

(খ) ঘাটতি অর্থসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(গ) ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্বের উৎসগুলি বর্ণনা করুন এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ করুন।

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৫৯.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ganguly, Subrata : Public Finance,

২। Lekbi : Public Finance.

৩। Dutta, R. Sundaram : Indian Economics.

৪। Reports of the Finance Commission — 4. Oct. of India.

একক ৬০ □ ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ও অর্থসম্বন্ধীয় নীতি

গঠন

৬০.০ উদ্দেশ্য

৬০.১ প্রস্তাবনা

৬০.২ পরিকল্পনাকালে ভারতের আর্থিক নীতি

৬০.৩ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুসৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি

৬০.৩.১ ব্যাঙ্করেট নীতি

৬০.৩.২ খোলাবাজারী কারবার

৬০.৩.৩ পরিবর্তনীয় রিজার্ভের অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি

৬০.৩.৪ নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৬০.৩.৫ নৈতিক প্রণোদন

৬০.৩.৬ ঋণ অনুমোদন প্রকল্প

৬০.৩.৭ সুদের হার সম্পর্কিত নীতি

৬০.৪ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক নীতি

৬০.৫ সারাংশ

৬০.৬ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

৬০.৭ অনুশীলনী

৬০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬০.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পর আপনি ভারতের আর্থিক অবস্থা, নীতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, ভারতের আর্থিক নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬০.১ প্রস্তাবনা

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা (Monetary System) বলতে সাধারণত একযোগে অর্থের বাজার এবং মূলধনের বাজার দুইই বোঝায়। অর্থের বাজার স্বল্পমেয়াদী ঋণের এবং মূলধনের বাজার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের লেনদেনে নিযুক্ত থাকে।

৬০.২ পরিকল্পনাকালে ভারতের আর্থিক নীতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে অর্থাৎ ১৯৫৬ সাল থেকে একটি স্থিতিস্থাপক আর্থিক নীতি অনুসরণ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাফল্যের সঙ্গে ভারতের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। প্রয়োজনবোধে ঋণ ও টাকার যোগান সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নীতি (Controlled Expansion of Credit) অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে এই নীতিরই সামান্য রদবদল করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা অনুসৃত নীতির নাম দেওয়া হয় "ঋণের বিচারমূলক উদারীকরণ নীতি। অর্থাৎ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঋণের উদার সরবরাহ এবং অগ্রাধিকার বহির্ভূত ক্ষেত্রে ঋণের সংকোচন।

৬০.৩ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুসৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির মূল লক্ষ্য হল—

১. দেশে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা,

২. কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়ে এবং অর্থনৈতিক পরিষেবার (Service) প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ঋণের পরিমাণগত, গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ নীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা এবং

৩. ভারতের টাকার বাজারের উন্নতি ঘটানো।

এই ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলিকে পরিমাণগত বা সাধারণ (Quantitative or General) এবং গুণগত বা নির্বাচনমূলক (Qualitative or Selective)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ব্যাঙ্ক রেট পদ্ধতি, (খ) খোলাবাজারী কারবার এবং (গ) নগদ জমার অনুপাত—এই তিনটি হল পরিমাণগত বা সাধারণ পদ্ধতি। অপরদিকে বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হল গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি।

এছাড়া বিলবাজার কর্মসূচীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্টকরণ পদ্ধতিটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়। অনেক সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র 'অনুরোধ' বা নীতির উপরে চাপ সৃষ্টি (Moral Suasion) করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সুতরাং বলা যায়, অন্যান্য দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সব পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সেই সব পদ্ধতির সাহায্যেই ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬০.৩.১ ব্যাঙ্করেট নীতি

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্যিক বিল বাট্টা (Discount) করে, তাকে বলে ব্যাঙ্করেট। ব্যাঙ্করেট বাড়লে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বাট্টার হার এবং অন্যান্য ঋণের উপর সুদের হারও বাড়ে। ব্যাঙ্ক ঋণের দাম বেড়ে যায় ও ঋণের যোগান কমে। এর ফলে মজুতদার ও ফাটকাবাজরা বেশী পরিমাণে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে) দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে বেশী মুনাফার আশায় সেগুলিকে মজুত করতে পারে না। অর্থাৎ বাজারে কৃত্রিমভাবে যোগান কমানোর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। এভাবে ব্যাঙ্করেট নীতি মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী অস্ত্র হিসাব কাজ করে।

ব্যাঙ্করেট বাড়লে তার ফলে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য লগ্নীকারী সংস্থাগুলির লগ্নী করা সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় এবং তার ফলে এদের আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু স্যামুয়েলসন (Samuelson) প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, এই সব লগ্নীকারীরা যদি হিসাব করে স্বল্পমেয়াদী লগ্নীপত্রে তাদের অধিকাংশ অর্থ লগ্নী করে, তাহলে তারা এই ক্ষতি সহজেই এড়াতে পারে। ওই লগ্নীর টাকা অল্পদিনের মধ্যে ফিরে এলে তা চড়া সুদে নতুন করে লগ্নী করে সহজেই তারা আয় বৃদ্ধি করতে পারে এবং এইভাবে ক্ষতি এড়াতে পারে।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "অল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণ দানের নীতি" (Cheap Money Policy) অনুসরণ করে।

১৯৫১ সালে (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে) কোরিয়ায় যুদ্ধের জন্য পৃথিবীব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতি হয়, তা রোধ করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট ৩% থেকে ৩.৫% করে। ১৯৫৭ সালে (দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে) একদিকে পরিকল্পনার উচ্চ-বিনিয়োগের লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে এবং অন্যদিকে সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ" নীতি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্করেট বাড়িয়ে ৪% করে। ১৯৬৩ সালে ব্যাঙ্করেট ৪.৫% হয়। ১৯৬৪ সালে ব্যাঙ্করেট ৫% করা হয়।

তারপর "ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ" নীতির পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "চড়া সুদে ঋণের নীতি" (Dear Money Policy) গ্রহণ করে।

১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে মন্দা (Economic Depression) দেখা দেওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বাড়াবার উদ্দেশ্যে মন্দাবিরোধী আর্থিক নীতি (Anti Depression Policy) গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্করেট কমিয়ে দেয়।

এরপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময় অর্থনীতির অবস্থার পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যাঙ্করেট বাড়িয়েছে অথবা কমিয়েছে।

নব্বই-এর দশকে "বিশ্বায়নের" (Globalisation) শুরুতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্করেট কমার ফলে ঋণের ওপর প্রাথমিক সুদের হারও (Primary Lending Rate) কমে গেছে।

৬০.৩.২ খোলাবাজারী কারবার

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে টাকার বাজার বিকশিত নয় বলে ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যকারিতা কম হওয়ায়, খোলাবাজারী ক্রয়বিক্রয় (Open Market Operations) ঋণ নিয়ন্ত্রণের বেশী উপযোগী।

উন্নতদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সব লগ্নীপত্র ক্রয়বিক্রয় করে (খোলাবাজারে) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলি হল স্বল্পমেয়াদী বেসরকারী বাণিজ্যিক হুন্ডি (Commercial Bills)। কিন্তু ভারতে এই ধরনের স্বল্পমেয়াদী বেসরকারী বাণিজ্যিক হুন্ডির অভাব থাকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী ক্রয়বিক্রয় করতে গিয়ে সাধারণ ট্রেজারী বিল, সরকারী লগ্নীপত্র (Government Securities) এবং অন্যান্য অনুমোদিত লগ্নীপত্র ক্রয়বিক্রয় করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় রিজার্ভ তহবিলের মরশুমীর হ্রাসবৃদ্ধির প্রতিকারকল্পে কিংবা ব্যাঙ্ক কাঠামোর ও টাকার বাজারের শক্তিবৃদ্ধির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী লগ্নীপত্রের খোলাবাজারী ক্রয়বিক্রয় করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রিজার্ভ ব্যামক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করা শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল টাকার বাড়তি চাহিদা মেটানো এবং সরকারী ঋণপত্রের বাজারদর স্থিতিশীল রাখা। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল থেকে উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সংস্থানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে চলেছে, ফলে টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করাটা আর খোলাবাজারী ক্রয়বিক্রয়ের লক্ষ্য নয়। প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ফিসক্যাল বা সরকারী আয়-ব্যয় গত। আশি ও নব্বই-এর দশকে টাকার যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতি বছর একদিকে যত টাকার সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে ঋণ শোধ করা হচ্ছে, তার চাইতে বেশী টাকার ঋণপত্র বিক্রয় করা হচ্ছে। তবে বাজারে টাকার যোগান যাতে বৃদ্ধি না পায়, সে উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নগদ টাকার ঋণপত্রের দাম না দিয়ে নূতন ঋণপত্রের দ্বারা পুরানো ঋণপত্রের দাম শোধ করে। একে বলে "Switch Operation".

৬০.৩.৩ পরিবর্তনীয় জমার অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি

১৯৫৬ সালে (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইন সংশোধন করে পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত (Variable Reserve Ratio) প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই তার দাবী আমানত বা চলতি আমানতের (Demand Deposit) ৫ শতাংশ এবং মেয়াদী আমানতের (Time Depostis) ২ শতাংশ সবসময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে এই জমার অনুপাত চাহিদা আমানতের ক্ষেত্রে ৫-২০ শতাংশ এবং মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে ২-৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। ১৯৬০ সালে ঋণের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ ও মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থারূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম এই নীতির প্রয়োগ করে।

১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইনের সংশোধন করে স্থির হয় যে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককেই মোট আমানতের ৩ শতাংশ সর্বদা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে ৩-১৫ শতাংশ পর্যন্ত এই জমার অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে।

১৯৬৪ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে যে ব্যাঙ্করেট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যদি কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ করতে চায়, তবে তাকে নীট সর্বনিম্ন ২৮ শতাংশ নগদ জমার অনুপাত (Net Minimum Liquidity Ratio) রাখতে হবে।

১৯৭৫ সালে নীট সর্বনিম্ন নগদ জমার অনুপাতের নিয়ম তুলে নেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দিষ্ট নগদ জমার অনুপাত এবং বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio) বজায় রাখতে হয়।

বিধিবদ্ধ নগদ জমার অনুপাত—

ভারতে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনীয় নগদ জমার অনুপাত পদ্ধতির ব্যর্থতা থেকে ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়রূপে বিধিবদ্ধ-নগদ জমার অনুপাত পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে,

$$\text{Statutory Liquidity Ratio বা SLR} = \frac{ER + I + CB}{L}$$

এখানে ER = Excess Reserve বা অতিরিক্ত রিজার্ভ

I = দায়মুক্ত সরকারী এবং অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ।

CB = Current Account Balance (অন্যান্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে)।

L = Liability বা মোট মেয়াদী এবং দাবী আমানতের দায়।

যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ কমপক্ষ ৫ লক্ষ টাকার সমান, তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্করূপে (Scheduled Banks) পরিগণিত হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি এবং আরও ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তার নিজস্ব মোট আমানতের ৯ শতাংশ নগদ টাকায় জমা (Cash Reserve Ratio) রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২০০০ সালের মে মাসে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নগদ রিজার্ভ অনুপাত (CRR) ৮ শতাংশ রাখা ছাড়াও নিজের হাতে আমানতের ৬৫ শতাংশ নগদ রাখতে পারে। এই রিজার্ভ অনুপাত ছাড়াও ১৯৯০ সালের মে মাস থেকে দাবী আমানত এবং মেয়াদী আমানতের অতিরিক্ত বৃদ্ধির উপর আরও ১০ শতাংশ নগদ জমার (Incremental Cash Reserve Ratio) অনুপাত রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া নগদ টাকায় সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, এইরকম ঋণপত্র, সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রা বা নগদ টাকার ৩৮.৫ শতাংশ (১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে) বিধিবদ্ধ নগদ জমার অনুপাত হিসাবে রাখতে হত।

তবে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ কমার ফলে এবং সরকারী সিকিউরিটি বাজারের উন্নতিকল্পে বর্ধিত হিসাবের ভিত্তিতে (Incremental Basis) অতিরিক্ত জমার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ জমার অনুপাত কমানো হয়েছে। নরসিমহাম কমিটির সুপারিশে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ অনেক কমে গেছে।

৬০.৩.৪ নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিতে পারে, যেমন—

১. কী কী উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া যাবে বা যাবে না,

২. ঋণ দিতে হলে তার সবাধিক পরিমাণ কত হবে,

৩. কোন কোন ঋণের উপর মার্জিন অনুপাত কত হবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত 'ঋণের মার্জিন পরিবর্তনের' ওপরেই নির্ভর করে। তাই এই পদ্ধতির প্রয়োগ এখনও সীমাবদ্ধ।

৬০.৩.৫ নৈতিক প্রণোদন

নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion) একটি আপেক্ষিকভাবে নরম ধরনের নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এই পদ্ধতির সঙ্গে কোন আইনের সম্পর্ক নেই। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ বা পরামর্শ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে উপেক্ষা করা সহজ নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে ভালভাবে সহযোগিতা করে তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রতি নানাধরনের সুপারিশ, নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে থাকে।

৬০.৩.৬ ঋণ অনুমোদন প্রকল্প

১৯৬৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি ঋণ অনুমোদন প্রকল্প (Credit Authorisation Scheme বা CAS) প্রবর্তন করে (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা ঋণের অগ্রিম অনুমতি দান)। অবশ্য ১৯৮৮ সাল থেকে খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়ের ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অগ্রিম অনুমোদন প্রকল্পটি (CAS) তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণে ঋণ দিলে তা শুধু ঋণ দেবার পরেই যাচাই করা হয় (Post-Sanction Scrutiny)। এই নতুন ব্যবস্থাকে ঋণ তদারকি ব্যবস্থা (Credit Monitoring Scheme) বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সবকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা আর্থিক পরিচালনা পদ্ধতি (Methods of Credit Control বা Monetary Management of the RBI) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য আর্থিক বাজারের গঠনের ওপর এই পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতের অর্থের বাজারের সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশের মধ্যে ভাল সংযোগ না থাকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অনেক সময়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের চিরাচরিত পদ্ধতিগুলিকে দেশের উপযোগী করে পরিমার্জিত (Moderated and Adjusted) রূপে এদের প্রয়োগ করতে হয়েছে।

৬০.৩.৭ সুদের হার সম্পর্কিত নীতি

ব্যাঙ্কের সুদের হার (Rate of Interest) কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ১৯৮২ সালে দেশের মুদ্রা সম্পর্কিত ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ দেওয়ার জন্য সরকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শ্রী সুখময় চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। (Sukhomoy Chakravorty Committee Regarding the Working of the Monetary System)।

এই কমিটির প্রধান সুপারিশ হল—

১. সরকারী মেয়াদী সিকিউরিটি এবং ট্রেজারী বিলের ওপর সুদের হার বাড়াতে হবে যাতে ব্যাঙ্কের বাইরে ঋণদাতাদের এই সিকিউরিটি কেনার জন্য আকৃষ্ট করা যায়।

২. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬০ দিন অথবা ততোধিক মেয়াদের ব্যাঙ্ক আমানতের জন্য যে সুদ ধার্য করে থাকে এবং সেই সময়ের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ দেওয়ার জন্য যে সুদ ধার্য করে থাকে, এই দুটির মধ্যে ৩ শতাংশ হারে ব্যবধান রাখা উচিত বলে চক্রবর্তী কমিটি সুপারিশ করেন।

৩. পাঁচ বছরের মেয়াদী অথবা তার বেশী সময়ের জন্য জনসাধারণ ব্যাঙ্কে নির্দিষ্ট আমানত রাখলে তার সুদ এমনভাবে ধার্য করতে হবে যাতে আমানতের মেয়াদ অন্তে চুক্তি অনুযায়ী সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত ২ শতাংশ প্রকৃত আয় (Real Return) পাওয়া যায়। চক্রবর্তী কমিটির এই সুপারিশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. চক্রবর্তী কমিটির মতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিকে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে সুদের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

৫. এই কমিটি বিল বাজারের উন্নয়নকল্পে বিলের বিপক্ষে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণের ওপর সর্বনিম্ন সুদের চেয়ে বার্ষিক আরও ২ শতাংশ হারে কম সুদ ধার্য করার সুপারিশ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদক্ষেপ হিসাবে বলা যায়—

১. ১৯৮৯ সালে টাকার বাজারের লগ্নীপত্রের (Usance Bill) ওপর স্ট্যাম্প ডিউটি তুলে দেওয়া হয়েছে।

২. ওই বছরেই টাকার বাজারের সুদের হারের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে।

৩. ১৯৮৮ সালে 'দি ডিসকাউন্ট এ্যান্ড ফিন্যান্স হাউস অব্ ইণ্ডিয়া' (DFHI) স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তপসিলভুক্ত দেশী, বিদেশী সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও সর্বভারতীয় অর্থলগ্নীকারী সংস্থাগুলিকে (সরকারী ও বেসরকারী) টাকার বাজারের মধ্যে আনা হয়েছে। এর ফলে বাজারের সুদের হারে ওই সব আর্থিক সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য ঘটবে।

৬০.৪ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক নীতি

কোন দেশের অর্থব্যবস্থা গঠিত হয় সেই দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও ঋণদানকারী সংস্থা দ্বারা। এই ব্যবস্থার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ, দামস্তরের উত্থান-পতন প্রতিরোধ, ঋণের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ, আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণ—এর সবগুলিই হল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

উন্নতদেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ অর্থ ও ঋণের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ভারতের মত বিকাশশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চিরাচরিত (Traditional) ধারার কাজ ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন,

আর্থিক ক্ষেত্রের বাইরে বিস্তৃত অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্রের (Non-Monetised Sector) অবস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্রকে ক্রমশ আর্থিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়া আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের (Priority Sector) উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ ও অর্থসাহায্য করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থ সম্পর্কিত নীতির উন্নয়নমুখী (Promotional Role of the Monetary Policy of the RBI during the Plan Period) কাজকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়—

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানে RBI এর ভূমিকা (Promotional Role),

২. উন্নয়নের কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং

৩. মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে RBI এর ভূমিকা (Regulatory Role)।

Strategy ও কর্মসূচী এবং উৎপাদন লক্ষ্যের সংগতি থাকে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই RBI ঋণ পরিকল্পনা নীতি চালু করেছে।

আর্থিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক আর্থিক নীতির একটি নূতন বৈশিষ্ট্য হল যে, যে সব ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধন বা সংরক্ষিত তহবিলের সমষ্টি বা নীট সম্পদের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা এবং যারা মুনাফা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ (Profitability Norms) মেনে চলে, তারা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বীমা ব্যবসায়ে নামতে পারবে অর্থাৎ মূলধনের বাজারে (Capital Market) প্রবেশ করতে পারবে। এর দ্বারা RBI অনুমোদিত আর্থিক নীতিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও বেশী সহায়ক হবে।

ওপরে উল্লিখিত বহুবিধ ও বহুমুখী ভূমিকা পালনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একা নয়, রাষ্ট্রাধীন স্টেট ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ২০টি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এই সব কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহকর্মী। ভারতের IDBI থেকে শুরু করে

ঋণদানকারী সংস্থাগুলির সমন্বয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবল সংকীর্ণ ব্যাঙ্ক জগত ও টাকার বাজার নয়, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে সরকারের সর্বপ্রধান শক্তিশালী হাতিয়াররূপে কাজ করে চলেছে। তাই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬০.৫ সারাংশ

কোন দেশের আর্থিক নীতির দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালন করে। পরিকল্পনাকালে ভারতের আর্থিক নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের মোট ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ওপর প্রয়োগ করে।

৬০.৬ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

- **অর্থের বাজার ঃ** স্বল্পমেয়াদী ঋণের লেনদেন সম্পর্কিত বাজার।
- **মূলধনের বাজার ঃ** দীর্ঘমেয়াদী ঋণের লেনদেন সম্পর্কিত বাজার।
- **নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের নীতি ঃ** পরিকল্পনাকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রয়োজনবোধে একই সঙ্গে ঋণের সম্প্রসারণ এবং ওই সম্প্রসারিত ঋণের নিয়ন্ত্রণ।

৬০.৭ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১।(ক) ভারতের টাকার বাজার কাকে বলে?

(খ) ব্যাঙ্ক রেট কী?

(গ) পরিবর্তনীয় রিজার্ভ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

২।(ক) নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

(খ) ভারতে মুদ্রা বা অর্থ সরবরাহের উপাদান কী কী?

(গ) ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা কাকে বলে?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

৩।(ক) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৬০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Reserve Bank Bulletin

২। Currency and Finance — RBI

৩। R. Dutta and Sundaram — Indian Economics.

একক ৬১ □ ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও তার সংস্কার

গঠন

৬১.০ উদ্দেশ্য

৬১.১ প্রস্তাবনা

৬১.২ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সূচনা

৬১.৩ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ— উদ্দেশ্য

৬১.৩.১ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি

৬১.৩.২ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি

৬১.৩.৩ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সাফল্য

৬১.৩.৪ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ—একটি মূল্যায়ন

৬১.৪ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্পর্ক

৬১.৫ অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক মধ্যসংস্থা

৬১.৫.১ ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য

৬১.৫.২ অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা ও তার প্রয়োজনীয়তা

৬১.৬ ভারতে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কার — ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটি

৬১.৬.১ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার— নরসিমহাম কমিটি

৬১.৬.২ সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা

৬১.৬.৩ নরসিমহাম কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশ

৬১.৬.৪ অন্যান্য সুপারিশ

৬১.৭ সারাংশ

৬১.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

৬১.৯ অনুশীলনী

৬০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পর আপনারা ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, জাতীয়করণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্পর্ক, ব্যাঙ্কিং-সংস্কার, নরসিমহাম কমিটি এবং তার সুপারিশ বিষয়ে জানতে পারবেন।

৬১.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার আগেই ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবী ওঠে। ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের দ্বারা এই দাবী কিছুটা পূরণ হয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলির ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালে গোরওয়ালা কমিটি (Gorwala Committee) সমবায় ব্যবস্থার উন্নতি ও গ্রামীণ ঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সুপারিশ করে সেই অনুযায়ী ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয় এবং এটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া (SBI) নামে কাজ আরম্ভ করে। এর দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও পরিকল্পনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে তখনও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান ছিল না। অবশ্য ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত আমানত বীমা নিগম (Deposit Insurance Corporation) আমানত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

৬১.২ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সূচনা

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম যে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছিল না তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

১৯৬৮ সালে ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধন করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) আরোপ করে এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে,

১. বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করা;

২. খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের মত অত্যাবশ্যক পণ্য মজুত এবং ফাটকা কারবারে ব্যবহৃত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা,

৩. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, রপ্তানী বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বেশী পরিমাণে ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান দেওয়া এবং

৪. অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যাঙ্কঋণের উপযুক্ত ব্যবহার করাই ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ঋণ সংস্থা (National Credit Council) স্থাপিত হয়। এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—

১. অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের ঋণের চাহিদার মূল্যায়ন,

২. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং

৩. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও বিনিয়োগ নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ৫০ কোটি বা তার বেশী টাকার আমানত সম্পন্ন ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়।

এই ১৪টি ব্যাঙ্ক হল—

১. দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

২. দি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

৩. দি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।

৪. দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা।

৫. দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক।

৬. দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

৭। দি দেনা ব্যাঙ্ক।

৮. দি সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক

৯. দি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

১০. দি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক।

১১. দি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক।

১২. দি ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র।

১৩. ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক এবং

১৪. কানাড়া ব্যাঙ্ক।

১৯৮০ সালের এপ্রিলে রাষ্ট্রপতির একটি অর্ডিন্যান্স বলে আরও ৬টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ (Nationalisation) করা হয়। এদের প্রত্যেকটির দাবী আমানত ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ অন্তত ২০০ কোটি টাকা অথবা তার বেশী ছিল। এই ব্যাঙ্কগুলি হল—

১. দি অন্ধ্র ব্যাঙ্ক

২. দি করপোরেশন ব্যাঙ্ক।

৩. দি নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

৪. দি ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স।

৫. দি পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এবং

৬. দি বিজয়া ব্যাঙ্ক।

পরবর্তীকালে দি নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

৬১.৩ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ — উদ্দেশ্য

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করা, অর্থাৎ এককথায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে উন্নয়নমুখী (Growth Oriented) করাই ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের (Nationalisation) প্রধান উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির কর্তৃত্বমূলক উচ্চ স্থানগুলি (Commanding Heghts of the Economy) নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের নীতি কার্যকর করে।

৬৩.৩.১ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি ছিল প্রধান—

১. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় আর্থিক সম্বলের অভাব এর দ্বারা অনেকাংশে দূর করা যাবে।

২. ১৯৬৯-এর আগে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট ঋণ ও অগ্রিমের প্রায় ৮৮% দিত বেসরকারী বড় শিল্পপতি ও ফাটকা ব্যবসায়ীদের। ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় তাদের মোট আমানত ছিল ভারতের মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭২ শতাংশ এবং তাদের দেওয়া ঋণের পরিমাণ ভারতের মোট ঋণের ৬৫ শতাংশ ছিল। ব্যাঙ্কের এই একচেটিয়া মালিকানা ও কর্তৃত্বের ব্যাপক সম্প্রসারণ রোধ করার জন্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন ছিল।

৩. ষাট-এর দশকের প্রথম দিকে ভারতের কয়েকটি ব্যাঙ্ক বিপর্যয় (Bank Failure) হয়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস কিছুটা কমে। তাই ব্যাঙ্ক বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে এবং আমানতকারীদের আস্থা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন ছিল

৪. ফাটকা কারবারীরা (Speculator) ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দ্রব্যসামগ্রী মজুত (Hoarding) করে এবং বাজারে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে অনেক মুনাফা করত। উচ্চহারে সুদ পাবার লোভে ব্যাঙ্কগুলি এই ঋণ দিত। এক্ষেত্রে সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়।

৫. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ডিরেক্টররা পরিচালনার অর্ন্তসংযুক্তি (Interlocking of Directorship) দ্বারা সম্পদের অপব্যবহার করতেন। ব্যাঙ্কের সম্পদ দ্বারা তাঁদের পরিচালিত কোম্পানীর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

৬. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ফলপ্রসূ করতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণের প্রয়োজন হয়েছিল।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছে। ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ঋণ, বিনিয়োগ, সবকিছুই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত মূলধনকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করাও ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি।

৮. বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রবণতাই ছিল কম সময়ে বেশী মুনাফা অর্জন করা। এর দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তারল্যের উদ্দেশ্যে (Liquidity Motive) প্রভাবিত হয়। কিন্তু তারল্য ও লাভজনকতা— এই দুটি উদ্দেশ্য পরস্পরের বিপরীত। অর্থাৎ তারল্য বৃদ্ধি পেলে লাভজনকতা কমে, আবার লাভজনকতা বৃদ্ধি পেলে তারল্য কমে। এই অবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উৎপাদনশীল বিনিয়োগ প্রকল্পে কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে চায় না। সেইজন্য মূল ও ভারী শিল্পস্থাপনে ঋণদানের সুবিধাকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা হয়।

৬১.৩.২ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষের যুক্তিগুলিকে আমরা দু'ভাবে আলোচনা করতে পারি। প্রথমত, জাতীয়করণের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে এই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনটির (Bank Nationalisation Act) সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, অন্য দল যাঁরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে তাঁদের মতামতও আলোচিত হবে।

আমরা প্রথমে জাতীয়করণ আইনটির বিপক্ষের যুক্তি আলোচনা করব।

বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ থেকে বাদ দেওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে ও বিশেষত, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের ওপর এদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে। এটা অবাঞ্ছিত। আবার সরকারের দ্বারা ঘোষিত ক্ষতিপূরণের

পরিমাণ ব্যাঙ্কের নিয়োজিত পুঁজির প্রায় ৪ গুণ। ক্ষতিপূরণের এই পরিমাণ অনেকের কাছেই অত্যধিক মনে হয়েছিল।

যাঁরা ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণ সমর্থন করতে পারেননি, তাঁদের মতে,

১. বেসরকারী শিল্প-প্রয়াস ব্যাঙ্কিং সুবিধার অভাবের দরুন ব্যাহত হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার আগেই বেসরকারী শিল্প-প্রয়াস হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন ও ঋণ প্রদানের নিরাপত্তা ও ঋণের অর্থ আদায়ে নিশ্চয়তার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার অর্থ হল সমাজের পক্ষে উপযোগী একটি বেসরকারী শিল্প প্রয়াসকে নষ্ট করা। কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরবর্তী অবস্থা থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা চলে যে এই আশংকা অমূলক।

২. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধীরা মনে করেন যে, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছে— এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে, সরকারের শিল্প-লাইসেন্স নীতি, আমদানী ও রপ্তানী নীতি এবং সরকার পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা গৃহীত ঋণদান নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলিই আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছে। কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাঙ্ক "আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের" দায় অস্বীকার করতে পারে না।

৩. সমতার প্রসঙ্গে বিরোধীদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের মতে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারা কৃষি, সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণের সমস্যার সমাধান করা যায় না। এর জন্য সমবায় সমিতিগুলির যোগ্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. আবার অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের হাতে ব্যাঙ্কগুলি চলে যাবার ফলে আমানতকারীদের কিছু কিছু ব্যাঙ্কিং সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু সরকারী অথবা বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাজের সুবিধা আমানতকারীরা সর্বদা একইভাবে পাবেন কিনা, সেটি ব্যাঙ্কগুলির নিজস্ব পরিচালনার উপর নির্ভরশীল।

৬১.৩.৩ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সাফল্য

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ কতটা সফল হয়েছে (Achievements of Bank Nationalisation), সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সুনিশ্চিত অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৬৯ সালে ১৪টি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী সংস্থাসহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মোট আমানত জমার পরিমাণ দাঁড়ায় দেশের মোট ব্যাঙ্ক-আমানত শাখার প্রায় ৮৮ শতাংশ এবং এদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় দেশের মোট ব্যাঙ্ক শাখা সমূহের প্রায় ৯০ শতাংশ। সারা দেশে, বিশেষত যে সব অঞ্চলে

এ পর্যন্ত কোন ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না (Unbanked Region) সে সব অঞ্চলেও ব্যাঙ্ক অনেক শাখা বিস্তার করেছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের সম্প্রসারণ (Expansion of Bank Credit in the Priority Sector) ঘটেছে। ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্র-ভিত্তিক বণ্টনেরও (Sectoral Deployment of Gross Bank Credit) যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ ছিল নীট ব্যাঙ্ক ঋণের ১৬.৩ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ ছিল নীট ব্যাঙ্ক ঋণের ১৭.৩ শতাংশ। কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, সড়ক পরিবহনের সরঞ্জাম, খুচরো ব্যবসায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, স্ব-নিয়োজিত বৃত্তি এবং শিল্পখাতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণ ছিল মোট ঋণের ৪২.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মোট ব্যাঙ্ক ঋণের ৩৬.৬ শতাংশ পেয়েছিল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলি।

১৯৬৯ সাল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির রপ্তানীকারকদের ঋণ দিতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি তাদের স্থান করে নিয়েছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর থেকেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত আশ্চর্য্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া "লীড ব্যাঙ্ক স্কীম"-এ (Lead Bank Scheme) ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং ৩টি নির্বাচিত বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে, কলকাতা, বৃহত্তর বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, চণ্ডীগড়, গোয়া, দমন ও দিউ বাদে দেশের সমস্ত জেলাগুলিকে ভাগ করে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তার নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়ছে। এই সমীক্ষার অধীন প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তার নির্দিষ্ট এলাকার জেলাগুলির একটি করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা দিতে হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে।

৬১.৩.৪ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ — একটি মূল্যায়ন

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অনেক সুফল ভারতের অর্থনীতি ভোগ করছে. তবুও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরবর্তী ৩২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্যগুলি পুরোপুরি সাধিত হয়নি। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়া যায়নি। অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলিও আশানুরূপভাবে উপকৃত হয়নি। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দৈনন্দিন কাজের তুলনা করলে যোগ্যতার পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনেকের ক্ষেত্রেই লাভের চেয়ে লোকসানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আয় বৃদ্ধি পেলেও ব্যয়ের পরিমাণ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি অনুৎপাদক, অকেজো সম্পদের

পরিমাণ (Non-Performing Assets) বৃদ্ধি পাবার জন্য তারা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করতে পারছে না। আবার, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণদান করা হলেও অনেকক্ষেত্রেই ঋণের টাকা অনাদায়ী থেকে গেছে। এই ব্যাপারে ঋণের টাকা সময়মত আদায় না হলে অথবা ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের দায় এড়িয়ে গেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণের সাহায্যে কেবলমাত্র বড় বড় কৃষকরাই উপকৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নিবিড় যোগাযোগ তাদের নৈতিক মান ক্ষুণ্ণ করেছে। এছাড়া এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

৬১.৪ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্পর্ক

ভারতের শীর্ষ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্পর্ক আলোচনা করার জন্য আর্থিক সংস্থা হিসাবে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন।

কোন একটি দেশের জনসাধারণকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—উদ্বৃত্ত ব্যয়কারী ইউনিট (Surplus Spending Unit) এবং ঘাটতি ব্যয়কারী ইউনিট (Deficit Spending Unit)। এই দুই-এর মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করার জন্য আর্থিক সংস্থাগুলিকে বলা হয় আর্থিক মধ্যস্থতাকারী সংস্থা (Financial Intermediaries)। এদেরকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— ব্যাঙ্কিং সংস্থা (Banking Institutions) এবং অব্যাঙ্কিং সংস্থা (Non-Banking Institutions)। এই উভয়প্রকার সংস্থাই ঘাটতি ব্যয়কারী এককদের ঋণ দেবার কাজে নিযুক্ত হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

যে সমস্ত সংস্থা চাহিবামাত্র ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গীকারে অর্থ জমা রাখে এবং সেই অর্থ ঋণ দেয়, তারাই হচ্ছে ব্যাঙ্ক। বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিশুদ্ধ আর্থিক সংস্থা এবং বিশুদ্ধ আমানতী সংস্থার মিশ্রণের একটি প্রকৃত উদাহরণ।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কাজ ব্যাঙ্ক নোট বা কাগজী নোটের প্রচলন। ১৯৫৬ সালের আগে পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে আনুপাতিক জমা পদ্ধতি (Proportional Reserve System) অনুসরণ করত। বর্তমানে ন্যূনতম জমা পদ্ধতি (Minimum Reserve System) অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্ট নগদ অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অফিস, স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীতে (Currency

Chest) রাখা হয়। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট নগদ টাকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের একটি বড় অংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বহন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার (Exchange Rate) নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা নির্ধারিত বিনিময় হার অনুসরণ করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রাসম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিনভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। এই তিনটি কাজের প্রথমটি হল, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ মজুতের রক্ষণাবেক্ষণ (Custodian of Cash Reserves of Commercial Banks)। দ্বিতীয় দায়িত্ব ঋণ যোগানের শেষ আশ্রয় বা সর্বশেষ ঋণদাতার কাজ (Lender of Last Resort) । অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের সব যুক্তিযুক্ত চাহিদাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে নিকাশী ঘর (Clearing House) হিসাবে কাজ। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে অসংখ্য চেকের লেনদেন হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বড় শহরগুলিতে নিকাশী ঘরের ব্যবস্থা করে এই লেনদেন সহজ করে তুলেছে। এই ব্যবস্থায় একটি ব্যাঙ্ককে অন্য ব্যাঙ্কের কাছে চেক নিয়ে যেতে হয় না। প্রত্যেকেরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে হিসাবের খাতা থাকায় ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের কাছ থেকে নীট পাওয়া নিকাশী ঘরের সাহায্যেই পাওয়া যায়।

আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনা করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে যে ঋণ ভিত্তিক অর্থ বা আমানত অর্থ সৃষ্টি হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬১.৫ অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক মধ্যসংস্থা

ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি মাধ্যম (Intermediary) হিসাবে কাজ করে বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয় আর্থিক মধ্যসংস্থা (Financial Intermediaries)। এই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে ব্যাঙ্ক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অ-ব্যাঙ্ক 'আর্থিক' মধ্যসংস্থা (Non-Bank Financial Intermediaries) বা NFI। এই ধরনের অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা NFI হচ্ছে শিল্প-অর্থ করপোরেশন (IFC), শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI), বীমা কোম্পানী (Insurance Company), শিল্প-ঋণ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICICI) প্রভৃতি।

ভারতে ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্ক সংস্থা-উভয়েই আর্থিক মাধ্যম বা মধ্য-সংস্থা হিসাবে কাজ করলেও এদের মধ্যে কয়েকটি মূল পার্থক্য লক্ষিত হয়।

৬১.৫.১ ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য

ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য হল—

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক চাহিদা আমানতে জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখে এবং চেক কেটে জনসাধারণ সেই আমানত তুলে নিতেও পারে। কিন্তু অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলি শুধু স্থায়ী আমানত গ্রহণ করে এবং এই ধরনের আমানতকে চেক কেটে তোলা যায় না।

২. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। কিন্তু অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, ঋণের মাধ্যমে অর্থের সৃষ্টি করতে পারে। এরা ভারতের অর্থের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ সৃজনের ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতার দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে অর্থের যোগান সৃষ্টি করে, সেই অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা সৃষ্ট নগদ অর্থের চেয়েও পরিমাণে বেশী এবং গুরুত্বের দিক দিয়েও বেশী। এর দ্বারা অর্থের যোগান, বিনিয়োগ, মূল্যস্তর প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রভাবিত হয়। অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থের বাজারে এ রকম কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৪. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বলিত আর্থিক নীতির সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু যেহেতু অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান নয়, সেইজন্য এদের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেই।

অর্থাৎ অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থিতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ও আর্থিক নীতির সাফল্য হ্রাস করে।

৫. কিন্তু অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নেই, এ কথা বললে ভুল হবে। আসলে এই নিয়ন্ত্রণ একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বাধ্যতামূলক জমার অনুপাতের দ্বারা (Compulsory Cash Reserve Ratio) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ করে। অপর দিকে অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা NFI নিজেদের সংগৃহীত আমানতের একটা অংশ দিয়ে সরকারী ঋণপত্র কিনতে বাধ্য হয়।

৬. ব্যাঙ্কের চেয়ে অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুদের হারের গুরুত্ব অনেক বেশী NFI-এর ক্ষেত্রে সুদের হারের কাঠামোর উপরে এই সব প্রতিষ্ঠানের জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ নির্ভর করে।

৭. NFI বা ঋণের দালাল হিসাবে কাজ করে (Broker of Credit)। যেমন জীবনবীমা কর্পোরেশন থেকে যদি কেউ ঋণ নেয়, তাহলে সে স্টেট ব্যাঙ্কের ওপর চেক কেটে সেই ঋণের টাকা দিতে পারে। ঋণ গ্রহীতা স্টেট ব্যাঙ্কে সেই চেক জমা দিয়ে একটি আমানত খুলতে পারে, এবং তার উপর প্রয়োজনমত চেক কাটতে পারে।

৮. ভারতের মত দেশে জনসাধারণ রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কে টাকা রাখে নিরাপত্তা, সুবিধা এবং তারল্যের (Liquidity) জন্য। কিন্তু NFI-তে টাকা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য অধিকতর আয় উপার্জন।

৯. অবশেষে, আমাদের মনে রাখতে হবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গঠন এবং কার্যকলাপের দিক দিয়ে একজাতীয় (Homogeneous)। কিন্তু NFI-এর বিভিন্ন ধরনের কাঠামো থাকতে পারে।

৬১.৫.২ অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থা ও তার প্রয়োজনীয়তা

NFI-দের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং নিয়মাবলী (বিভিন্ন বিষয়) আইন দ্বারা দেশের বিভিন্ন অ-ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী একটি নির্দেশনামায় NFI-এর উপর RBI-এর কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হয়।

NFI-এর উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণগুলি হল—

১. RBI-এর নির্দেশ অনুযায়ী NFI-এর আদায়ীকৃত মূলধনের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আমানত নেওয়া বিধিবদ্ধ করা হয়।

২. NFI কতটা আমানত গ্রহণ করতে পারবে, সেটা বর্তমানে নির্ভর করে ২টি শর্তের (Condition) উপর ক্রেডিট রেটিং (Credit Rating) এবং নীট মালিকানাধীন তহবিল (Net Owned Fund)। এই দুটি শর্তের ভিত্তিতেই NFI আমানত গ্রহণ করতে পারবে। যেমন, যদি ক্রেডিট রেটিং AA হয় (একটি মান-নির্ধারক), তবে দ্বিগুণ এবং যদি ক্রেডিট রেটিং A হয় তবে নীট মালিকানাধীন তহবিলের সমান আমানত দেওয়া যাবে। রেটিং এর নীচে হলে কোনও অ-ব্যাঙ্ক-আর্থিক সংস্থা আর বাজার থেকে টাকা তুলতে পারবে না।

৩. NFI-দের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক Adequacy Ratio ৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করেছে।

৪. এছাড়া সর্বনিম্ন নগদ সম্পদ (Minimum Liquid Asset) ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল থেকে ১২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে এটা হয়েছে ১৫ শতাংশ।

৫. NFI আমানতের উপর সর্বাধিক ১৬ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে পারে। তবে সংস্থাগুলি বর্তমানে এর চেয়ে কম সুদ দিচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, NFI-দের নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীগুলির সঙ্গে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয়— যাতে ক্রেডিট রেটিং বাড়ানো যায়। এই সংস্থাগুলি RBI-এর নির্দেশমত নূতন নিয়মে পুরানো আমানত ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকে।

অ-ব্যাঙ্ক সংস্থাগুলি এখনও RBI-এর দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত নয়। এখানেই এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে (The Necessity to Control the Activities of the NFI)।

৬১.৬ ভারতে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কার— ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটি

ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও এখনও আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অগ্রসর দেশগুলির অনেক পিছনে রয়েছে। সব উন্নয়নশীল দেশের মত ভারতেও আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ও উন্নত নয়।

পরিকল্পনাকালে, বিশেষত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আমানত খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের শাখারও যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলবাজার কর্মসূচীও কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি ব্যাঙ্কগুলির ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণও ক্রমবর্ধমান হচ্ছে।

এ সত্ত্বেও ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিস্তৃতি এখনও সীমাবদ্ধ।

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন সময়ে যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে, তার দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ত্রুটি এবং সেগুলি সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাঙ্কিং কমিশন তার রিপোর্টে

১. কতকগুলি নতুন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে, যেমন— গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Rural Bank), গৃহনির্মাণ-ঋণদানকারী ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

২. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোর অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য তাদের ২টি বা ৩টি সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক এবং ৫টি অথবা ৬টি আঞ্চলিক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করতে হবে।

৩. ব্যাঙ্ক সহ দেশের সমস্ত ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে ঋণসংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ বা সরবরাহের জন্য একটি পৃথক ক্রেডিট ইনটেলিজেন্স ব্যুরো (Bureau) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯৮২ সালে অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি তার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সুপারিশে বলেছে—

১. ঋণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত। ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণ কমিয়ে এনে ঋণ ও বিল বাট্টার মাধ্যমে কার্যকর পুঁজি সরবরাহ করা উচিত এবং বিল বাট্টার মারফত অর্থসংস্থানে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

২. রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি সুদক্ষ টাকার বাজার গড়ে তুলতে হবে।

৩. এ ছাড়া সুদের হারের সমর্থনমূলক ভূমিকার স্বপক্ষে চক্রবর্তী কমিটির জোর সুপারিশ আগেই আলোচনা করা হয়েছে (সুদের হার সম্পর্কিত নীতি)।

সামগ্রিকভাবে কমিটির সুপারিশগুলি নূতন নয়। এই সুপারিশগুলি যথাসম্ভব কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহক-পরিষেবার (Customers' Service) উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ব্যাঙ্কিং কমিশন এবং ১৯৭৫ সালে ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহক পরিষেবা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ বিভিন্ন সুপারিশ করেছিল। ১৯৯০ সালে স্টেট ব্যাঙ্কের তদানীন্তন চেয়ারম্যান এম. এন. গায়পোরিয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহক পরিষেবার উন্নতির উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

৬১.৬.১ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার— নরসিমহাম কমিটি

উদারীকরণ (Liberalisation) ও বিশ্বায়নের (Globalisation) নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে ভারতে অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছে। দেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থা পরীক্ষা করার জন্য এবং এই আর্থিক ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য ১৯৯১ সালে ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এম নরসিমহাম-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে।

নরসিমহাম কমিটির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেশের অর্থ ব্যবস্থা যাতে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা (Competitive Efficiency) অর্জন করতে পারে এবং ঋণ ও বিনিয়োগ নীতি যাতে কোন চাপের অধীন না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া।

কমিটিকে আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার (Financial Sector Reform) সম্পর্কে চারটি বিষয়ে সুপারিশ করতে বলা হয়েছিল।

(ক) দেশের আরও বেশী ঋণের প্রয়োজনীয়তা কার্যকরভাবে মেটানোর জন্য আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে আরও বেশী প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) ব্যয় সংকোচ, জবাবদিহির দায় ও মুনাফা যোগ্যতার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতা কীভাবে বাড়ানো যায়।

(গ) বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কও নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণদাতা সংস্থাগুলিসহ সমগ্র আর্থিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থাগুলির ওপর কীভাবে যথোপযুক্ত ও কার্যকরভাবে তদারকির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায় এবং

(ঘ) উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কমিটি যে সব সুপারিশ করবে, তা বাস্তবে রূপ দিতে গেলে, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব আইন আছে, সে সবের পর্যালোচনাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি সম্পর্কে সুপারিশ করা।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে নরসিমহাম কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি দেওয়া হল—

১. ব্যাঙ্কগুলির মূলধন বৃদ্ধি করা দরকার। লাভজনক অবস্থার ব্যাঙ্কগুলি যাতে বাজারে নতুন শেয়ার ছেড়ে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে, তাদের সেই অনুমতি দেওয়া উচিত। মিউচুয়াল ফান্ড, লাভজনক সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাও যাতে এই শেয়ার ক্রয় করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা উচিত। কমিটি মতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে ক্রমে ৮ শতাংশ মূলধন প্রাচুর্য্য অনুপাত (Capital Adequacy Ratio) বজায় রাখতে পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত।

২. ব্যাঙ্কগুলির ব্যালান্সশীট পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত এবং তার মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি যাতে তাদের পাওনা আদায় করতে পারে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এজন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করে একটি সামাজিক ট্রাইবুন্যাল (Social Tribunal) গঠন করা উচিত।

৩. যাতে ব্যাঙ্কগুলির 'নিকৃষ্ট' ঋণ অথবা "ফেরত পাবার সম্ভাবনা কম" এই ধরনের ঋণ ব্যালান্স শীট থেকে তুলে দিয়ে ফেরত পাওয়া ঋণের টাকা আরও উৎপাদনমূলক সম্পদে নিয়োজিত করা যায়, এজন্য একটি সম্পদ পুনর্গঠন তহবিল (Asset Reconstruction Fund) গঠন করতে হবে। ফেরত পাবার সম্ভাবনা কম— এই ধরনের ঋণ বিশেষ ডিসকাউন্ট সহ অধিগ্রহণ করার বিশেষ ক্ষমতা সম্পদ পুনর্গঠন তহবিলকে (ARF) দেওয়া উচিত। দুর্বল ইউনিটগুলির ক্ষেত্রেও (Sick Units) একই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে। নেতৃস্থানীয় সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংস্থা অথবা নেতৃস্থানীয় সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক (Concerned Lead Bank) যাতে দুর্বল ইউনিটগুলি তাদের আদায়যোগ্য সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে ডিসকাউন্ট সহ অধিগ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪. নরসিমহাম কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠন করা। এ সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশ হল—

(ক) ৩টি অথবা ৪টি বড় ব্যাঙ্ককে (SBI সহ) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হিসাবে গঠন করতে হবে।

(খ) ৮টি অথবা ১০টি জাতীয় ব্যাঙ্ক রাখা, যারা সারা দেশে শাখা প্রশাখার মাধ্যমে কাজ করবে।

(গ) স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(ঘ) গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ সীমিত থাকবে গ্রামীণ এলাকায় এবং তাদের কাজ হবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজে অর্থসংস্থান করা।

(ঙ) ব্যাঙ্কের শাখা খোলার জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা তুলে দেওয়া উচিত।

(চ) আর্থিক সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করা উচিত।

(ছ) এই কমিটি ব্যাঙ্কের বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio) প্রথমে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত এবং পরে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার সুপারিশ করেছেন।

(জ) ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক সংস্থাগুলির সম্পত্তির সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা উচিত এবং তাদের আয় ব্যয় হিসাবে সমস্ত লেনদেনের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

(ঝ) চক্রবর্তী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক রেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুদের হার বিনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

(ঞ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত এবং আধা-স্বশাসিত একটি পৃথক সংস্থাকে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলির তদারকির ভার দেওয়া উচিত।

(ট) শুধু পুনঃ ঋণদানের কাজটি নিজের হাতে রেখে IDBI-এর উচিত সরাসরি ঋণ দেবার কাজটি পৃথক কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া।

৫. কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের একটি অথবা একাধিক সহযোগী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থাকা উচিত যাতে সেই সহযোগী ব্যাঙ্ক গ্রামীণ শাখাগুলি অধিগ্রহণ করতে পারে। কমিটির মতে আর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা উচিত হবে না।

৬. বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও বাধা থাকা উচিত নয় যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারে।

৭. বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক দেশে শাখা অফিস খোলার ক্ষেত্রে আরও উদারনীতি অনুসরণ করা দরকার।

৬১.৬.২ সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা

নরসিমহাম কমিটির সুপারিশগুলি ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলির সংস্কারের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে সরকার যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছে, তা হল—

(ক) নগদ সংরক্ষিত জমার অনুপাত ও বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত— এ দুটিই ক্রমশ কমানো হচ্ছে।

(খ) ১৯৯১-৯২ ব্যাঙ্কিং বছর থেকে ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট ও প্রফিট এণ্ড লস-এর ফর্ম্যাট (Format) পরিবর্তন করা হয়েছে।

(গ) যে সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ১৯৯২ এর এপ্রিল মাসে পুঁজির প্রতুলতা এবং হিসাবরক্ষার কাজে বিচক্ষণতার মান লাভ করেছে তাদের নতুন শাখা খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) আয়-স্বীকৃতি, সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ, অনাদায়ী ঋণ সম্পর্কে ব্যবস্থা ও পুঁজি প্রতুলতা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নতুন ও বিচক্ষণ মান প্রবর্তন করেছে।

(ঙ) বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

৬১.৬.৩ নরসিমহাম কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশ

১৯৯৮ সালে নরসিমহাম কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন (Second Report) প্রকাশিত হয়। কমিটি তার দ্বিতীয় প্রতিবেদনেও সম্পদ পুনর্গঠন তহবিল (ARF) গঠন করার সুপারিশ করেছে।

এছাড়া কয়েকটি দুর্বল ব্যাঙ্ককে চেষ্টার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি "সংকীর্ণ ব্যাঙ্কিং" (Narrow Banking) ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছে।

সম্পদ ও দায়ের (Asset and Liability) মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে এবং আমানতকারীরা যাতে ব্যাঙ্কের দুর্বলতার জন্য আমানত তুলে না নেয়, সেজন্য সংকীর্ণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে, এ ধরনের সম্পদ এই ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নগদ টাকা সংগ্রহে সাহায্য করতে পারে এবং অনুৎপাদক বা অকেজো সম্পদের (Non-performing Assets) বোঝা লাঘব করতে সাহায্য করতে পারে।

এই কমিটির মতে, দুর্বল ব্যাঙ্কগুলি যদি এভাবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে না পারে, তবে ওই ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বড় বড় লাভজনক ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া উচিত নয়।

এছাড়া কমিটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে কয়েকটি বড় বড় ব্যাঙ্ককে একত্রিত (Merger) করে একটি ব্যাঙ্কে পরিণত করার সুপারিশ করেছে।

বর্তমানে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ১০৯টি ব্যাঙ্ক "দুর্বল" ব্যাঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক উদার অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে নরসিমহাম কমিটির সুপারিশগুলি সঙ্গতিপূর্ণ। নতুন করে আর কোন ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না।

৬১.৬.৪ অন্যান্য সুপারিশ

১৯৯৯-এ দুর্বল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভার্মা কমিটির সুপারিশগুলি (Recommendations of the Verma Committee for Reconstruction of Sick Nationalised Banks, 1999) হল—

১. ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থা বিবেচনার জন্য ভার্মা কমিটি ৩টি ক্ষেত্রে মোট ৭টি মাপকাঠি চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল—

(ক) আর্থিক স্বচ্ছলতা (Solvency), যার মাপকাঠি হবে মূলধন প্রাচুর্য্য অনুপাত (Capital Adequacy Ratio) এবং ব্যাঙ্কের ব্যবসার আওতার অনুপাত (Coverage Ratio)।

(খ) উপার্জন করার ক্ষমতা (Earning Capacity)—যার মাপকাঠি হবে সম্পদের ওপর প্রতিদান (Return on Assets) এবং নীট সুদ মার্জিন (Wet Interest Margin)।

(গ) লাভজনকতা (Profitability), যার মাপকাঠি হবে কার্যকর মুনাফা ও গড় কার্যকর তহবিলের অনুপাত (Ratio of Operating Profit to Average Working Funds)।

(ঘ) ব্যয় এবং আয়ের অনুপাত (Ratio of Cost to Income)।

(ঙ) কর্মচারীদের জন্য ব্যয়।

(চ) নীট সুদ আয়।

(ছ) অন্যান্য আয়ের অনুপাত (Ratio of Staff Cost to Net Interest Income Plus All other Income)।

২. ওপরের এই ৭টি মাপকাঠিকে নরসিমহাম কমিটির দেওয়া সুপারিশগুলির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য উপরোক্ত অনুপাতগুলিকে ভিত্তি করা যেতে পারে।

৩. ব্যাঙ্কগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এমনভাবে করতে হবে যাতে মূলধন সম্পদ অনুপাত (Capital Asset Ratio) সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় স্তর থেকে যথেষ্ট বেশী থাকে। দুর্বল ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে একটি আর্থিক পুনর্গঠন কর্তৃপক্ষ (Financial Restructuring Authority) গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৪. ব্যাঙ্কের অকেজো সম্পদ (Non-Performing Assets) সম্পর্কে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করার সময় সংস্কারের গ্যারান্টি, সালিশী, উপদেষ্টা কমিটির (Settlement Advisory Committee) সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে অকেজো সম্পদ কমানো এবং তা সম্পদ পুনর্গঠন তহবিলে (ARF) স্থানান্তরিত করার দিকটি বিবেচনা করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সহ আর্থিক ব্যবস্থার উদারীকরণ ও সংস্কার সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের অন্যতম।

৬১.৭ সারাংশ

অনেকদিন থেকে ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হলেও অবশেষে ১৯৬৯ সালের জুলাইতে ১৪টি বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়। এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পর্ক খুবই গভীর। ব্যাঙ্ক ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতিককালে ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত নরসিমহাম কমিটির ২টি প্রতিবেদনই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৬১.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

লীড ব্যাঙ্ক স্কীম ঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলিকে ভাগ করে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তার নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরিকল্পনা।

নিকাশী ঘর ঃ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে অসংখ্য চেকের লেনদেনের কাজ সহজ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকাশী ঘর হিসাবে কাজ করে।

প্রাথমিক আমানত ঃ কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ আমানত হিসাবে রাখলে সেই আমানতকে বলা হয় প্রাথমিক আমানত।

উদ্ভূত আমানত ঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সৃষ্ট আমানতকে বলা হয় উদ্ভূত আমানত।

ব্যাঙ্কের "নিকৃষ্ট" ঋণ ঃ 'নিকৃষ্ট' ঋণের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির যে ঋণ ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা কম।

৬১.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১।(ক) ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোন বছরে শুরু হয়েছিল?

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ২টি উদ্দেশ্য বল।

(গ) অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

(ঘ) নরসিমহাম কমিটির প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদন কোন কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

২।(ক) ব্যাঙ্ক ও অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য কী?

(খ) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলি বল।

(গ) অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

৩। (ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

(খ) নরসিমহাম কমিটির প্রধান প্রতিবেদন আলোচনা কর। কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বল।

(গ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সম্পর্ক আলোচনা কর।

৬১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Reserve Bank Bulletin.

২। Aloke Ghosh — Indian Economics.

৩। R. Dutta and Sundaram — Indian Economics.

৪। Mishra and Puri — Indian Economics.

একক ৬২ ❑ ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান সমস্যাবলী—স্থিতিশীলতা

গঠন

৬২.০ উদ্দেশ্য

৬২.১ প্রস্তাবনা

৬২.২ সমষ্টিগত অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার যৌক্তিকতা

৬২.৩ স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি

৬২.৩.১ কোষাগার ঘাটতি

৬২.৩.২ রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

৬২.৪ ঘাটতি কমাবার পন্থা

৬২.৪.১ কর কাঠামোর সংস্কার

৬২.৪.২ ভর্তুকির হার কমানো

৬২.৪.৩ বেতন ও কর্মসংস্থান

৬২.৪.৪ কররাজস্ব ভিন্ন আয়

৬২.৪.৫ সরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ও সুদের পরিমাণ কমানো

৬২.৫ মূল্যস্তর ও মুদ্রাস্ফীতি

৬২.৬ বৈদেশিক লেনদেনে পরিবর্তন

৬২.৬.১ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

৬২.৬.২ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ

৬২.৬.৩ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

৬২.৬.৪ টাকার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতি

৬২.৭ সারাংশ

৬২.৮ অনুশীলনী

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার সময়ে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- স্থিতিশীলতা বলতে সমষ্টিগত অর্থনীতিতে কি বোঝানো হয়।
- বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতির গুরুত্ব
- সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও তাদের প্রভাব—
- এই প্রসঙ্গে কোষাগার ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৬২.১ প্রস্তাবনা

সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার পরিভাষায় কোনোদেশে যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কোষাগার ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং চলতি খাতের ঘাটতির হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তবে তাকে অস্থিতিশীল অর্থনীতি বলে মনে করা হয়। এইরূপ অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করি যার মূল উদ্দেশ্য হলো মুদ্রাস্ফীতির হার কমানো, কোষাগার ঘাটতি (fiscal deficit) এবং চলতি খাতের ঘাটতিকে (Current account deficit) এক সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নস্তরে বেঁধে রাখা।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভারতীয় অর্থনীতিতে ১৯৯১ সালের পর থেকে এক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যেকোনো অর্থনৈতিক সংস্কারের সাফল্য নির্ভর করে পরিপূরক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতির উপর, কারণ কিছু কিছু সংস্কার পদ্ধতি অর্থনীতির ভারসাম্যকে নষ্ট করতে পারে। যেমন বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক হ্রাস সরকারের আয়কে কমিয়ে দেয়। আবার কিছু কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও করে থাকে। যেমন লোকসানকারী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংস্কার সরকারের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায় যে স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় এবং পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৬২.২ সমষ্টিগত অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার যৌক্তিকতা

ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়, ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার জন্য। ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার কমে দাঁড়ায় এক বিলিয়ন আমেরিকান ডলারে, (যা দুই সপ্তাহের আমদানির সমান)। এর ফলে বিদেশী স্বল্পকালীন বিনিয়োগকারীদের কাছে, ভারতের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, এবং স্বল্পকালীন বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি (১২%), কোষাগার ঘাটতির আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের (GDP) ১০% এবং বৈদেশিক

লেনদেনের (BOP) চলতি খাতে (Current Account) ঘাটতি (আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ৩ শতাংশে)। এই সময় বৈদেশিক ঋণ এবং আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই সংকট কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যায়, ১৯৮০-এর দশকে ভারতের অর্থনীতির অবস্থা যথেষ্ট ভালো ছিল। এই সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫৫%, শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার ছিল ৮%। এছাড়া কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু এরই সাথে, বৈদেশিক লেনদেনের চলতি খাতে ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছিল, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে এই ঘাটতি রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৪০% শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ঘাটতি মূলতঃ মেটানো হয় বিশ্ব অর্থভাণ্ডার (IMF) এবং বাজার থেকে স্বল্পকালনী ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব, যদি আন্তর্জাতিক ঋণের বাজারে ঋণদাতাদের ভারতের প্রতি আস্থা অটুট থাকে। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে ভারতের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং ভারত এক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এই অবস্থার জন্য বিদেশী মুদ্রা বিনিময়মূল্য সংক্রান্ত নীতিও খানিকটা দায়ী ছিল। এই সময়ে ভারতের পক্ষে নতুন ঋণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এবং বহু ঋণদাতা তাদের অর্থ প্রত্যাহার করে নেন, যার ফলে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এছাড়া এই সময়ে কোষাগার ঘাটতিও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৮৫-৮৬ সালে কোষাগার ঘাটতি বেড়ে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের ৮৩ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়. এই সময়ে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৩.৫%। অত্যধিক রাজস্ব ঘাটতির ফলে, সরকারি ঋণের এক বৃহৎ অংশ রাজস্ব ব্যয় মেটাতেই চলে যায়। এর ফলে অনুৎপাদক ঋণ-এর সুদের বোঝা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এছাড়া ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে সরকারের পক্ষে ভর্তুকি ও বিভিন্ন অনুৎপাদক ব্যয় কমানো সম্ভব হয়নি। যার ফলে ঘাটতির হার এবং সরকারের ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে। এর ফলস্বরূপ মূল্যস্তর এবং চলতি খাতে ঘাটতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৯১-এর জুন মাসে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে। এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে ভারতের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া ৮০-এর দশকে জাতীয় আয়ের যে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল তার পিছেনও অর্থনৈতিক কার্যনীতির কিছু পরিবর্তনের প্রভাব ছিল। (যেমন শিল্পক্ষেত্রে এবং বিদেশী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উদারীকরণ)। এইসব কারণে ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রশ্নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে আপনারা জানবেন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কি কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬২.৩ স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি

১৯৯১ সালের নতুন সরকার অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতা রক্ষার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোষাগার ঘাটতির হার রোধ করা, মুদ্রাস্ফীতির হার কমানো এবং বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি রোধ করা, এবং একই সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।

৬২.৩.১ কোষাগার ঘাটতি

সরকারি খাতে ভারসাম্যহীনতার সূচক হিসেবে কোষাগার ঘাটতিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোষাগার ঘাটতি বলতে মূলতঃ এক বছরে নেট সরকারি ঋণের পরিমাণকে বোঝানো হয়। কিন্তু অনেকের মতে এই সূচক প্রকৃত ভারসাম্যহীনতার মাত্রাকে বোঝাতে পারেনা। কেননা যে কোনো অর্থনীতিতে উৎপাদক মূলধনী ব্যয়ের হারকে কমিয়ে কোষাগার ঘাটতির হারকে কমানো যায়। সুতরাং কোষাগার ঘাটতি কমলেই যে রাজস্ব খাতে ঘাটতি কমছে তার কোনো অর্থ নেই।

সারণী—১

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি পরিস্থিতি

(সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে)

বৎসর	রাজস্ব খাতে ঘাটতি	কোষাগার ঘাটতি
১৯৮৫-৮৬	২.২	৮.৩
১৯৮৬-৮৭	২.৭	৯
১৯৮৭-৮৮	২.৭	৮.১
১৯৮৮-৮৯	২.৭	৭.৮
১৯৮৯-৯০	২.৬	৭.৮
১৯৯০-৯১	৩.৫	৮.৪
১৯৯১-৯২	২.৬	৫.৯
১৯৯২-৯৩	২.৬	৫.৭
১৯৯৩-৯৪	৩.৭	৬.৯
১৯৯৪-৯৫	৩.০	৫.৬
১৯৯৫-৯৬	২.৪	৪.৯
১৯৯৬-৯৭	২.৩	৪.৭
১৯৯৭-৯৮	৩	৫.৭
১৯৯৮-৯৯	৩.৪	৫.৯
১৯৯৯-২০০০	৩.৭	৫.৫
২০০০-২০০১	৩.৬ (সংশোধিত)	৫.১ (সংশোধিত)

সূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট, অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Survey), Report on Currency and Finance ১৯৯৮-৯৯—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (১৯৯৯)।

আশির দশকের দ্বিতীয় ভাগে, সরকারি খাতে ভারসাম্যহীনতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং গড় কোষাগার ঘাটতির হার বেড়ে দাঁড়ায় আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ৮.২ শতাংশে। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯২-৯৩)। ১৯৯১ সালের পর গড় কোষাগার ঘাটতি দাঁড়ায় আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ৫.৭ শতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে মনে

হতেই পারে যে সরকারি সংস্কার সংক্রান্ত নীতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনছে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ কোষাগার ঘাটতি কমলেও রাজস্ব খাতে ঘাটতি যথেষ্ট বেশী (সারণী—১)। সুতরাং সরকার চলতি খাতে তার নিজস্ব ব্যয় কমাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর অর্থ নিম্ন কোষাগার ঘাটতির হার পাবার জন্য সরকার উৎপাদক মূলধনী ব্যয় ছাঁটাইয়ের পথ গ্রহণ করেছে। ১৯৯১ সালের পর কোষাগার ঘাটতির সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রথমত : ১৯৯১-এর আগে পর্যন্ত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুনাফা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ককে দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে সরকারি কোষাগারে জমা হয়।

দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের ফলে প্রাপ্ত অর্থ সরকারের আয় হিসেবে গণ্য হয়।

তৃতীয়ত : ১৯৯৯ সাল থেকে ঘাটতির সংজ্ঞায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের জমা অর্থ থেকে রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণকে বাদ দেওয়া হয়।

এই তিনটি কারণেও কোষাগার ঘাটতির হার খাতায় কলমে অনেক কমে গেছে। রাজস্ব খাতে উচ্চ ঘাটতির হার বোঝায় যে সরকার তার নিজস্ব ভোগব্যয় কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্কার পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র রপ্তানি ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য ও সার ভর্তুকির হারে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়নি। এর সঙ্গে কর রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছিল না। এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে সরকারের মোট ব্যয়-এর অনুপাতে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৯০-৯১ সালে ছিল ৩০.১৮ শতাংশ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১.৮ শতাংশে। (সারণী ২ দর্শনীয়) সরকারি মূলধনী ব্যয় হ্রাসের ফলে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ব্যহত হয়েছে, এবং এর ফলে সমগ্র শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

সারণী— ২

কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়

বৎসর	মূলধনী ব্যয় (সামগ্রিক ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে)	মূলধনী ব্যয় (আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে)	সামগ্রিক ব্যয় (আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে)
১৯৮৫-৮৮	৪০.৪	৮.২	২১.৫
১৯৯০-৯১	৩০.২	৫.৫	১৮.১
১৯৯৪-৯৫	২৪	৩.৭	১৫.৫
১৯৯৫-৯৬	২১.৫	৩.২	১৪.৬
১৯৯৬-৯৭	২০.৯	৩	১৪.৩
১৯৯৭-৯৮	২২.৩	৩.৩	১৪.৮
১৯৯৮-৯৯	২১.৮	৩.৬	১৬
১৯৯৯-২০০০	১৬.৫	২.৩	১৪.২

সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Survey) ১৯৯৮-৯৯—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (১৯৯৯)। (পূর্বে উল্লেখিত)

এছাড়া লক্ষ্য করা গেছে যে সংস্কার পরবর্তী সময়ে সামাজিক ক্ষেত্রে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র) সরকারি ব্যয় কমানো হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি কোষাগার ঘাটতির হার কমালেও তা সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে সুফলদায়ক নাও হতে পারে।

এতক্ষণ আমরা কেন্দ্রের আয়ব্যয় সংক্রান্ত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা রাজ্য সরকার গুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবো।

৬২.৩.২ রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়েও খারাপ। ভারতের রাজ্যগুলিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, এবং কৃষি উন্নয়নের কাজের জন্য অর্থব্যয় করতে হয়। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্গতি দরকার। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতে কেন্দ্র রাজ্য কর বাবদ অর্থ সংস্কারের নীতির মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। রাজ্য সরকারগুলি আয়করের অংশ পেয়ে থাকে যা বাণিজ্য শুল্ক (যা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের প্রাপ্য) জাতীয় করের তুলনায় কম সক্রিয়। রাজ্যগুলি মূলতঃ কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর বেশি নির্ভরশীল। এছাড়া রাজ্যগুলি বিক্রয় কর আরোপ করতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতি ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়েরই স্বার্থবিরোধী। সর্বোপরি বর্তমানে রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের হার বাড়াবার জন্য বিভিন্ন রাজ্য বিক্রয়করের ছার ঘোষণা করছে। কিন্তু এর ফলে শিল্পস্থাপনের পরিবর্তে করদাতার অর্থ বিনিয়োগকারীদের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে না। দেশের বাজারেও ঋণ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রের অনুমতি প্রয়োজন, যদি রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছে অথবা কেন্দ্রের জমিদারিতে কোনোভাবে ঋণগ্রস্থ থাকে। এই সব কারণে ঘাটতি মেটাবার জন্য রাজ্যগুলি মূলধনী ব্যয়ের অংশ চলতি খাতে ব্যয় করে অথবা পরোক্ষভাবে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। যেমন রাজ্যগুলি বহুক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেয় অর্থ আটকে রাখে। (যেমন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (NTPC), কোল ইন্ডিয়াকে প্রদেয় অর্থ দিতে অস্বাভাবিক দেরি করে)। যেহেতু সকল রাজ্য সরকারগুলি একই সুদে কেন্দ্রের কাছ থেকে ঋণ পেয়ে থাকে, তাই ঋণ পরিশোধ করার জন্য তারা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করে না। তাছাড়া জনদরদী নীতির কারণে রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের হার অত্যন্ত বেশি। এই কারণে রাজ্য সরকারগুলির বেতন বাবদ ব্যয় অত্যন্ত বেশি। এই কারণে রাজ্য সরকারগুলির কোষাগার ঘাটতির হারও অত্যন্ত বেশি। এছাড়া কোষাগার ঘাটতি এবং রাজস্ব খাতে ঘাটতির অন্যতম কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় অস্বাভাবিক ক্ষতি। সুতরাং স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ক্ষতির পরিমাণ কমানো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম—

(১) কোষাগার ঘাটতির হার কমলেও রাজস্ব খাতে ঘাটতির হার বিশেষ কমেনি।

(২) কর কাঠামোর ত্রুটির কারণে রাজ্যগুলির আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি অত্যধিক ব্যয়ের কারণে তাদের ঘাটতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) সরকারের সঞ্চয়ের হার অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয় অথবা সামাজিক ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে সরকারে ঘাটতি কমানো হতে পারে যা সামগ্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিকর।

৬২.৪ ঘাটতি কমাবার পন্থা

এই অনুচ্ছেদে আমরা ঘাটতি কমানোর বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোনা করবো। সরকারি ঘাটতির মূল সমস্যা অত্যধিক সরকারি ব্যয়; যা কর রাজস্ব অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। কিন্তু স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হলে সরকারি খাতে ঘাটতি অবশ্যই কমাতে হবে। এর মূল পথগুলি নিচে আলোচনা করা হলো।

৬২.৪.১ কর কাঠামোর সংস্কার

সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য কর কাঠামোর সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ আশির দশকে ভারতীয় কর কাঠামোয় তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়।

- জাতীয় আয়ের সঙ্গে কর রাজস্বের অনুপাত একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে আটকে যায়। এই অনুপাত বজায় রাখার জন্য করের হার ক্রমশ বাড়তে থাকে।
- কর রাজস্বের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য কর কাঠামোতে পরোক্ষ করের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।
- ভারতের কর কাঠামো অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা উৎপাদন এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে সঠিক পথে চালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এইসব কারণে ১৯৯১ সালে, রাজ্য চেলাইয়ার সভাপতিত্বে এক কর সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। এই অনুচ্ছেদে খুবই সংক্ষেপে আমরা কর সংস্কারের মূল কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। ভারতের মতো দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর কাঠামোর সংস্কার অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল কাজ। এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের পরিমাণ ১৯৯০-৯১ সালে আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ২.৩ শতাংশে দাঁড়ায় যা বাণিজ্য শুল্ক থেকে প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে কম। ১৯৫০ সালে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ছিল কর রাজস্বের ৪০ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট অনুসারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩১ শতাংশে। কর সংস্কার কমিটি মূলতঃ নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করেছে।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে স্বল্পসংখ্যক "প্রশস্ত ভিত্তির" (broad based) কর আরোপ করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আয়করের ক্ষেত্রে কর কমিটি প্রান্তিক কর হার কমিয়ে ৪০ শতাংশ করতে বলেছে। এবং এক ত্রিস্তরীয় কর কাঠামো চালু করার কথা বলা হয়েছে যেখানে ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হবে। (অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় পিতা অথবা মাতার আয়ে যুক্ত হবে)।

তৃতীয়তঃ দীর্ঘকালীন মূলধনী আয়ের উপর মূল্যস্তরে পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি মাত্র হারে কর আরোপ করা উচিত। এই কমিটি সম্পদ কর উঠিয়ে দেবার পক্ষে ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় নব্বই-এর দশকে আয়করের হারে যথেষ্ট সরলীকরণ করা হয়েছে, এবং কর হার অনেক কমানো হয়েছে যাতে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা কমে। কিন্তু সেইসঙ্গে বিভিন্ন বাজেটে কর ছাড়ের হারকে ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে যা কর রাজস্ব বৃদ্ধির পরিপন্থী। তাছাড়া ভারতে এখনও কৃষিক্ষেত্রে জাত আয়কে কর কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্যক্ষ করের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ করের কাঠামোতেও বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রথমতঃ কর সংস্কার কমিটি কেন্দ্রীয় পণ্যমাশুল (Union Excise duty) কে ভ্যালু অ্যাডেড কর (Value Added Tax)-এ রূপান্তরিত করার জন্য সুপারিশ করেছিল। এই করে তিনটি হারের কথা বলা হয়েছে (১০, ১৫, ২০ শতাংশ) এছাড়া কিছু কিছু ভোগ্যপণ্যের উপর বিশেষ পণ্যমাশুল আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আমদানি শুল্কের কাঠামো সরলীকরণ ও শুল্ক হারে হ্রাস করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কাঁচামাল, ধাতব পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থর উপর আমদানি শুল্কের হার যথেষ্ট বেশী আছে।

তৃতীয়তঃ ভারতে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে, সেবা ক্ষেত্রে কাজের উপর কোনো কর ছিল না। কিন্তু বর্তমানে টেলিফোন পরিসেবা, শেয়ার দালালের পরিসেবা, যাত্রী পরিসেবা, হোটেল পরিসেবা, ইত্যাদির উপর পরোক্ষ কর আরোপ করা হয়েছে।

কর সংস্কার কমিটি রাজ্য সরকাগুলির বিক্রয় কর কাঠামোতেও সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভ্যালু অ্যাডেড কর চালু করার পরিকল্পনা। ভ্যালু অ্যাডেড কর (VAT) এ ধরনের অ্যাড ভালোরেম (ad valorem) কর যা আভ্যন্তরীণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনস্তরের প্রতিক্ষেত্রে এবং বিক্রয়স্থানে ধার্য করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক স্তরে এই কর মূল্যযোগের (Value added) উপর ধার্য করা হয়ে থাকে। করকমিটি কেন্দ্রীয় স্তরে পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষেত্রে এবং সেবা ক্ষেত্রে এই কর আরোপের কথা বলেছে। সেবা ক্ষেত্রে যে সব পরিসেবা রাজ্য সরকারের করের আওতার বাইরে আছে, সেগুলিকে, এই করের আওতায় আনা হবে। ২০০০ সালের বাজেটে সরকার কেন্দ্রীয় ভ্যালু অ্যাডেড কর বা CENVAT আরোপ করে। এর হার ছিল ১৬% এবং ২৪%। ২০০১সালের বাজেট অনুসারে সামগ্রিক পণ্য মাসুল বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ৬৮% CENVAT-এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার আরোপিত কর কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন। রাজ্যগুলির আয়ের মূল সূত্র ছিল বিক্রয়কর। আন্তরাজ্য পণ্য চলাচলের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন (Central Sales Tax Act, 1956) অনুসারে কর আরোপিত হয়। এই বিক্রয়কর কাঠামোয় অনেক দুর্বলতা আছে। এই কর মূলতঃ পণ্যের সামগ্রিক মূল্যের উপর আরোপ করা হয়। এবং এই ক্ষেত্রে কাঁচামাল এবং উপাদানের উপর যে কর প্রদান করা হয়েছে, তা বাদ দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ এই কর কাঠামোতে স্বচ্ছতার অভাব আছে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়কর বিভিন্ন হারে আরোপ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এইসব হারের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কর হারের স্ল্যাব (Slab) বিভিন্ন রাজ্যে ৬ শতাংশ থেকে ১৫

শতাংশের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া, বিক্রয়কর ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য অতিরিক্ত বিক্রয়কর টার্নওভার (Turnover) কর এবং সারচার্য আরোপ করে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের কর কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। চতুর্থতঃ বিভিন্ন কাঁচামাল এবং উপাদানের উপর কর আরোপ করার জন্য উৎপাদকরা উল্লম্ব সংযুক্তি (Vertical integration) দিকে ঝুঁকছেন। তাছাড়া এই কর কাঠামোর মধ্যে নিরপেক্ষতার অভাব আছে। এছাড়া এই কাঠামো ভোক্তার পছন্দ, উৎপাদকের পছন্দে হস্তক্ষেপ করে।

রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের কমিটি (১৯৯৫-১৯৯৮), এবং রাজ্যদের মুখ্যমন্ত্রীদের কমিটি (১৯৯৯) সালে রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে রাজ্য ভ্যালু আডেড কর (State VAT) চালু করার সুপারিশ করেন।

রাজ্যগুলির কর কাঠামো সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যগুলির জন্য চারটি কর হার যুক্ত (০, ৪, ৮, ১২ শতাংশ) একটি কর কাঠামো সুপারিশ করা হয় এবং রাজ্যগুলি এটি গ্রহণও করেছে। উপরিউক্ত কর হারগুলি ন্যূনতম করে হার। রাজ্যগুলি এর চেয়ে উচ্চহারে চাইলে কর ধার্য করতে পারে।

রাজ্যের কর সংস্কারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে, শিল্পস্থাপনের জন্য রাজ্যগুলি বিক্রয় করে যে ছাড় দিত, তা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলির করভিত্তিক (Tax base) কমে যায় এবং এই সংস্কার কার্যকরী হলে VAT চালু করতে সুবিধা হবে।

এখনও অবধি অন্ধপ্রদেশ (পয়লা এপ্রিল, ১৯৯৫), মহারাষ্ট্র (পলয়া অক্টোবর, ১৯৯৫) কেরালা ভ্যালু অ্যাডেড কর চালু করার চেষ্টা করেছে। যদিও মহারাষ্ট্র এবং কেরালায় তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের Empowered কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০০২ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সব রাজ্যে সম্পূর্ণ পরিকাঠামো সৃষ্টি করে ভ্যালু অ্যাডেড কর চালু করতে হবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিক্রয় কর ধার্য করে তার হারকে কমিয়ে ১ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে।

রাজ্যগুলি অন্যান্য যে কর আরোপ করে থাকে যেমন বিনোদন কর, বিদ্যুত শুল্ক, হোটেল ইত্যাদির উপর কর, ইত্যাদি ভ্যালু অ্যাডেড করের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে। চুক্তি কর, আগমন কর (Entry tax) এগুলিও ভ্যালু অ্যাডেড করের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে।

৬২.৪.২ ভর্তুকির হার কমানো

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আয়ের এক বৃহৎ অংশ ভর্তুকি দেওয়ার জন্য ব্যয় করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুইট অব পাব্লিক ফাইনান্স এন্ড পলিসির (National Institute of Public Finance and Policy) ১৯৯৭-এর এক রিপোর্ট অনুসারে ব্যক্ত এবং গৌণ ভর্তুকির পরিমাণ ১৯৯৪-৯৫ সালে ছিল সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৪.৪ শতাংশ। এই ভর্তুকির বেশির ভাগই অংশই ছিল এমন কিছু পণ্যের উপর যা দারিদ্র দূরীকরণ অথবা সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি খাদ্য ভর্তুকির প্রসঙ্গে বলা যায় যে এর উপযোগিতা সত্যিকার দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে অনেক সময়েই পৌঁছয় না। সার ভুর্তুকির ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কোষাগার ঘাটতি কমানোর অন্যতম পথ হচ্ছে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি তুলে দেওয়া অথবা প্রয়োজনীয় ভর্তুকির হার কমিয়ে দেওয়া।

৬২.৪.৩ বেতন এবং কর্মসংস্থান

ভারতে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বহুক্ষেত্রেই প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত এবং পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রযোজ্য হবার পর থেকে বেতন বাবদ সরকারের দেয় অর্থের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, এই খাতে ব্যয় কমানোর জন্য ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রকের আয়তন কমানো এবং নতুন সরকারি কর্মসংস্থানের হার কমানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

৬২.৪.৪ কররাজস্ব ভিন্ন আয়

সাধারণত কর রাজস্ব ছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মুনাফা সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস বলে ধরা হয়। কিন্তু ভারতে, দুই একটি সংস্থা ছাড়া বেশির ভাগ সংস্থাই মুনাফা অর্জন করে না। উপরন্তু সরকারকে এই সব সংস্থার ব্যয় মেটানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী সরকারি ব্যয় কমানোর জন্য অলাভজনক সংস্থাগুলি বিক্রি করে দেবার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষে অলাভজনক সংস্থার বিলগ্নীকরণ এবং বিক্রী বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি, বরং দেখা গেছে সরকার মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার বিলগ্নীকরণ করেছেন এবং সেই অর্থ কোষাগার ঘাটতি কমানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬২.৪.৫ সরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ ও সুদের পরিমাণ কমানো

সরকারি খাতে অতিরিক্ত ঘাটতি বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করে। সরকারি খাতে ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, তাদের ফলে, সুদের হার বাড়তে থাকে এবং সবেসরকারি বিনিয়োগের ব্যয়ও বেড়ে যায়। বিশ্বব্যাঙ্ক-এর ১৯৯৮-এর একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে ১৯৮৬-৮৭-র পরবর্তী ১০ বছর সময়ে কেন্দ্রের কোষাগার ঘাটতি যদি সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তবে বেসরকারি বিনিয়োগ সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক শতাংশ কমে গেছে। সুতরাং অত্যধিক সরকারি ঋণ অর্থনীতির স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলদায়ক নয়, যখন এই ঋণ ঘাটতি মেটাবার জন্য নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া যদি সুদের হার উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশি হয়, তবে ঋণ ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। ১৯৯০-৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৮.৮ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট অনুসারে তা ছিল আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩৬.২ শতাংশ। সুতরাং বলা যায় সরকারি ঋণ কমার পরিবর্তে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সুদের বোঝাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদের বোঝা কমানোর জন্য সুদের হারের হ্রাস উদারীকরণ নীতির পরিপন্থী। সুতরাং সুদের বোঝা কমাতে গেলে নতুন ঋণ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে এবং পুরোনো ঋণের বোঝা মেটাতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ঋণের বোঝা কমানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা একদম অসম্ভব কাজ নয়। কিন্তু এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির অর্থনীতির ব্যাপক রদবদল করা প্রয়োজন। রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এরজন্য কেন্দ্র রাজ্য উভয়কেই চলতি খাতে ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে।

৬২.৫ মূল্যস্তর ও মুদ্রাস্ফীতি

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মুদ্রাস্ফীতির হারকে নিম্নস্তরে বেঁধে রাখা। সারণী ৩-এ পাইকারি মূল্যসূচক এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের পরিবর্তনের হার দেখানো হয়েছে।

সারণী—৩

ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার

বছর	পাইকারি মূল্যসূচক	বাৎসরিক পরিবর্তন	ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক	বাৎসরিক পরিবর্তন
১৯৮৬-৮৭	১৩২.৭	—	১৩৭	—
১৯৮৭-৮৮	১৪৩.৬	৮.২১	১৪৯	৮.৭৬
১৯৮৮-৮৯	১৫৪.৩	৭.৪৫	১৬৩	৯.৪০
১৯৮৯-৯০	১৬৫.৭	৭.৩৯	১৭৩	৬.১৩
১৯৯০-৯১	১৮২.৭	১০.২৬	১৯৩	১১.৫৬
১৯৯১-৯২	২০৭.৮	১৩.৭৪	২১৯	১৩.৪৭
১৯৯২-৯৩	২২৮.৭	১০.০৬	২৪০	৯.৫৯
১৯৯৩-৯৪	২৪৭.৮	৮.৩৫	২৫৮	৭.৫০
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৭	১০.৮৬	২৭৯	৮.১৪
১৯৯৫-৯৬	২৯৫.৮	৭.৬৮	৩১৩	১২.১৯
১৯৯৬-৯৭	৩১৪.৬	৬.৩৬	৩৪২	৯.২৭
১৯৯৭-৯৮	৩২৯.৮	৪.৮৩	৩৬৬	৭.০২
১৯৯৮-৯৯	৩৫২.৫	৬.৯	৪১৪	১৩.১
১৯৯৯-২০০ (অক্টোবর অবধি)		২.৯		

Ban ১৯৮১-৮২ = ১০০

(i) পাইকারী মূল্যসূচকে সমস্ত দ্রব্যের সাপ্তাহিক গড় নেওয়া হয়েছে।

(ii) ভোগ্যপণ্যের দামে শহরাঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যবহৃত দ্রব্যের (মাসিক গড়)

সূত্র : EPW, No. 10, March - 2000, pp. 809

সারণী—৩ থেকে বোঝা যায় যে ১৯৯২ সালের পর থেকে সাধারণ মূল্যসূচকে নিম্নমুখী পরিবর্তন হয়েছে। এর মূল কারণ ৯০-এর দশকে অর্থের যোগানের হার কমানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৩-৯৪-এর পর থেকে পাইকারি মূল্যসূচক এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক সমহারে পরিবর্তিত হয়নি। ১৯৯৫-৯৬ সালের পর থেকে

ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্তরের উপর নির্ভরশীল মুদ্রাস্ফীতির সূচক পাইকারি পণ্যমূল্যের সূচকের উপর নির্ভরশীল মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমতার মূলকারণ মূল্যসূচক নির্ধারণের নীতির পার্থক্য। ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক নির্ধারণের সময় খাদ্যদ্রব্যের উপর ৫৭.% গুরুত্ব (Weight) দেওয়া হয়, যেখানে পাইকারি মূল্যসূচকে খাদ্যদ্রব্যের উপর ২৭.৫% গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দুই মূল্যসূচকে পার্থক্যের মূল কারণ ১৯৯০-এর দশকে খাদ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। খাদ্যমূল্য নীতি এবং খাদ্য বণ্টন ও বিতরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯৯০-এর দশকে খাদ্য উৎপাদন মূলতঃ স্থিতিশীল ছিল। এই অবস্থাতেও কৃষকদের চাপের জন্য সরকারকে প্রতিবছরই সংগ্রহ মূল্য (Procurement price) বাড়াতে হয়েছে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের এক বিশাল মজুদ ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, যা রক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর ফলে সরকারকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। সুতরাং মূল্যস্তর কমাতে গেলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যছাড়া গৃহ, চিকিৎসা, ইত্যাদি পরিসেবার মূল্যবৃদ্ধিও ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ২০০১-২০০২-এর বাজেট অনুসারে ২০০০-২০০১ সালে পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য শক্তি সামগ্রী বাদে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৪ শতাংশ। অবশ্য বিশ্বের বাজারে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশে এইসব দ্রব্যের দাম বাড়ানো হয়েছে যার ফলে সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতির হার রোধ করার জন্য অর্থের যোগানের হারকে কম করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি খাতে ঘাটতি নতুন অর্থ ছাপিয়ে পূর্ণ করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ঘাটতি কমানোর জন্য যদি সরকারের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে ঋণের উপর সুদের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের হার হ্রাস পাবে, এবং জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। অর্থাৎ নিম্নমুদ্রাস্ফীতির মাত্রা উচ্চ সুদের দিকে অর্থনীতিকে ঠেলে দিতে পারে এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের জন্য সরকারের পক্ষে সুদের হার কৃত্রিমভাবে হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির হার কমানো সংক্রান্ত নীতি আরও সচেতনভাবে গ্রহণ করা উচিত।

৬২.৬ বৈদেশিক লেনদেনে পরিবর্তন

আমরা জানি যে, ১৯৯১ সালের আন্তর্জাতিক সংকটের সময় বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। বৈদেশিক লেনদেনের চলতি খাতে ঘাটতি ছিল আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.২ শতাংশ, এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার কমে দাঁড়ায় ২১৫২ কোটি টাকায় (us $ ১.২ বিলিয়ন)। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বৈদেশিক ঋণের বোঝা। এই সময় ভারত মূলতঃ আর্থিক সাহায্যের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে উচ্চসুদে স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করেছিল। এর ফলস্বরূপ, ১৯৯১ সালে যখন অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে, এবং ভারতের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, তখন, ভারতের থেকে, স্বল্পকালীন মূলধনের নির্গমন হতে থাকে। ১৯৯০-৯১ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের কারণে ৯৫৭ কোটি টাকার নির্গমন হয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন সংস্কার কর্মসূচী এবং স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।

(a) আমদানি রপ্তানি নীতি;

(b) বাণিজ্যিক বৈদেশিক ঋণ ;

(c) বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ;

(d) বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার সংক্রান্ত নীতি।

এই অনুচ্ছেদে আমরা খুবই সংক্ষেপে এই বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা করবো।

৬২.৬.১ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি

বিদেশী লেনদেনের চলতি খাতে ঘাটতি কমাতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে হবে এবং আমদানির হার কমাতে হবে। ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার নীতির মধ্যে যে অর্থনৈতিক উদারীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের উপর যে বাধা ছিল তা উঠিয়ে দিতে হয়েছে। এছাড়া ভারত যেহেতু বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অন্তর্ভূক্ত সেই কারণে আমদানি শুল্ক ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে এবং অমদানির উপর অন্যান্য যে বাধা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক ৩৫.৫% থেকে কমিয়ে ৫০%-এ আনা হয়েছে। কিছু বিশেষ দ্রব্য ছাড়া বেশির ভাগ দ্রব্যকেই আমদানির মুক্ত সাধারণ লাইসেন্স (OGL)-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৭-২০০২ সালের জন্য যে আমদানি রপ্তানি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা সংশোধনীতে (যা ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ ঘোষিত হয়) মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(১) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলীর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

(২) রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন যোজনা স্থির করতে হবে। এই প্রসঙ্গে Export Promotion Capital Goods Scheme-কে সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়েছে।

(৩) নতুন উদ্যোগ — এই প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক স্থান (Special Economic Zone) স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদারীকরণের ফলে সামগ্রিক বাণিজ্য এবং জাতীয় আয়ের অনুপাত ১৯৯০-৯১ সালে ১৪.১% বেড়ে ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৮.২%-এ গিয়ে দাঁড়ায়। এবং ১৯৯৩-৯৪—১৯৯৫-৯৬ সালে মার্কিন ডলারের নিরিখে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ২০ শতাংশ। এই উচ্চ হারের মূল কারণ ছিল টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস এবং বিশ্ববাণিজ্যের প্রসারণ। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যে এখনও বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি। ২০০১-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে ১১.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেখানে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.৫% হারে। আমদানি বাণিজ্যের এই দ্রুতবৃদ্ধির মূল কারণ খনিজ তেলের আমাদনি

ব্যয়ের ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সালে চলতি খাতে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে, এবং তা বর্তমানে হয়েছে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের ০.৯ শতাংশ। চলতি খাতে ঘাটতি হ্রাসের মূল কারণ অদৃশ্য বাণিজ্যের (Invisible Trade)-এর হার বৃদ্ধি করা। এর মূল কারণ বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের দেশে অর্থ পাঠানো এবং সফ্‌টওয়ার (Software) রপ্তানির হারে বৃদ্ধি।

৬২.৬.২ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ :

ভারতে ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল অত্যধিক বিদেশী ঋণ। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভারতে বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে স্বল্পকালীন ঋণের পরিমাণও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। স্বল্পকালীন ঋণ নেওয়া হয়েছিল মূলতঃ তিন বছরের জন্য কিংবা এক বছরের জন্য। কিন্তু ভারতের ঋণ পরিশোধের বিশ্বাসযোগ্যতা ১৯৯০-এর জুলাই-এর পর থেকে কমতে থাকে। যার ফলে নতুন ঋণ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এইসময় সরকারকে বহু স্বল্পকালীন ঋণ একসঙ্গে পরিশোধ করতে হয়। এর ফলস্বরূপ ভারতের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার তলানিতে এসে পৌঁছায়। এই সময় IMF থেকে ঋণ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয় যেহেতু অত্যধিক স্বল্পকালীন ঋণ দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। তাই স্থিতিশীলতা কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিদেশী ঋণের পরিমাণ কমানো এবং সর্বোপরি স্বল্পকালীন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা।

৬২.৬.৩ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ :

বিদেশী ঋণের পরিমাণ হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হলো দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কারণ বিনিয়োগের পথ দিয়ে দেশে যে মূলধনের আগমন হয় তা মূলতঃ স্থিতিশীল প্রকৃতির। কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯৯১-এর আগে বিভিন্ন শিল্পনীতিতে বিদেশী পুঁজির আগমনের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। কারণ এই সময়ে মনে করা হতো যে বিদেশী পুঁজির আগমন ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানবে। কিন্তু ১৯৯১-এর সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা। ১৯৯১-এর পরবর্তীকালে প্রত্যেক বাজেটেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৩৩ মিলিয়ন ডলার, এবং ১৯৯৭ সালে তা বেড়ে হয় ৩.৩ বিলিয়ন ডলার।

৬২.৬.৪ টাকার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতি :

যেকোনো দেশের রপ্তানি বাণিজ্য অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় সেই দেশের মুদ্রার মূল্যমান অথবা বিনিময়মূল্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। যদি দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান বিদেশীমুদ্রার তুলনায় কম হয়, তবে বিদেশী মুদ্রার নিরিখে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের দাম কম হবে। ভারতবর্ষে ১৯৯১-এর আগে পর্যন্ত বিদেশী মুদ্রার তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য সম্পূর্ণরূপে সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। অনেক সময় বিনিময় মূল্য কৃত্রিমভাবে বেশী থাকার জন্য রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে যখন অর্থনৈতিক সংস্কার ও স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু করা হয়, তখন টাকার বিনিময় মূল্য দুবার কমানো হয় যার ফলে টাকার মূল্যমান প্রায় ২০% কমে যায়। ১৯৯২-৯৩ এর বাজেটে বাণিজ্যখাতে টাকাকে কিছুটা বিনিময়যোগ্য করা হয়।

১৯৯৪ সালে চলতিখাতে টাকাকে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করা হয়। বর্তমানে মূলধনীখাতে টাকাকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মূলধনী খাতে পূর্ণ বিনিময় যোগ্যতার ফলে মূলধনের মুক্ত আগমন ও নির্গমন সম্ভব। কিন্তু এর ফলে দেশের মূলধনের বাজারে অস্থিতিশীলতা বাড়ার সম্ভাবনা ছিল।

৬২.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা প্রথমে ভারতে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে দেখা গেল, অত্যধিক কোষাগার ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিদেশী লেনদেনে ঘাটতির কারণে সৃষ্টি হয়। ভারতে সংস্কার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে। তার মধ্যে কর কাঠামোর সংস্কার, সরকারের ব্যয় হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস, বৈদেশিক বাণিজ্যের হার বৃদ্ধি, বিদেশী ঋণের পরিমাণ কমানো ইত্যাদি। তবে আমরা বলতে পারি স্থায়ীভাবে স্থিতিশীলতা আনতে গেলে, সরকারে অর্থনৈতিক নীতিসমূহকে আরও সচেতনভাবে ব্যবহার করতে হবে।

৬২.৮ অনুশীলনী

১। ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা কর্মসূচী গ্রহণের যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

২। কর কাঠামোর সংস্কারের মূল বিষয়গুলি কি ছিল?

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Cassen R and V Joshi, (1995), *'Indian — The Future of Economic Reform'*, Oxford University Press.

২। Chelliah J. Raja (1996), *'Towards Sustainable Growth — Essays in Fiscal and Financial Sector Reforms in India'*, Oxford University Press.

৩। Jalan Balan (1992), (ed.) *'The Indian Economy — Problems and Prospects'*, Penguin.

৪। Joshi, V and IMD Little (1996), *'India's Economic Reforms — 1991-2001,'* Oxford University Press.

৫। Kumar, N (2000), *'Economic Reforms and Their Macro Economic Impact' 'Economic and Political Weekly, Vol, XXX V, No. 10, March-4 2000. pp. 803-812.*

একক ৬৩ □ কাঠামোগত পরিবর্তন

গঠন

৬৩.০ উদ্দেশ্য

৬৩.১ প্রস্তাবনা

৬৩.২ কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

৬৩.২.১ কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর বিবরণ

৬৩.৩ বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন

৬৩.৪ ১৯৯১ সালের পর থেকে গৃহীত আমদানি-রপ্তানি নীতির বিবরণ

৬৩.৪.১ আমদানি-রপ্তানি নীতি (Exim Policy) ১৯৯২-৯৭

৬৩.৪.২ আমদানি রপ্তানি নীতি ১৯৯৭-২০০২

৬৩.৫ মুদ্রার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন

৬৩.৫.১ সংস্কার পরবর্তী সময়ে গৃহীত নীতিসমূহ

৬৩.৫.২ চলতি খাতে বিনিময়যোগ্যতার জন্য গৃহীত নীতিসমূহ

৬৩.৫.৩ মূলধনী খাতে পূর্ণ বিনিময় যোগ্যতা

৬৩.৫.৪ মূলধনী খাতে বিনিময়যোগ্যতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৬৩.৬ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন

৬৩.৬.১ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উদারীকরণ সংক্রান্ত নীতিসমূহ

৬৩.৬.২ বিদেশী বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ

৬৩.৭ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার

৬৩.৭.১ ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের কাঠামো

৬৩.৭.২ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের কারণ

৬৩.৭.৩ ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণ

৬৩.৭.৪ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার

৬৩.৮ অব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার
৬৩.৮.১ মূলধন বাজার
৬৩.৮.২ উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার
৬৩.৮.৩ বীমা ক্ষেত্রের সংস্কার
৬৩.৮.৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংস্কার
৬৩.৯ দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কর্মসূচী
৬৩.১০ সারাংশ
৬৩.১১ অনুশীলনী
৬৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৬৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার সময়ে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী কাকে বলে?
- ভারতীয় অর্থনীতিতে বাণিজ্য কাঠামোয় কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে;
- মুদ্রার বিনিময় মূল্য ও বিদেশী বিনিয়োগ-সংক্রান্ত নীতিতে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে;
- আর্থিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝানো হয়;
- ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার বলতে কি কি নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে;
- দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কর্মসূচী বলতে কি বোঝানো হয়।

৬৩.১ প্রস্তাবনা

আমরা প্রথম এককটি পড়ার সময় জানতে পেরেছি যে, ১৯৯১ সালে ভারতবর্ষ এক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই সংকটের পিছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়, তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এবং উপসাগরে কর্মরত ভারতীয়দের দেশে অর্থ পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশী লেনদেন খাতে ঘাটতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এর ফলে আন্তর্জাতিক ঋণের বাজারে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ স্বল্পকালীন মূলধনের নির্গমন হতে থাকে। এবং নতুন করে স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে ভারতকে

আন্তর্জাতিক বাজারে পাওনা মেটানোর ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভারত ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের কাছে সোনা বন্ধক রাখে এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে Compensatory Contingency Financing Facility (CCFF) সুবিধায় এবং তিনমাসের Stand By সুবিধায় 3334 কোটি টাকা ঋণগ্রহণ করেছিল। ১৯৯১ সালের জুন মাসে নতুন সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় দেশে বিভিন্ন কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য একগুচ্ছ নীতি গ্রহণ করেন। ভারতের নীতিসমূহের সঙ্গে "Washington Concensus" নামক সংস্কার পদ্ধতির মিল আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮০-র দশকে বিশ্বব্যাঙ্ক দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এবং অন্যান্য জায়গায় কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে প্রায় ৪০টি কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৬৩.২ কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

কাঠামোগত কর্মসূচীর আওতায় যে নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ—

- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার জন্য শিল্পক্ষেত্রের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- মধ্যকালে জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি করতে হবে। এরই সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং বিদেশী বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে হবে।
- বেসরকারি ক্ষেত্রকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।
- রাষ্ট্রকে পরিকাঠামো, জনসম্পদের উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদির থেকে দৃষ্টি দিতে হবে।

আগের এককে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, এরই সঙ্গে ভারতে সরকার স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।

৬৩.২.১ কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর বিবরণ

কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল।

(১) শিল্পনীতির পরিবর্তন : শিল্পনীতির ক্ষেত্রে ১৯৯১-এর পর ব্যাপক রদবদল করা হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ শিল্পের জন্য শিল্প লাইসেন্স নীতি তুলে দেওয়া হয়েছিল .Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTP) অনুসারে নতুন বিনিয়োগ এবং শিল্প প্রসারণের জন্য যে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতো, তা তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বিদেশী কারিগরী (Foreign Technology) আমদানির থেকে বিধিনিষেধ অনেক শিথিল করা হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল বক্তব্য ছিল, এই ক্ষেত্রকে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং সরকারি বিধিনিষেধের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে

হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পের বেসরকারিকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারিকরণের বিষয়টি পরবর্তী এককে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

(২) করকাঠামোর পরিবর্তন : এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অত্যধিক করের হার কমানো এবং কর কাঠামোয় সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা। (কর কাঠামোর সংস্কার পদ্ধতি নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করেছি)।

(৩) বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন এবং টাকার বিনিময় মূল্য নীতির পরিবর্তন ঃ বাণিজ্যনীতির পরিবর্তনের মূল বক্তব্য ছিল আমদানি নীতির উদারীকরণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন। এছাড়া টাকার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতির সরলীকরণ করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

(৪) বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন ঃ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের আগে পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিতে বিদেশী বিনিয়োগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হতো না। কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকে মুক্ত করা হয়।

(৫) আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার ঃ এই ক্ষেত্রের পরিবর্তন বলতে মূলতঃ মূলধনের বাজারের পরিবর্তন, সুদের হারের কাঠামোর উদারীকরণ এবং ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিবর্তনকে বোঝানো হয়।

সুতরাং কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী বলতে মূলতঃ এই একগুচ্ছ নীতির পরিবর্তনকে বোঝানো হয়।

৬৩.৩ বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন

১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিধিনিষেধের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে পণ্যের আদান প্রদান নিয়ন্ত্রিত করা। এই নীতির মূলকারণ ছিল যে, ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গী (Inword looleing Strategy of Growth) গ্রহণ করেছিল। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন কর ও অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে এক সুরক্ষিত আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করা এবং সেই বাজারের জন্য আভ্যন্তরীণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এর ফলে দেশে এমন এক শিল্প কাঠামো গড়ে ওঠে যা কখনও বিদেশী বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। সুরক্ষিত বাজার গড়ে তোলার জন্য সরকার আমদানির উপর বিভিন্ন পরিমাণগত বিধিনিষেধ. (Quantitative Restriction) বিশেষ আমদানি লাইসেন্স [Special Import License (SIL)] প্রকৃত ব্যবহারকারীর শর্ত ও করগত বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। সরকারের এই শিল্পনীতিকে 'আমদানি বিকল্প নীতি' (Import Substituting Policy) বলে অভিহিত করা হয়। এইসময় ভোগ্যপণ্যের উপর আমদানি শুল্কের (tariff) হার ছিল গড়ে ১৬৪%। কোনো কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্কের হার ছিল ৩০০% বেশী। আমদানির উপর বিধিনিষেধের অন্যতম কারণ ছিল বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতি কমানো। আমদানির উপর অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের কারণে দেশীয় উৎপাদকরা একটি সুরক্ষিত বাজারের সুবিধা ভোগ করতেন, এবং এর ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণের হারও অত্যন্ত কমে যায়।

১৯৯১ এর সংস্কার কর্মসূচী আমদানি বাণিজ্যের উদারীকরণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল। এর পিছনে মূলতঃ দুটি কারণ ছিল। আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে, এবং এর ফলে এদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, এবং রপ্তানির উন্নতি হবে। দ্বিতীয়তঃ General Agreement on Tariff and Trade (GATT) এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে ভারতকে ২০০১ সালের মধ্যে আমদানির উপর থেকে বিধিনিষেধ দূর করতে হবে। কিন্তু আমদানি উদারীকরণের কিছু সমস্যা আছে।

আমদানি উদারীকরণের ফলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে কিছু সময় লাগে। কারণ আমদানি বিকল্প ক্ষেত্রে আগে যে সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা রপ্তানিযোগ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তর সম্ভব নয়। এর ফলে আমাদনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ভারতের আগে যেসব দেশ সংস্কার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যেমন তানজানিয়া, ঘানা, শ্রীলঙ্কা, আর্জেন্টিনা তাদের ক্ষেত্রে আমদানির উদারীকরণের ফলে, ভোগ্যপণ্যের আমদানি মূলধনী পণ্য অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশীয় শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৯১ সালে সংস্কার কর্মসূচীতে যখন আমদানি উদারীকরণের কথা বলা হয়েছিল, তখন বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি ছিল। সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আমদানির উদারীকরণ, এই ঘাটতির পরিমাণকে আরও অনেক বৃদ্ধি করতো। সেই কারণে সরকার মধ্যকালীন ভিত্তিতে আমদানির উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে পেট্রোলিয়ম, সার, ভোজ্যতেল, ইত্যাদির আমদানি কমিয়ে দেওয়ার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সময় সরকার আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাজার ভিত্তিক একটি সম্পর্ক স্থাপনের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বিশ্বের বাজারে ভারত সামগ্রিক রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৬৫ সালে বিশ্বের সামগ্রিক রপ্তানির মধ্যে ভারতের অংশ ছিল ০.৯৮ শতাংশ। ১৯৯০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত রপ্তানি বৃদ্ধির হার প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ দশকের শেষে বিদেশী লেনদেন খাতে সংকটের অন্যতম কারণ ছিল স্বল্প রপ্তানি বাণিজ্যের হার। রপ্তানি বাণিজ্যের এই হতাশা ব্যাঞ্জক অবস্থার কারণ ছিল সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতিসমূহ। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং এ প্রসঙ্গে অনুসৃত নীতিসমূহকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত সময়কে রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে অত্যন্ত নিরাশা জ্ঞাপন করা হয়। এই সময় ধারণা করা হতো যে উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশ থেকে রপ্তানি করা জিনিসের মূল্য ক্রমশ সময়ের সাপেক্ষে হ্রাস পাবে। যার ফলে এইসব দেশে রপ্তানি বাণিজ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কিন্তু ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে বিশ্ববাণিজ্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশ এই সময় তাদের রপ্তানিকে প্রসারিত করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাছাড়া এইসময় থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলি কাঁচামাল ইত্যাদির পরিবর্তে সম্পূর্ণ দ্রব্য সরবরাহ করা শুরু করে।

ভারতের রপ্তানিনীতির দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয় ১৯৭৩ সালের 'প্রথম তেল সংকটের' পর থেকে, এবং তা দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময় প্রথম অনুধাবন করা যায় যে শুধু আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন খাতে সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব নয়। কারণ এই সময় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পস্থাপনের কারণে, এবং সবুজ বিপ্লব নীতির প্রসারণের জন্য পেট্রোলিয়াম, সার, ইস্পাত ও অন্যান্য খনিজ ধাতুর এবং অন্যান্য কাঁচামালের আমদানি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছিল। কিন্তু রপ্তানি সেই গতিতে বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্য চলতি খাতে ঘাটতি বাড়তে থাকে। এই কারণে সরকার এই সময় রপ্তানি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। রপ্তানি দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য কারিগরী বিদ্যা, কাঁচামাল, মূলধনী দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এছাড়া Export Processing Zones এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা হয়। রপ্তানিকারকদের বিভিন্নভাবে ভর্তুকি এবং কর ছাড়ের সুবিধাও এই সময় দেওয়া হয়েছিল। এই সময় টাকার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতি রপ্তানিকারকদের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এইসব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতি রপ্তানিকারকদের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। এইসব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে সত্তরের দশকের শেষের দিকে রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

রপ্তানি সংক্রান্ত নীতির তৃতীয় ভাগে রপ্তানি বাণিজ্যকে শিল্প এবং উন্নয়ন নীতির একটা বিশেষ অংশ বলে মনে করা হয়েছিল। এই সময় সমগ্র শিল্পক্ষেত্রের জন্য কারিগরী বিদ্যার উন্নতি, শিল্পসংস্থার আয়তন বৃদ্ধি, মুক্ত আমদানি এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকে রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। এই সময়ে টাকার বিনিময়মূল্য সংক্রান্ত নীতিরও ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে সামগ্রিক বিশ্বের রপ্তানি বাণিজ্যের নিরিখে ভারতের রপ্তানি ০.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ০.৬২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০-এর শেষের দিকেও আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি হয়নি। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের নীতিসমূহকে সামগ্রিক দিক দিয়ে আলোচনা করে আমরা কতগুলি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

প্রথমতঃ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে রপ্তানি সম্পর্কে যে হতাশাব্যঞ্জক ধারণা করা হয়, তার ফল ভারতকে বহু দিন ভোগ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানির উন্নয়নের জন্য শিল্পক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নতি এবং তৎসহ রপ্তানির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থতঃ ভারতের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতিসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ ভারতের অর্থনীতিতে বিভিন্ন বিধি নিষেধ এবং আভ্যন্তরীণ কর কাঠামোর ত্রুটির কারণে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত বেশী। উপযুক্ত নীতির মাধ্যমে এই উৎপাদন ব্যয়কে হ্রাস করতে হবে।

সুতরাং আমরা ভারতের অর্থনীতিতে রপ্তানি এবং আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় নীতিসমূহকে কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে সে বিষয়ে একটি ধারণা করা গেল।

৬৩.৪ ১৯৯১ সালের পর থেকে গৃহীত আমদানি-রপ্তানি নীতির বিবরণ

১৯৯১ সালের জুলাই অগাস্ট মাসে সরকার আমদানি রপ্তানি নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন করেছিলেন এর ফলে রপ্তানিকে যেমন উৎসাহিত করা হয়েছিল, তেমনি আমদানির উপর থেকে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছিল। এই নীতিসমূহের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ—

প্রথমত ঃ আমদানি লাইসেন্স নীতিতে এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসা হয় এবং সরকার 'Exim Scrips' নামক বিক্রয়যোগ্য আমদানি লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু করেন।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানিকারকদের আগাম লাইসেন্স, এবং বিনা শুল্কে মূলধনী দ্রব্যের যোগানের ব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয়তঃ মূলধনী দ্রব্য আমদানির ব্যবস্থা আরও সহজসাধ্য করা হয়।

চতুর্থতঃ আমাদনির ক্ষেত্রে ৯৪টি দ্রব্যকে 'Restricted list' থেকে 'Limited Permissible List'এ স্থানান্তরিত করা হয় এবং ৩৭টি দ্রব্যকে 'Limited Permissible List' থেকে মুক্ত সাধারণ তালিকা (Open General List)-এ নিয়ে আসা হয়।

পঞ্চমতঃ যেসব দ্রব্য '*Canalisation*'-এর মাধ্যমে আমদানি করা হতো, তা কমিয়ে দেওয়া হবে।

ষষ্ঠতঃ Expert Processing Zones এবং ১০০% রপ্তানিকারক সংস্থাগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে।

সপ্তমতঃ রপ্তানিকারকদের যে "Cash Campensatory Support" দেওয়া হতো তা তুলে দেওয়া হয়।

৬৩.৪.১ আমদানি-রপ্তানি নীতি (Exim Policy)—১৯৯২-৯৭

১৯৯২ সালের ৩১শে মার্চ সরকার পাঁচ বছরের জন্য একটি নতুন আমদানি রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেন। এই বাণিজ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। এই নীতিতে আমদানি উদারীকরণের পরিধি আরও বৃদ্ধি করা হয়। অবশ্য ১৯৯২ সালে ঘোষিত এই নীতিটি বহুবার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

(১) সরকার এই নীতিতে আগাম লাইসেন্স এবং বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (Special Import License) সৃষ্টি করেন।

(২) ভোগ্যপণ্য ও ৭০টি বিশেষ দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য যার মধ্যে মূলধনী দ্রব্যও অছে তা আমদানি বিধিনিষেধ মুক্ত করা হয়।

(৩) পেট্রোলিয়াম তেল, ভোজ্য তেল, সার ইত্যাদি ৮টি দ্রব্য বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নিউজপ্রিন্ট, প্রাকৃতিক রবার, অলৌহ ধাতু, কাঁচামাল, সার ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে যে ক্যানালাইজেসন (Canalisation) প্রথা ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(৪) ১৪৪টি দ্রব্যকে রপ্তানির নিষিদ্ধ তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মূলতঃ ৭টি বিশেষ দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি মুক্ত রাখা হয়। তবে এর মধ্যে ৬২টি দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে (যেমন কাঁচা রেশম, কিছু খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি) বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

(৫) হোটেল এবং পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়।

(৬) আমদানি দ্রব্যের নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা কমাতে হবে। মূলধনী দ্রব্যের আমদানির নিয়মাবলী অনেক শিথিল করা হয়েছিল। পুরানো মূলধনী দ্রব্যের আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রপ্তানিকারকদের মূলধনী দ্রব্য আমদানির জন্য Export Promotion Capital Goods Scheme-এর উদারীকরণ করা হয়েছিল।

(৭) রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। মূল্যভিত্তিক আগাম লাইসেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে শুল্ক ছাড়ের পরিধিকে বাড়ানো হয়েছিল।

(৮) বিভিন্ন ব্যবসা সংস্থা এবং রপ্তানিকারক সংস্থাকে আগাম লাইসেন্স দানের ক্ষেত্রে আত্মসংসাপত্র গ্রহণ করার নীতি নেওয়া হয়েছিল।

(৯) রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে বিশেষ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

(১০) সম্পূর্ণ রপ্তানিকারক সংস্থা (100% Expert Oriented Units) যেগুলি Export Processing Zones (EPZ)-এ অবস্থিত তারা বিনাশুল্কে বিভিন্ন মেশিন আমদানি করতে পারবে। এছাড়া এইসব সংস্থাকে কৃষিক্ষেত্রে মৎস উৎপাদন, ফুলের চাষ, রেশম উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(১১) এছাড়া নতুন বাণিজ্য নীতি দেশের শুল্ক কাঠামোর সংস্কারের উপর বিশেষ গুরত্ব দিয়েছিল

এই বাণিজ্যনীতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমদানির উদারীকরণ করেছিল এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারণের চেষ্টা করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৯৯৩-৯৪ সালে সরকার বাণিজ্য নীতিতে কিছু সংশোধনী নিয়ে আসেন। ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে সরকার মূলধনী দ্রব্য লৌহ এবং অলৌহ খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক দ্রব্যের উপর থেকে আমদানি শুল্ক ব্যাপকভাবে হ্রাস করেন। বিভিন্ন রপ্তানি ক্ষেত্র যেমন বস্ত্রবয়ন শিল্প, চামড়া দ্রব্য, সমুদ্রজাত দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্র, রত্ন অলংকার প্রস্তুতকারক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূলধনী দ্রব্যের উপর থেকে আমদানি শুল্ক ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুক্ত আমদানি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। রপ্তানি নিষিদ্ধ তালিকা থেকে ১৪৬টি দ্রব্যকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মূলতঃ এই সংশোধনী বাণিজ্য নীতির সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচীর গতিবেগকে ত্বরান্বিত করেছিল কিন্তু বাণিজ্য নীতির উদারীকরণ কর্মসূচী তখনও অবধি কৃষিক্ষেত্রকে মুক্ত বাণিজ্যের আওতায় আনেনি।

১৯৯৪-৯৫ সালে এই বাণিজ্যনীতিতে পুনরায় সংশোধনী নিয়ে আসা হয়। এই সংশোধনী অনুসারে বিশেষ

আমদানি লাইসেন্স (Special Import License) পদ্ধতিতে আমদানিকৃত দ্রব্যের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধনী শুল্কছাড় পদ্ধতি এবং মূল্যভিত্তিক আগাম লাইসেন্স (Value Added Advanced License) পদ্ধতির সরলকীরণ করা হয়। এছাড়া সেবা ক্ষেত্রে রপ্তানি যেমন সফ্‌টওয়ার রপ্তানি, পেশাগত সেবা রপ্তানিকে (Consultancy) উৎসাহিত করা হয়েছিল। এছাড়া রপ্তানিক্ষেত্রে ব্যবহৃত মূলধনী পদার্থে আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরলীকরণ করা হয়। এই সংশোধনী মূলতঃ রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারণের জন্য যে সকল নীতিসমূহ নেওয়া হয়েছিল তাদের কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত সরলীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া সোনা এবং রূপা আমদানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (Special Import Licensc) পদ্ধতিতে শুল্কছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৯৫ সালের ৩১শে মার্চ বাণিজ্য নীতির পুনরায় সংশোধন করা হয়েছিল। এই সংশোধনীতে আমদানি উদারীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। মুক্ত সাধারণ লাইসেন্স (Open General License)-এর আওতায় আমদানিকৃত দ্রব্যের সংখ্যা ৪৩টি থেকে বাড়িয়ে ৭৫-এ নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, কম্প্যুটারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যানবাহনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, লোহা, ইস্পাত, রড, দণ্ড ইত্যাদি।

এছাড়া জনসাধারণের ব্যবহৃত ৩২টি ভোগ্যপণ্যের অবাধ আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (Special Import License) অনুসারে ৩৩টি দ্রব্যের আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্য। এরই সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

১৯৯৬ এর ২৫শে মার্চ বাণিজ্যনীতিতে সরকার পুনরায় পরিবর্তন আনেন। এই সময় সরকার "Export Promotion Capital Goods Scheme"এর পরিধিকে আরও পরিবর্ধিত করেন। এছাড়া সরকার আঞ্চলিক আগাম লাইসেন্স কমিটির পুনঃস্থাপন করেন।

১৯৯২-৯৭ সালের বাণিজ্য নীতির আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার এই সময়ে মূলতঃ আমদানির উদারীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ ছিল GATT এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়মাবলীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যনীতির যোগসূত্র স্থাপন করা। এছাড়া এই সময়ে রপ্তানির উন্নতির জন্যও সরকার বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এইসময় সরকার রপ্তানিকারকদের সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের নীতি থেকে সরে এসেছিলেন। তার পরিবর্তে রপ্তানি বাণিজ্যের নীতির সরলীকরণ এবং রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন কাঁচামাল, মূলধনী দ্রব্য, আমদানিকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল।

৬৩.৪.২ আমদানি-রপ্তানি নীতি (১৯৯৭-২০০২)

সরকার ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পাঁচ বছরের জন্য নতুন বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করেন। পাঁচ বছরের জন্য প্রবর্তিত এই নীতির সময়সীমা নবম যোজনা কালের সঙ্গে সমাপতিত হয়েছিল। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানির উন্নয়ন। এই নীতি রপ্তানির নিয়মাবলীর সরলীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিল যাতে ভারতীয় পণ্য

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়। এই নীতি পরিষেবা এবং কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। এই নীতির মূল বক্তব্যগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) নতুন শিল্পনীতি অনুসারে মূল্যভিত্তিক আগাম লাইসেন্স প্রণালী (Value Based Advanced Licensing Scheme) তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া ৫৪২টি দ্রব্যকে বিধিনিষেধযুক্ত তালিকা (Restricted list) থেকে বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (Special Import License) এবং মুক্ত আমদানি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(২) এই নীতিতে মূল্যভিত্তিক আগাম লাইসেন্স নীতির পরিবর্তে "Duty Entitlement Passbook Scheme" নামে এক নতুন প্রণালী চালু করা হয়। কিন্তু গুণমানভিত্তিক আগাম লাইসেন্স প্রণালীকে বজায় রাখা হয়। এছাড়া "Duty Entitlement Passbook Scheme" অনুসারে রপ্তানিকারকরা তাদের Entitlement হার অনুসারে শুল্কভিত্তিক ঋণ নিতে পারেন এবং যার ফলে তারা বিনাশুল্কে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারবে।

(৩) আমদানি উন্নয়ন মূলধনী দ্রব্য প্রণালী (Expert Promotion Capital Goods Scheme) : এই ব্যবস্থা অনুসারে মূলধনী দ্রব্যের উপর শুল্কের হার ১৫% থেকে ১০% এ কমিয়ে আনা হয়। এছাড়া শূন্য শুল্ক পদ্ধতির ন্যূনতম সীমা কৃষি ও সংযুক্ত ক্ষেত্রের জন্য ২০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৫ কোটি টাকায় আনা হয়।

(৪) বিশেষ আমদানি লাইসেন্স সুবিধা আভ্যন্তরীণ মূলধনী দ্রব্যের যোগানদারদের জন্য প্রসারিত করা হয়। এর ফলে তারা বিনাশুল্কে "রপ্তানি প্রসারণ মূলধনী দ্রব্য প্রণালী" (Export Promotion Capital Goods Scheme) এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া "Deemed Export" এর সুবিধা তৈল ও গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল।

(৫) এই নীতি কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে।

(৬) এই নীতি অনুসারে বলা হয়েছিল যে কৃষিজাত ফল, সব্জি, ফুল ইত্যাদি দ্রব্যের রপ্তানি যদি সামগ্রিক রপ্তানির ১০% সমান হয় তবে এসব ক্ষেত্রে রপ্তানির ১ শতাংশের উপর অতিরিক্ত বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (Special Import License) এর সুবিধা দেওয়া হবে।

(৭) বিশেষ শর্তে ও শুল্ক দানের পরিবর্তে কৃষি ও কৃষিজাত ক্ষেত্রের রপ্তানিকারক সংস্থা এবং Export Processing Zone-এ উৎপাদিত দ্রব্যের ৫০% দেশের অভ্যন্তরে বিক্রি করা যাবে।

(৮) স্বর্ণ আমদানিকারক সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

(৯) রত্ন ও অলংকার রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাদান করা হয়েছিল।

(১০) ক্ষুদ্র শিল্পের রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (SIL) এর সীমা রপ্তানি মূল্যের এক শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে দুই শতাংশ করা হয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য রপ্তানির মূল্যের উপর অতিরিক্ত এক শতাংশ বিশেষ আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(১১) ভারতীয় পণ্যের গুণমান এবং বিশ্বের বাজারে তাদের প্রতিযোগী করে তোলার জন্য যেসব রপ্তানিকারক ISO ৯০০০ শংসাপত্র পেয়েছে তাদের অতিরিক্ত দুই থেকে পাঁচ শতাংশ বিশেষ আমদানি লাইসেন্স (SIL) এর সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

(১২) সফ্‌টওয়্যার উৎপাদকদের তথ্য যোগাযোগ সূত্র (Data Communication Link) অথবা সরাসরি ক্যারিয়র পরিষেবার মাধ্যমে রপ্তানি করার অনুমতি দেওয়া হয়, এছাড়া তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রেও সুবিধা প্রদান করা হয়।

এই ছিল ১৯৯৭-২০০০ সালের জন্য ঘোষিত বাণিজ্য নীতির প্রাথমিক কাঠামো। পূর্ববর্তী বাণিজ্য নীতির মতো এই নীতিকেও প্রত্যেক বছরই সংশোধন করা হয়।

১৯৯৮ সালের এই বাণিজ্য নীতির প্রথম সংশোধনীটি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৩৫০টি দ্রব্যকে মুক্ত সাধারণ লাইসেন্স (Open General License) তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া সফ্‌টওয়ার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিনাশুল্কে "Export Promotion Capital Goods Scheme" অনুসারে যে আমদানি করা সম্ভব তার ন্যূনতম সীমা কমিয়ে ১০ লক্ষ টাকায় নিয়ে আসা হয়। বাণিজ্যনীতির সংশোধনী অনুসারে বেসরকারি ক্ষেত্রেও "Bonded Warehouse" স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয় যাতে বিভিন্ন দ্রব্য আমদানি (এমনকি নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য) করে আগাম লাইসেন্স প্রাপ্ত রপ্তানিকারকদের কাছে তা বিক্রি করা যায়, এর ফলে ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের সুবিধা হবে। এছাড়া রপ্তানিকারকদের আগাম লাইসেন্স দেবার প্রণালীর সরলীকরণ করা হয়। এছাড়া "Expert Promotion Capital Goods License" এর ন্যূনতম সীমা আরও কমানো হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ বাণিজ্যনীতিতে পুনরায় সংশোধন করা হয়। এই নতুন নীতি অনুসারে ৮৯৪টি দ্রব্যকে মুক্ত আমদানি তালিকায় নিয়ে আসা হয় এবং ৪১৪টি আমদানি দ্রব্যকে বিশেষ আমদানি লাইসেন্স তালিকাভুক্ত (SIL) করা হয়। এই আমদানি উদারীকরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুরণ করা। এই বাণিজ্যনীতি ভারতের আমদানি বাণিজ্যকে আমলাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করার কথা বলেছিল। এছাড়া রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রণালী সম্পাদনের মধ্যে দ্রুততা আনার জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন নীতিতে বাৎসরিক আগাম লাইসেন্স প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল। এই নতুন নীতিতে বিভিন্ন "Export Processing Zones" কে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে পরিবর্তিত করার কথা বলা হয়েছিল। রপ্তানিকারকদের অভাব অভিযোগের মীমাংসা করার জন্য "Ombudsman" ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। 'এছাড়া এই নীতিতে রপ্তানিকারকদের প্রচুর সুবিধা দানের কথাও বলা হয়েছিল। রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে রপ্তানি করার পূর্বে "Duty Entitlement Pass Book" পদ্ধতি অনুসারে ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানিমূল্যের ১০% করা হয়। "Export Promotion Capital Goods" প্রণালীর মাধ্যমে বিনাশুল্কে আমদানির জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম রপ্তানিমূল্য ২০ কোটি টাকা থেকে

কমিয়ে ১ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রজাত দ্রব্যের রপ্তানি রত্নালঙ্কার, ইলেকট্রনিক দ্রব্য, হাতের কাজ, চামড়ার দ্রব্য, ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধাদানের কথা বলা হয়। এছাড়া সেবা ক্ষেত্রে রপ্তানির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

২০০০ সালের ৩১শে মার্চ বাণিজ্যনীতিতে পুনরায় কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। এই নীতিতে আমদানি বাণিজ্যের ব্যাপক উদারীকরণ করা হয়েছিল। ৭১৪টি দ্রব্যের উপর থেকে পরিমাণগত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং এদের মুক্ত সাধারণ লাইসেন্স (Open general Licensc) তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এই নীতিতে শুল্ক কাঠামোতে সংশোধন করার কথা বলা হয়েছিল যাতে উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, এছাড়া রপ্তানিকারকদের সুবিধাদানের মাত্রাও বৃদ্ধি করা হয়। Export Promotion Capital Goods প্রণালী সকলক্ষেত্রের জন্য সমানভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল এবং এরজন্য ন্যূনতম সীমা তুলে দেওয়া হয় এবং দ্রব্যের আমদানি শুল্কের হার স্থির করা হয় মাত্র ৫%। তাছাড়া এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমদানির উপর যে ১০% ভারসাম্য রক্ষাকারী মাসুল ছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছিল। 'অহস্তান্তরযোগ্য' আগাম লাইসেন্স ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার রপ্তানির জন্য চালু করা হয়। "Deemed" রপ্তানি ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে আগাম লাইসেন্স ব্যবস্থায় কোনো শুল্ক দিতে হবে না, Deemed রপ্তানির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাথমিক আমদানি শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়া "Duty Entitlement Pass Book" (DEPB) প্রণালী ৩১শে মার্চ ২০০২ অবধি চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং পরে তাকে "Duty Drawbook" পদ্ধতির অন্তর্গত করা হবে এবং অন্তর্বর্তী দুই বছরের জন্য DEPB প্রণালীর জন্য যে ন্যূনতম সীমা রাখা হয়েছিল তা তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে অন্তর্বর্তীকালীন দু বছরে এই ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা যাবে। এই সংশোধনীতে চীনের অর্থনীতির অনুকরণে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone) স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। যদিও SEZ-এর সঙ্গে EPZ-এর চরিত্রগত বিশেষ তফাৎ লক্ষ্য করা যায় না।

ভারতের বাণিজ্যনীতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারত রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের সঙ্গে সঙ্গে আমদানির উদারীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছিল। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে ভারতকে ১৪২৯টি দ্রব্যের উপর থেকে আমদানি সংক্রান্ত পরিমাণগত বিধিনিষেধ তুলে নিতে হতো। এর মধ্যে ৭১৪টি দ্রব্যের উপর থেকে বিধিনিষেধ ২০০০ সালের বাণিজ্যনীতির সংশোধনীতে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ বাণিজ্যনীতির যে সর্বশেষ পরিবর্তন করা হয়, তাতে বাকি ৭১৫টি দ্রব্যের উপর থেকে বিধি নিষেধ তুলে দেওয়া হয়।

এর মধ্যে ৩৪২টি বস্ত্রবয়ন শিল্পের অর্ন্তভুক্ত দ্রব্য এং ১৪৭টি দ্রব্য ছিল কৃষিজাত দ্রব্য, এবং বাকি ২২৬টি দ্রব্যের মধ্যে টেলিভিশন সেট, মোটরগাড়ি ইত্যাদি দ্রব্য এসব দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে কোনো লাইসেন্স লাগবে না এবং কোটা ব্যবস্থা চালু করা যাবে না। তবে এইসব দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক এবং অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করা যাবে। এবং দেশের শিল্পকে চীনের সস্তা আমদানি দ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য. Anti Dumping

Duty ইত্যাদি চালু করা যাবে। ভারতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছে। ভারতের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্রশিল্প রয়েছে, যা বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবিকার সৃষ্টি করে তাদের পক্ষে আমদানির অবাধ উদারীকরণ বিশেষ ক্ষতিকারক হতে পারে। কারণ বহুক্ষেত্রেই এইসব ক্ষুদ্রশিল্প সস্তা বিদেশী দ্রব্যের (বিশেষতঃ চীনা দ্রব্য) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। এদের সুরক্ষার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমদানির উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি করতে পারে। এই কারণে ভারতের রপ্তানিকে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে (২০০০-২০০১) সালে বিশ্ববাণিজ্যের মাত্র ০.৬৫ শতাংশ ভারতের আওতায় রয়েছে। ভবিষ্যতে এই হারকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৬৩.৫ মুদ্রার বিনিময় মূল্য সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন

কোনো দেশের রপ্তানির হারকে বৃদ্ধি করার জন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্যকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। দেশীয় মুদ্রার মূল্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় অত্যন্ত বেশী হলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যার ফলে রপ্তানি পণ্যের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। সুতরাং দেশের রপ্তানির হারকে বৃদ্ধি করতে হলে একটি সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রার বিনিময়মূল্যনীতি স্থির করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সংস্কার পূর্ববর্তী সময়ে ভারতের মুদ্রার বিনিময়মূল্য সম্পূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মূলতঃ মুদ্রাস্ফীতির হারকে রোধ করার জন্য সরকার টাকার মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে রোধ করা যায় না। তাছাড়া ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে টাকার বিনিময়মূল্যের বিশেষ যোগসূত্র নেই। সুতরাং টাকার বিনিময়মূল্যকে মূলতঃ বাজার নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করবো। প্রথমে আপনারা জানতে পারবেন সংস্কার পরবর্তী সময়ে সরকার মুদ্রার বিনিময়মূল্য সংক্রান্ত নীতিতে কি কি পরিবর্তন এনেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এ প্রসঙ্গে মূলধনীখাতে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতার বিষয়ে আলোচনা করবো।

৬৩.৫.১ সংস্কার পরবর্তী সময়ে গৃহীত নীতিসমূহ

১৯৯১ সালের পরবর্তী তিনবছর সময়ে মুদ্রার বিনিময় নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৯১ সালের মুদ্রার মূল্যমানকে প্রায় ২৪% হ্রাস করা হয়। ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেটে সর্বপ্রথম ভারতীয় টাকাকে চলতি খাতে আংশিক বিনিময়যোগ্য করা হয়। অর্থের বিনিময়যোগ্যতা বলতে বোঝানো হয় যে বিনা নিয়ন্ত্রণে টাকাকে যেকোনো মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাবে। এই আংশিক বিনিময়যোগ্যতার ব্যবস্থা এক বছরের জন্য প্রচলিত ছিল।

এই ব্যবস্থা অনুসারে বিদেশী মুদ্রায় প্রাপ্ত অর্থের ৬০% বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রার মূল্য অনুসারে টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে এবং বাকি ৪০% অর্থ সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে। এছাড়া বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আমদানির ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরাসরি বাজার থেকে বিদেশী মুদ্রায় সংগ্রহ করতে হবে। এই ব্যবস্থাকে "Liberalised Exchange Rate Management System" নামে অভিহিত করা হতো। এই সময় ভ্রমণ, ঋণশোধ, ডিভিডেন্ড, রয়্যালটি বাবদ দেয় অর্থের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা বাজার থেকে সংগ্রহ করা হতো।

আংশিক বিনিময়যোগ্যতার ফলে রপ্তানিকারকদের সুবিধা হয় কিন্তু আমদানি আরও মূল্যবান হয়ে ওঠে।

এর পরে সরকার একটি মাত্র বাজার নিয়ন্ত্রিত বিনিময় মূল্য ব্যবস্থার উপযোগী নীতিসমূহ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে সরকার টাকাকে বাণিজ্য খাতে (Trade Account) পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করেন, এবং এই খাতে যাবতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে টাকার মূল্য, মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অনুসারে স্থির করা হবে, এবং এই প্রকারের লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশীমুদ্রা সংগ্রহের জন্য কোনো বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। বাণিজ্য খাতে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য তার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল চলতি খাতে টাকাকে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করে তোলা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার [International Monetary Fund (IMF)] এর সদস্য দেশগুলির ক্ষেত্রে চলতি খাতে মুদ্রার বিনিময় যোগ্যতা আবশ্যিক ছিল। (মূলধনী খাতে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে), (Article VIII, Section 2, 3 & 4)। কোনো সদস্য যদি এই নীতি গ্রহণ না করতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাকে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চলতি খাতে বিনিময়যোগ্যতা বলতে নিম্নলিখিত লেনদেনের জন্য স্বাধীনভাবে বিদেশীমুদ্রা কেনা বা বিক্রি করার স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়—

(১) এর মধ্যে যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য, চলতি ব্যবসা, পরিষেবা ঘটতি আদান-প্রদান, এবং সাধারণ স্বল্পকালীন ব্যাঙ্ক ব্যবসা জনিত ঋণঘটিত লেনদেনকে বোঝানো হয়।

(২) ঋণের সুদের ও অন্যান্য বিনিয়োগজনিত আয় ;

(৩) ঋণের আসল পরিশোধ জনিত লেনদেন এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অবচয়মূলক অর্থ প্রদান;

(৪) বিশে কর্মরত নাগরিক কর্তৃক প্রেরিত অর্থ।

৬৩.৫.২ চলতি খাতে বিনিময়যোগ্যতার জন্য গৃহীত নীতিসমূহ

চলতি খাতে পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা নিয়ে আসার জন্য ১৯৯৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশীমুদ্রার লেনদেন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শিথিল করেন। এইসব ক্ষেত্রের মধ্যে আছে—

(১) বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারীর বিদেশী মুদ্রা খাত;

(২) ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(৩) বিদেশে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(৪) উপহার এবং বিদেশে কর্মরত ব্যক্তির আয়ের অংশ;

(৫) অনুদান;

(৬) বিদেশের প্রতি দেয় পরিষেবা।

১৯৯৪ সালের ১৯শে অগাস্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(১) চলতি খাতে লেনদেন আরও সরল করা হয়।

(২) অতিরিক্ত বিদেশীমুদ্রার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও সুবিচারের চেষ্টা করবে।

(৩) সরকার "Foreign Currency Non Resident's Accounts (FCNRA) Scheme কে ১৯৯৪ সালের ১৫ই অগাস্ট বাতিল করে দেন।

(৪) "Non-Residents' (Non-Republic) Rupee Deposit Scheme" অনুসারে এই খাতে যে সুদ জমা হয় তা ১৯৯৪ সালের পয়লা অক্টোবর থেকে বিদেশ পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

(৫) Foreign Currency (Ordinary) Non Repatriable Deposit Scheme (FCON) ১৯৯৪ সালের ২০শে অগাস্ট থেকে তুলে দেওয়া হয়।

(৬) উপরিউক্ত জমা প্রকল্পটিতে যে খাতগুলি বর্তমানে চালু আছে তাদের ক্ষেত্রে শেষ হবার দিন পর্যন্ত জমা সুদ পয়লা অক্টোবর থেকে বাইরে পাঠানো যাবে।

(৭) অনাবাসী ভারতীয় কর্তৃক বিনিয়োগের উপর প্রাপ্ত আয় তিন বছর সময়ের মধ্যে করপ্রদানের পর বিদেশে পাঠানো যাবে।

তিন বছর সময়ের মধ্যে করপ্রদানের পর বিদেশে পাঠানো যাবে। ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের পর থেকে ১৯৯৪ সালে অগাস্ট মাস থেকে টাকা চলতি খাতে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে আরও বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। বর্তমানে বিদেশীমুদ্রার কিছু Authorised Dealed (AD) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ভ্রমণের জন্য বিদেশী মুদ্রা দিতে পারে। ১৯৯৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রা দেশের বাইরে পাঠাবার জন্য যে নিয়মাবলী ছিল তা শিথিল করেছিল। সুতরাং বলা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষে টাকা চলতি খাতে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য অর্থাৎ চলতি খাতে যেকোনো লেনদেনের জন্য টাকার বিনিময়মূল্য সম্পূর্ণভাবে বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৬৩.৫.৩ মূলধনী খাতে পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা

মূলধনী খাতে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা বলতে বোঝানো হয় যে ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে মূলধনী খাতে যেকোনো প্রকার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি অবাধে চলাচল করতে পারে। কিন্তু মূলধনী খাতে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিনিময় যোগ্যতার ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর কিছু বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থা সামাল দেবার জন্য সঠিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মূলধনী খাতে সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতার ফলে মূলধনের অবাধ আদানপ্রদান সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, মূলধনবাজার ইত্যাদির কাঠামোকে সুগঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে মূলধন মূলতঃ তিনপ্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ শেয়ারের উপর বিনিয়োজিত অর্থ। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন প্রকার ঋণ এবং অনুদান এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ সবচেয়ে স্থিতিশীল প্রকৃতির মূলধন। শেয়ারের উপর বিনিয়োজিত অর্থ এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রাপ্ত স্বল্পকালীন ঋণ সবচেয়ে অস্থিতিশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। দেশীয় অর্থনীতিতে কোনো সংকটের সৃষ্টি হলে এই ধরনের মূলধনের নির্গমন হয়ে থাকে। এর সঙ্গে মূলধনী খাতে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা থাকলে মূলধনের নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশী মুদ্রার যোগান কমে যাবে এবং মুদ্রার বিনিময় মূল্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। এর ফলে বৈদেশিক ঋণের বোঝা এবং আমদানির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কোনো দেশে মূলধনী খাতে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা থাকলে প্রথমেই মূলধন বাজার বা "Stock Exchange" এর মাধ্যমে দেশীয় শেয়ার ক্রয়ের জন্য বিদেশী মূলধনের আগমন হতে থাকে, এর মধ্যে ফাটকা কারবারের সঙ্গে যুক্ত মূলধনও থাকে। তাছাড়া একই সঙ্গে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বিদেশী মূলধন বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কারণ বহু ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদক এবং ঋণ গ্রহণকারীরা সরাসরি বিদেশের বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। মূলতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং কম বিশ্বাসযোগ্য (Lower Credit Worthiness) ঋণগ্রহণকারীরা দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্ভর করে থাকে। দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় পরিকাঠামো যদি সুদৃঢ় না হয় তবে এইসব ঋণ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হয়। এছাড়া দেখা যায় যে, যদি দেশে সুদের হার বিদেশের চেয়ে বেশী থাকে তবে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি বিদেশের বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে দেশের অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বাসযোগ্য ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ দিয়ে থাকে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্প্রতিক কালে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘটেছিল, তার পূর্বে ঐসব দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় উপরিউক্ত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে, কোনো অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান যদি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে তবে ফাটকা কারবারের সঙ্গে যুক্ত মূলধন এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত ঋণ মূলধনের দ্রুত নির্গমন হতে থাকে। এর ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান আরও হ্রাস পায়, কারণ মূলধনের নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশী মুদ্রার যোগান হ্রাস পায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে যখন মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস পেতে থাকে, এবং স্বল্পকালীন ঋণ মূলধনের নির্গমন হতে থাকে, তখন বহুক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি অর্থ ফেরৎ দিতে সক্ষম হয় নি। কারণ তারা যে ঋণ দেশীয় বাজারে দিয়েছিল, তা বহুক্ষেত্রেই অকার্যকরী সম্পদে পরিণত হয়, যার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সুতরাং বলা যায় মূলধনী খাতে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক পরিকাঠামোর সংস্কার এবং অর্থগত ক্ষেত্রের মূলধন বাজারের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৬৩.৫.৪ মূলধনী খাতে বিনিময়যোগ্যতার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ভারতে মূলধনী খাতে মুদ্রার বিনিময়যোগ্যতা আনার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছেন।

প্রথমতঃ মূলধনী খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং অনাবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রে যারা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী বা ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেছেন তাদের ক্ষেত্রে মূলধনী খাতে ভারতীয় মুদ্রার পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার চার লক্ষ মিলিয়ন ডলারের উপর ভারতীয় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদন পর্যালোচনা করার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেন।

এছাড়া যুগ্ম উদ্যোগ এর যে সব কোম্পানী পেশাগত পরিষেবা বিক্রি করে তারা বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতে মূলধনী খাতে মুদ্রা সম্পূর্ণ বিনিময়যোগ্য নয়। কিন্তু সরকার ধীরে ধীরে মুদ্রার পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। তবে মূলধনী খাতে বিনিয়োগযোগ্যতা নিয়ে আসার জন্য ব্যাঙ্ক এবং মূলধন বাজারের সম্পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন।

৬৩.৬ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলতে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করাকে বোঝানো হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি মনোভাব সর্বদা নিরাশাব্যঞ্জক ছিল। ১৯৯১ সালের আগে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এই বিধিনিষেধের মধ্যে ছিল বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের বিশেষ ক্ষেত্রে আগমন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, কোম্পানীর শেয়ার মালিকানার উপর ৪০% ঊর্ধ্বসীমা, কারিগরী বিদ্যা হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, রপ্তানিকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইত্যাদি।

এপ্রসঙ্গে বলা যায় আশির দশকের পূর্বে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কখনই বেশী উৎসাহ দেননি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রায় ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে বহুতত্ত্ব পেশ করা হয়ে থাকে। যারা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পক্ষে তারা বলে থাকেন যে এর ফলে দেশীয় কারিগরী ও প্রযুক্তির উন্নতি সম্ভব, রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব এবং পরিচালন পদ্ধতি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযুক্তি সম্ভব। কিন্তু একই সঙ্গে বিদেশী বিনিয়োগকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে অনুপোযোগী প্রযুক্তির আমদানি হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই বিদেশী প্রযুক্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের অনুপাত শ্রমের অনুপাত অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে যা ভারতের মতো জনবহুল দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগ অত্যধিক পরিমাণে সংরক্ষিত দেশের পক্ষে সুফলদায়ক নাও হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে যদি দেশের বাজার আমদানির হাত থেকে

সুরক্ষিত হয় তবে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সুরক্ষিত বাজারের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। তারা যখন মুনাফা বিদেশে প্রত্যর্পণ করেন তখন দেশের আয় বিনিয়োগের ফলে হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া অত্যধিক বিদেশী বিনিয়োগের এবং বিদশী বিনিয়োগকারীরা যদি দেশে রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তবে দেশের সার্বভৌমত্বের সংকট দেখা দিতে পারে। উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সংস্কার পরবর্তীকালে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টির উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল তা হলো বিনিয়োগের ফলে দেশে বিদেশী মুদ্রার যেন নির্গমন না হয়।

৬৩.৬.১ বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উদারীকরণ সংক্রান্ত নীতিসমূহ

১৯৯১ সালের পর থেকে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল তাতে বিদেশী বিনিয়োগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়েছে। এই নীতি অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুই সপ্তাহের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় অনুমতি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। স্বয়ংক্রিয় অনুমতি ব্যবস্থার জন্য বিদেশী মালিকানার তিনটি বিশেষ স্তর চিহ্নিত করা হয়েছিল। নতুন শিল্পনীতির Annexure III Part A তে যে ছয়টি খনিজ দ্রব্যের শিল্পকে নথিভুক্ত করা হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে ৫০% অবধি বিদেশী মালিকানা স্বয়ংক্রিয় অনুমতি ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। Annexure III-এ উল্লিখিত ৩৫টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পের ক্ষেত্রে এবং Annexure III-এর Part B তে উল্লিখিত ১৪টি অতিরিক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে ৫১% অবধি মালিকানা স্বয়ংক্রিয় অনুমতি ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। কিছু বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিকাঠামো ক্ষেত্রের জন্য এবং Annexure III-এর Part C তে উল্লিখিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পের ক্ষেত্রে ৯৮% বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সরকার বন্দর এবং সড়ক উন্নয়নের জন্য ১০০% বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। যে সমস্ত বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব স্বয়ংক্রিয় অনুমতি ব্যবস্থার আওতায় আসে না তাদের জন্য Foreign Investment Promotion Board (FIPB) স্থাপন করা হয়েছিল। FIPB-র কর্মপ্রণালীতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্য, সাধারণ ক্ষেত্রে অনুমতি দানের ক্ষেত্রে সরকার ছয় সপ্তাহের সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন।

FIPB কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দিয়ে থাকেন। এগুলির মধ্যে আছে উচ্চ প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিনিয়োগ, রপ্তানিদ্রব্য প্রস্তুতকারক ক্ষেত্র, শক্তি ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, পরামর্শ দান প্রকল্প (Consultancy) এবং বাণিজ্যিক কোম্পানীতে বিনিয়োগ। বৃহৎ শিল্পে এবং বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত শিল্পে বিনিয়োগের উপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে গৃহীত আরও কিছু নীতিসমূহ নীচে বর্ণনা করা হলো—

(১) ভোগ্যপণ্যের দ্রব্য ভিন্ন ৫১% বিদেশী বিনিয়োগের জন্য যে "Dividend Balancing" শর্ত ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(২) বর্তমানে যে সব কোম্পানীতে বিদেশী অংশীদারী বর্তমান, সেক্ষেত্রে বিদেশী মালিকানায় শেয়ারের পরিমাণ বিশেষ কিছু নিয়ম অনুসারে ৫১% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। এছাড়া খনিজ তেল খনন, উৎপাদন, শোধনাগার স্থাপন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদ্যুত, টেলিযোগাযোগ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(৩) অনাবাসী ভারতীয়দের এবং 'Overseas Corporate Bodies" (OCBs) দের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ১০০% মালিকানায় বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে তাদের মূলধন ও অর্জিত অর্থ বিদেশে পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অনাবাসী ভারতীয়দের রপ্তানি ক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে, হাসপাতাল, রপ্তানিকারক ক্ষেত্রে (Export Oriented Unit), রুগ্ন শিল্পে, হোটেল ও পর্যটন ব্যবস্থায় ১০০% বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(৪) বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিলগ্নীকরণ করতে চাইলে তারা সরাসরি শেয়ার বাজারের মাধ্যমে বিলগ্নীকরণ করতে পারবে। পূর্বের মতো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ধারিত দামে শেয়ার বিক্রি করতে হবে না।

(৫) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য ভারত সরকার ১৯৯২ সালের ১৩ই এপ্রিল "Multilateral Investment Guarantee Agency Protocal" সই করেছেন।

(৬) বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ১৯৯২ সালের ১৪ই মে থেকে তাদের বাণিজ্য চিহ্ন (Trade Marks) ভারতে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(৭) Foreign Exchange Regulation Act তে ১৯৯৩ সালের ৯ই জানুয়ারী থেকে উদারীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে যে সব কোম্পানীতে ৪০%-এর বেশী বিদেশী শেয়ার আছে, তাদেরও সম্পূর্ণ ভারতীয় কোম্পানী হিসেবে গণ্য করা হবে।

এছাড়া ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় কোম্পানী ও উৎপাদকদের এক সাধারণ অনুমতি দিয়েছিল যার ফলে বিদেশী বিনিয়োগ এবং বিদেশী অংশীদারদের শেয়ার দেওয়ার জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না।

এছড়া ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে সরকার আর্থিক ক্ষেত্রে "Non Banking Financial Companies" এ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছেন।

৬৩.৬.২ বিদেশী বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ

বিদেশী বিনিয়োগসংক্রান্ত নিয়মাবলী শিথিল করার জন্য, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩৩ মিলিয়ন

ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৩.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছয়। এই সময়ে ভারতে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামগ্রিক বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ০.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.২ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সরকার ৫৪.৩ বিলিয়ন ডলার পরিমাণে বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ে মাত্র ১১.৮ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ বিনিয়োগের অন্তঃপ্রবাহ হয়েছিল।

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ১৯৯০ সালের পর থেকে বিদেশী বিনিয়োগ Non Manufacturing ক্ষেত্রের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে পণ্য প্রস্তুকারক ক্ষেত্র (Manufacturing) এর অংশ ছিল ৮৫% এবং তা কমে ১৯৯৭ সালে ৩৫%-এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ শক্তি, পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) বর্তমানে মূলতঃ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর ফলে স্বদেশী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৯০-এর দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলা যায় চীনের প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ভারতের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (১৯৯৬ সালে, উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী বিনিয়োগের ৩১% চীনে হয়েছিল)। এছাড়া ভারতে বেশীর ভাগ বিদেশী বিনিয়োগ দেশের সম্প্রসারণশীল বাজারের সুবিধা পাওয়ার জন্য নিয়োজিত হয়েছে। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছু করেনি। ৯০-এর দশকে ভারতে সামগ্রিক মূলধন অন্তঃপ্রবাহের দিকে লক্ষ্য দিলে দেখা যাবে যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে শেয়ারের বাজারে (Foreign Institutional Investment) বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশী। তাছাড়া এই ধরনের বিনিয়োগের স্থিতিশীলতা কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনিয়োগ ফাটকা মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় শুধুমাত্র বিধিনিষেধ শিথিল করলে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নয়। চীনের মতো পরিকাঠামোগত উন্নতি করা প্রয়োজন এবং ভারত সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে।

৬৩.৭ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার (Financial Sector Return)

আর্থিক ক্ষেত্র মূলতঃ প্রথাগত (Formal) এবং অপ্রথাগত (Informal) ঋণদানকারী সংস্থা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক দ্রব্য যেমন শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয় বিক্রয়ের বাজার এবং বীমা সংস্থা নিয়ে গঠিত হয়। যেকোনো অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য। আর্থিক ক্ষেত্রের অন্যতম কাজ হলো অন্তর্দেশীয় সঞ্চয়ের আহরণ এবং পুনর্বণ্টন। এই ক্ষেত্র মূলতঃ সঞ্চয়কারীদের অর্থ বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর করে থাকে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের মূলকাজ হলো ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা বা আর্থিক

মধ্যস্থতা (Financial Intermediation) করা। উৎপাদন ক্ষেত্রের দক্ষতা অনেক সময়েই আর্থিক ক্ষেত্রের এই যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে থাকে।

৬৩.৭.১ ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের কাঠামো

ভারতের আর্থিক ক্ষেত্র বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থা নিয়ে গড়ে উঠেছে। স্বল্পকালীন ঋণ মূলতঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতে যেসব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণদানে লিপ্ত আছে, তাদের বেশীরভাগই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। তাছাড়া বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণদান ছাড়াও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে যেমন সওদাগরী ব্যাঙ্কিং (Merchant Banking), মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Mutual funds) বন্ধকী কারবার (leasing), ভেনচার ক্যাপিটাল (Venture Capital) এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা। এছাড়া সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন রাজ্য জেলা এবং মহকুমা স্তরে ছড়িয়ে আছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Land Development Bank) । সামগ্রিকভাবে ভারতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আর্থিক সম্পদ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন ঋণ মূলতঃ কিছু সর্বভারতীয় উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক এবং রাজ্যস্তরের আর্থিক সংস্থাগুলি প্রদান করে থাকে। ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India, IDBI), জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ণ ব্যাঙ্ক [National Agricultural and Rural Development Bank (NABARD)], আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক (Exim Bank), জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক (National Housing Bank) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া ক্ষুদ্রশিল্প, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এছাড়া কিছু বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বীমাসংস্থা আছে যেমন Unit Trust of India (UTI), জীবনবীমা করপোরেশন, [Life Insurance Corporation (LIC)], সাধারণ বীমা সংস্থা [General Insurance Corporation (GIC)]। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এবং আর্থিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন মিউচ্যুয়াল ফান্ড স্থাপন করেছেন তাছাড়া বীমাক্ষেত্রে বেসরকারি, বিদেশী বিনিয়োগের প্রবেশের পথ সুগম করা হচ্ছে। এসব ছাড়াও অসংখ্য বেসরকারি আর্থিক সংস্থা সমান্তরালভাবে মূলতঃ বন্ধকী ক্ষেত্রে পণ্য ঋণদান ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। বর্তমানে মূলধন বাজারে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধন বাজারের কার্যবিধি নির্ধারণের জন্য Securities and Exchange Board of India (SEBI) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্বল্পকালীন অর্থের বাজার বা সমগ্র আর্থিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে থাকে। এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতে কাজ করে থাকে।

৬৩.৭.২ আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের কারণ

স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই

ক্ষেত্র বিভিন্ন সরকারী বিধিনিষেধের জালে আবদ্ধ ছিল। ১৯৭০ সালে ম্যাকিনন এবং শ (Makinan and Shaw) আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের কুফল নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারা 'আর্থিক অবদমন' (financial repression) নামে এক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন যেখানে উন্নয়নশীল দেশে ঋণগ্রহীতা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ইত্যাদি সমস্ত কিছু সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে সরকার সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি এবং নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সরকারের মালিকানা থাকে এবং আন্তর্জাতিক মূলধনের চলাচল সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে সংস্কারের আগে অবধি এই ব্যবস্থা চালু ছিল। বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (কিছু বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক ছাড়া) ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি মালিকাধীন ছিল, সুদের হার সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে (priority sector) এর প্রতি ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন অনুপাত যেমন নগদ জমা অনুপাত (Cash Reserve Ratio) এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio) ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমাকৃত রাশির এক বৃহৎ অংশ সরকারি সিকিউরিটি (Government Securities) ক্রয়ে ব্যবহার করা হতো। এর ফলে, সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের এক বৃহৎ অংশ সরকারের ঘাটতি মেটাতে ব্যয় করা হতো। এইসব ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং বলা যায় ভারতীয় অর্থনীতি আর্থিক দিক থেকে অবদমিত (financially repressed) ছিল এবং এই অবস্থার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ অব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল।

আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(১) ঋণের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার;

(২) সুদের হারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস;

(৩) আর্থিক ক্ষেত্রে প্রবেশের নিয়মাবলী সহজসাধ্য করা;

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির স্বশাসন;

(৫) বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশাধিকার;

(৬) আন্তর্জাতিক মূলধনের চলাচলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস।

এছাড়া আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণের অন্যতম শর্ত হলো আর্থিক ক্ষেত্রের কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসা যাতে সরলীকৃত নীতি ব্যবহার করা যাবে এবং দেশীয় মূলধনের হার হ্রাস পাবে।

ম্যাকিনন এবং শ বলেছেন যে নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক ব্যবস্থায় সুদের হার অত্যন্ত কম থাকে। এর ফলে সঞ্চয়ের হার কম হয়। সঞ্চয়ের একটা অংশ প্রথাগত সরকার নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে সমান্তরাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। এর ফলে সম্পদের বণ্টনে অব্যবস্থা দেখা যায়। তাছাড়া

নিম্নসুদের হারের ফলে বিনিয়োগের উপর গড় লাভের হার হ্রাস পায়। দুই লেখক আশা করেছিলেন যে আর্থিক উদারীকরণের ফলে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগের বণ্টন আরও লাভজনক হবে, এবং বিনিয়োগের হারও বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণের সাফল্য বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর ক্রমের উপর নির্ভর করে থাকে। সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করার পরই এই ক্ষেত্রের উদারীকরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা উচিত। তাছাড়া আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার সবসময়ে বাণিজ্য ক্ষেত্রের সংস্কারের পরে হওয়া উচিত। এর ফলে, আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণের ফলে আগত মূলধন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মানুগ উপায়ে বণ্টন করা যাবে। কৃত্রিমভাবে উচ্চসুদের হার যুক্ত ক্ষেত্রে এই মূলধন চালিত হবে না।

৬৩.৭.৩ ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রের উদারীকরণ

সুদের হার নির্ণয় সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন :

ভারতীয় আর্থিক ও ঋণদান ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সুদের হারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ঋণ দানের সুদ ও জমা টাকার উপর দেয় সুদের পরিমাণ সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। তাছাড়া সরকারি বণ্ডের সুদের হার মুক্ত বাজারের সুদের হারের চেয়ে অনেক কম ছিল। কারণ এই সময়ে সরকার তার নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারি বণ্ড কিনতে বাধ্য করতেন এবং প্রাপ্ত অর্থ সরকারি ঘাটতি মেটাতে ব্যবহার করা হতো। এই নিম্ন সুদের হার বজায় রাখার অন্যতম কারণ ছিল অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করা। আর্থিক ক্ষেত্রের এইসব ত্রুটির কথা ১৯৮৫ সালে চক্রবর্তী কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই কমিটি সরকারি ঋণের পরিমাণ কমাতে বলেছিলেন এবং সরকার যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কদের জমা অর্থের পরিমাণ নিজস্ব ঋণ মেটাতে ব্যবহার করতেন তা কমাতে বলা হয়। (সরকার মূলতঃ Cash Reserve Ratio, Statutory Liquidity Ratio দ্বারা ব্যাঙ্কের অর্থ ঋণ মেটানোর জন্য ব্যবহার করতেন)। তাছাড়া সরকারি ঋণের উপর সুদের হার বৃদ্ধির জন্যও সুপারিশ করা হয়েছিল। এই দ্বিতীয় সুপারিশ ১৯৮০-র মধ্যভাগে চালু করা হলেও প্রথম সুপারিশ ১৯৯২-এর আগে চালু করা হয়নি। ১৯৮০-র মধ্যভাগে সরকারি ঋণপত্রের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এছাড়া সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ট্রেজারী বিল বিক্রি করে থাকেন, সেই বাজারেও বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

১৯৯১ সালে মূলতঃ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২ সালের পর থেকে আর্থিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে সরকার নিলামে বিক্রি করা যায় এবং ৩৬৪ দিন শেষ হবে, এইরকম ট্রেজারী বিল বিক্রি করা শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে ৯১ দিনে শেষ ও নিলামে বিক্রি করা যাবে এই রকম ট্রেজারী বিল চালু করা হয়। এরপর থেকে সরকারের মোট বিক্রীত ট্রেজারী বিলের ৩০% নিলাম করা হয়। তাছাড়া সরকার যে ঋণপত্র বিক্রি করে থাকে ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে তা নিলামে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের হারের উপর পরিবর্তন করা হয়েছিল। ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত

সুদের হারের কাঠামো অত্যন্ত জটিল ছিল। এইসময়ে প্রায় ৫০টি ঋণের বিভাগ ছিল এবং ঋণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সুদের হারেও অনেক তারতম্য করা হতো। ১৯৯৩-র শেষে সুদের হারের উপর মাত্র দুটি নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছিল। ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে সুদের হারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে।

৬৩.৭.৪ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার

ভারতে আর্থিক ব্যবস্থার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। সমগ্র দেশ জুড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অসংখ্য শাখা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতার মান অন্ততঃ নিম্ন ছিল। এই অবস্থার পিছনে বিশেষ কিছু কারণ দায়ী ছিল।

(১) ব্যাঙ্কের সম্পদের অলাভজনক ব্যবহার : ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে দুটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে চলতে হয়। এগুলি হলে নগদ জমা অনুপাত (Cash Reserve Ratio) এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio) CRR অনুসারে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের জমাকৃত রাশির একটা অংশ নগদ অর্থের আকারে রাখতে হয়। এবং SLR অনুসারে জমাকৃত রাশির একটা অংশ সরকারি ঋণপত্র, ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হতো। ১৯৯১ সালে CRR ছিল ১৫% এবং SLR ছিল ৩৮.৫% এর ফলে ব্যাঙ্কের জমাকৃত রাশির একটি বৃহৎ অংশ অলাভজনক কম সুদের সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ করতে হতো, যার ফলে এই অর্থ মূলতঃ সরকারে ঘাটতি মেটাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। যার ফলে অর্থের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হতো না এবং ব্যাঙ্কের মুনাফা কমে যেত.

(২) নির্দেশিত ঋণ (Directed Credit) : ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের অর্থের একটি অংশ কম সুদে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে (Priority Sector) কে ঋণ দিতে হতো। ব্যাঙ্ক ঋণের প্রায় ৪০% অর্থ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণ বাবদ দিতে হতো। কিন্তু এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ ধারই শোধ করা হতো না। যার ফলে ব্যাঙ্কের আয় হ্রাস পায়।

(৩) সুদের হারের নিয়ন্ত্রণ (Administered Interest Rate) : ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুদের হার সরকার দ্বারা নির্দেশিত হতো।

(৪) ব্যাঙ্ক ঋণের গুণগত মান : ব্যাঙ্ক কর্তৃক দেয় ঋণের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্ন ছিল। ব্যাঙ্কগুলি মূলতঃ সামগ্রিক ঋণের পরিমাণের উপর দৃষ্টিপাত করতো। ঋণগ্রহীতার বিশ্বাসযোগ্যতা, তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হতো না। তাছাড়া ঋণদানের সময় অত্যধিক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যেত। তাছাড়া ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করার এক স্বভাব দেখা যায় এবং যেসব ক্ষেত্রে ঋণ ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে তাদের আটকাবার জন্য সঠিক পদ্ধতি ও নিয়মাবলী ছিল না। ব্যাঙ্কের বেশির ভাগ ঋণ অকার্যকর ঋণ হিসেবে দেখানো হতো।

উপরিউক্ত কারণগুলি মূলতঃ ব্যাঙ্কের আয় কমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিচলন ব্যয় অত্যন্ত বেশি ছিল। এর পিছনেও অনেক কারণ ছিল।

(১) পরিচলন অদক্ষতা : বহুক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলির পরিচলন পদ্ধতি অত্যন্ত অদক্ষ ছিল। তাছাড়া কর্মীর বহুলতা, যত্রতত্র ব্যাঙ্কের শাখা সৃষ্টি, ইত্যাদি কারণে ব্যাঙ্কের ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(২) প্রতিযোগিতার অভাব : ভারতে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সুদের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। তাছাড়া পরিষেবা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা বিশেষ লক্ষ্য করা যেত না। ইত্যাদি কারণে ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত অদক্ষ এবং অলাভজনক হয়ে উঠেছিল। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সরকার ১৯৯১ সালের অগাস্ট মাসে নরসীমাম কমিটি (Narasimham Committee) কমিটি স্থাপন করেন। তিন মাসের মধ্যে এই কমিটি তার রিপোর্ট প্রদান করেন। এই কমিটি সামগ্রিক ব্যাঙ্ক কাঠামোর পুণর্গঠন, ব্যাঙ্কের আর্থিক হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তন, অকার্যকর সম্পদ হ্রাসের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। এই কমিটির মূল কিছু সুপারিশ সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো।

(১) এই কমিটি একটি চতুস্তরীয় ব্যাঙ্ক কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। সর্বোচ্চ স্তরে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (SBI) এবং আরও তিন চারটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক থাকবে যারা বিদেশেও তাদের ব্যবসা বিস্তৃত করবে দ্বিতীয় স্তরে আট কিংবা দশটি জাতীয় ব্যাঙ্ক থাকবে যারা দেশে তাদের ব্যবসা বিস্তৃত করতে পারবে। তৃতীয় স্তরে থাকবে আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলি এবং চতুর্থ স্তরে থাকবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যারা কৃষি ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে অর্থের যোগান দেবে।

(২) বেসরকারি ব্যাঙ্ক ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মতোই কাজ করতে পারবে। নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিয়মাবলী সরল করা হবে এবং তাদের শাখা বিস্তারের ক্ষেত্রে আলাদা লাইসেন্স ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে।

(৩) SLR এবং CRR কমিয়ে যথাক্রমে ২৫% এবং ১০% করতে হবে।

(৪) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কমাতে হবে এবং তা ব্যাঙ্ক ঋণের ১০% বেশি যেন না হয়।

(৫) সুদের হারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে এবং সরকারি সুদের হার বৃদ্ধি করতে হবে।

(৬) ব্যাঙ্ক ব্যবসায় মূলধনের অভাব দূর করার জন্য এই কমিটি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছিল। এই কমিটির বক্তব্য অনুসারে ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ঝুঁকিযুক্ত সম্পদের তুলনায় মূলধন প্রয়োজনীয়তা অনুপাত (Capital Adequacy Ratio) ৪% করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তর অনুসারে ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই অনুপাতকে বৃদ্ধি করে ৮% করতে পারবে।

(৭) এই কমিটি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বিলগ্নীকরণের সুপারিশ করেছিল।

(৮) কমিটির বক্তব্য অনুসারে, যে ঋণের ক্ষেত্রে ১৮০ দিনের উপর সুদ জমা করা হবে না, তাদের অকার্যকর সম্পদ (Non Performing Asset) হিসেবে গণ্য করতে হবে। অকার্যকর সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো আয় ব্যাঙ্কের হিসেবে ধরা হবে না।

(৯) এই কমিটি অকার্যকর সম্পদকে চারভাগে ভাগ করেছেন— সাধারণ (Standard), নিম্নমানযুক্ত (Sub-Standard), ঝুঁকিযুক্ত (Doubtful) এবং অলাভজনক সম্পদ (Loss Asset)। এই ধরনের সম্পদের থেকে ক্ষতি কমানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটি একটি সম্পদ পুণর্গঠন ভাণ্ডার (Asset Reconstruction Fund) গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। ব্যাঙ্কের এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিযুক্ত সম্পদ ও অলাভজনক সম্পদ এই ভাণ্ডার কম মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

(১০) এই কমিটি আন্তর্জাতিক স্তরের তুলনায় ব্যাঙ্কের হিসেব রক্ষণ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

(১১) তাছাড়া এই কমিটি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পরিচলন দক্ষতা বৃদ্ধি, কম্প্যুটারের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কমিটি মনে করেছিলেন যে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ কমাতে হবে এবং সামগ্রিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় অর্থদফতরের যে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় তা কমাতে হবে।

এইগুলি ছিল নরসিমহাম কমিটির রিপোর্টের মূল বক্তব্য। এই কমিটির সুপারিশ সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন।

SLR এবং CRR অনুপাতকে যথেষ্ট হ্রাস করা হয়েছে। ২০০১ সালে, CRR কে কমিয়ে ৭.৫% করা হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আয়ের সংজ্ঞা, সম্পদের শ্রেণীবিভাগে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী চালু করেছেন। ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সশীটের হিসাব পদ্ধতি আরও স্বচ্ছ করা হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আর্থিক পর্যবেক্ষণ পর্ষদ (Board of Financial Supervisor) চালু করা হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

(১২) বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্ক দেশে কাজ করছে (যেমন UTI Banck, HDFC Bank, ICICI Bank, Global Trust Bank, Centurian Bank ইত্যাদি)।

১৯৯৮ সালে পুনরায় নরসিমহাম কমিটিকে দ্বিতীয় দফা সংস্কারের জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছিল। এই রিপোর্টে দক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তির কথা বলা হয়েছিল এবং অলাভজনক ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। ব্যাঙ্কের অকার্যকর সম্পদের পরিমাণ কমানোর জন্য এই কমিটি পুনরায় সম্পদ পুণর্গঠন ভাণ্ডার (Asset Reconstruction Fund) গড়ে তোলার কথা বলেছিল। এছাড়া ঋণদানের সময় আরক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। এছাড়া মুদ্রার বিনিময় মূল্যের ওঠাপড়া বৃদ্ধির জন্য মূলধন প্রয়োজনীয়তা অনুপাত (Capital Adcquacy Ratio) বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির

উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। মূলতঃ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে আরও সময়োপযোগী করে তোলার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে আছে মূলধনের বাজার, বীমা সংস্থা এবং উন্নয়মূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৬৩.৮ অব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

এই অংশে আমরা মূলধন বাজার, উন্নয়ণমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Development Finance Corporation) এবং বীমা সংস্থার সংস্কার পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

৬৩.৮.১ মূলধন বাজার

সাম্প্রতিক কালে ভারতে মূলধনী বাজারের ব্যাপক প্রসারণ ঘটেছে কিন্তু মূলধনী বাজারের উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মূলধনী বাজারের কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রেখে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই মূলধনী বাজারের প্রসার ঘটে থাকে।

মূলধনী বাজারের কার্যপদ্ধতি তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯৮৮ সালে Securities and Exchange Board of India (SEBI) নামে এক নির্দেশক সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। ১৯৯২ এবং ১৯৯৫ সালে এই সংস্থার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। দালাল শ্রেণীর বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সংস্থাকে একটি স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

মূলধনের বাজার মূলতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে— প্রাথমিক শেয়ার বাজার— এখানে নতুন শেয়ার বিক্রি করা হয়ে থাকে এবং বিক্রীত শেয়ার বাজার বা মাধ্যমিক (Secondary) শেয়ার বাজার।

প্রাথমিক শেয়ার বাজার

প্রাথমিক শেয়ার বাজারে স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্য SEBI বিভিন্ন নিয়ম জারি করেছে। প্রথমতঃ যেসব সংস্থা নতুন শেয়ার বিক্রি করতে চায় তাদের নিজস্ব প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং ঝুঁকির সম্ভাবনার কথা এবং মুনাফার সম্ভাবনার কথা সবিস্তারে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানাতে হবে। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া SEBI, শেয়ারের কত শতাংশ মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড জাতীয় সংস্থার কাছে বিক্রি করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। তাছাড়া সওদাগরী ব্যাঙ্কদের SEBI-র নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে হবে, এবং এদেরও নির্দিষ্ট মূলধন প্রয়োজনীয়তা অনুপাত বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া SEBI স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে কোম্পানী কর্তৃক বিক্রীত শেয়ারের মূল্যের এক শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে বলেছে যাতে কোম্পানীগুলি সঠিক সময়ে তাদের শেয়ার বিক্রি সংক্রান্ত কাজ শেষ করে। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে বিদেশের বাজারে শেয়ার বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক শেয়ার বাজার (Secondary Market for Equity)

প্রাথমিক শেয়ার বাজারের সমৃদ্ধির জন্য একটি স্বচ্ছ সুগঠিত সঠিক নিয়মযুক্ত মাধ্যমিক শেয়ার বাজার থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মূলধনী শেয়ার বাজার সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শেয়ার বাজারের কর্মপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসা। ভারতের শেয়ার বাজারের অন্যতম সমস্যা ছিল যে শেয়ার দালালরা বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন নিয়মের ব্যতিক্রম করতো এবং তাদের ব্যবসা পদ্ধতির মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল না। এর ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বহুক্ষেত্রেই সুরক্ষিত হতো না এবং 'বদলা' ব্যবস্থার মাধ্যমে যে শেয়ার বিক্রি করা হতো, তার ফলে ফাটকা জাতীয় সমস্যা দেখা দিত। ইত্যাদি কারণে SEBI কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

Securities and Stock Exchange Board Act, 1992 অনুসারে সমস্ত দালালের নির্দিষ্ট শর্তানুসারে নাম নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, উপযুক্ত পরিকাঠামো ইত্যাদি। SEBI, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির পরিচলন সমিতি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করেছিল। তাছাড়া বিদেশী সংস্থাগত বিনিয়োগকারীদের (Foreign Institutional Investers) ভারতে শেয়ার কেনাবেচার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ১৯৯৪ সাল থেকে National Stock Exchange (NSE) কাজ করা শুরু করে, এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই সংস্থা নিজের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল। শেয়ার ক্রেতাদের সুবিধার্থে, D Mat Account ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর করা হয়।

৬৩.৮.২ উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থাগুলির মূল কাজ হলো বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘকালীন ও মধ্যকালীন ঋণ সরবরাহ করা। ভারতে প্রায় ৫৯টি উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান [Development Finance Institutions (DFI)] আছে, এদের মধ্যে তিনটি সংস্থা ছাড়া সবাই শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে থাকে। এগুলি ছাড়া আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা ঋণপত্র এবং প্রাথমিক শেয়ার কিনে থাকে— এগুলি হলো Life Insurance Corporation of India (LIC), General Insurance Corporation of India (GIC) এবং Unit Trust of India (UTI), DFI গুলির মধ্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হলো Industrial Development Bank of India (IDBI), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) এবং Industrial Finance Corporation of India (IFCI)। এছাড়া রাজ্য

স্তরে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রকৃতি

(১) প্রতিযোগিতা : DFI গুলি সংস্কার পূর্ববর্তী সময়ে, ঋণের চাহিদা এবং ঋণের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। মেয়াদী ঋণ সংগ্রহকারী সংস্থাগুলি সরকার থেকে কম সুদে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ পেয়ে থাকে। কিন্তু বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি সরাসরি জনগণের কাছ থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া থাকার জন্য তারাও কোনো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় না। ১৯৯১ সালের পর থেকে এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সঞ্চার করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে মেয়াদী ঋণ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ মূলধন বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া এই সংস্থাগুলি বর্তমানে নিজেদের মধ্যে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর ফলে এই সংস্থাগুলির স্থির মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পেলেও সংস্থাগুলি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য নিজেরাই সচেষ্ট হচ্ছে। যেমন IDBI, ICICI, নতুন ব্যবসা খোলার চেষ্টা করছে। ICICI নতুন মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড সৃষ্টি করেছে এবং নতুন একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক খুলেছে। IDBI সংস্থাটি সওদাগরী ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা শুরু করেছে। রাজ্যস্তরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অবশ্য এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকার সর্বভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন বাজার থেকে সরাসরি অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে। তাছাড়া এইসব সংস্থায় সরকারের মালিকানা কমানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

(২) **স্বশাসন** : বহুক্ষেত্রে এইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সরকারি মালিকানা থাকার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এইসব সংস্থায় স্বশাসনের ব্যবস্থা করা।

(৩) **সঠিক হিসাব পদ্ধতি এবং নিয়মাবলী** : এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব পদ্ধতিও খুব দৃঢ় ছিল না। যার ফলে এইসব সংস্থাগুলি প্রচুর পরিমাণে ঋণ দিয়েছে। কিন্তু তারজন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান বা ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করেনি। যার ফলে বহুক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ হয়নি। ১৯৯৪ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো এই সংস্থাগুলির হিসেব পদ্ধতিও Board of Financial Supervision-এর অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু এই সংস্থাগুলির মূল সমস্যা ছিল যে এদের অকার্যকর সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি ছিল। এবং সরকার রুগ্ন শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই সংস্থাদের থেকে রুগ্ন শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্যর ব্যবস্থা করে থাকে। যার ফলে এইসব সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া হিসেব রক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী রাজ্যস্তরের উন্নয়ণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আবশ্যিক করা হয়নি। সুতরাং সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই সংস্থাগুলির কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা।

৬৩.৮.৩ বীমাক্ষেত্রের সংস্কার

ভারতবর্ষে মূলতঃ দুটি সরকারি সংস্থা ভারতীয় জীবনবীমা নিগম (Life Insurance Corporation of India, LIC) এবং General Insurance Corporation of India (GIC) একচেটিয়া ব্যবসা করে থাকে। কিন্তু পরিষেবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে থাকে। তাছাড়া এই সংস্থাগুলির স্বল্প মুনাফার অন্যতম কারণ হচ্ছে, বহুক্ষেত্রেই সরকারি কাজের জন্য এদের স্বল্পমূল্যে বীমা পরিষেবা দিতে হতো। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার বীমা ক্ষেত্র সংস্কারের জন্য যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তারা রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি নিম্নরূপ—

(১) বীমা ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।

(২) LIC এবং GIC সংস্থা দুটিকে পুণর্গঠন করতে হবে এবং সরকারি মালিকানা সময়ব্যাপী বিলগ্নীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ৫০% এ কমিয়ে আনতে হবে।

(৩) সরকারি ঋণপত্রে এবং সামাজিক উন্নয়ণের জন্য এই সংস্থায় অর্থের ব্যবহার কমাতে হবে, যার ফলে এই সংস্থাটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কম দামে, তাদের পরিষেবা জনগণকে সরবরাহ করতে পারে। LIC-র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৫% থেকে কমিয়ে ৫০% করতে হবে।

(৪) এই ক্ষেত্রের জন্যও SEBI-র মতো একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু এই সুপারিশগুলির মাধ্যমে বীমাক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির যে সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার ছিল তা নষ্ট হয়নি। তবে সাম্প্রতিককালে বীমা ক্ষেত্রকে আংশিকভাবে বেসরকারি এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

৬৩.৮.৪ মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের সংস্কার

১৯৬৪ সাল থেকে ভারতে বৃহত্তম মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড হিসেবে Unit Trust of India (UTI) কাজ করে চলেছে। এই সংস্থাটিও একটি সরকারি মালিকানাধীন একচেটিয়া সংস্থা। অবশ্য ১৯৮৭ সালের পরে এই সংস্থাটির একচেটিয়া অধিকার খর্ব করা হয়েছে। কারণ ১৯৮৭ সালের পর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেও মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড ব্যবসায় নামার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রের সামগ্রিক সম্পদের ৮০% UTI দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

এই ক্ষেত্রের মূল সমস্যা হলো UTI-এর প্রাধান্য। এই সংস্থাটির সমালোচিত হবার অন্যতম কারণ ছিল এরা বিনিয়োগকারীদের ভালো পরিষেবা দিতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ এদের কর্মপদ্ধতিও বহুক্ষেত্রে স্বচ্ছ নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রের সংস্কার মূলতঃ UTI-এর সংস্কারের মাধ্যমে করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা আর্থিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক সংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করলাম।

৬৩.৯ দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কর্মসূচী

১৯৯১ সাল থেকে যে কাঠামোগত পরিবর্তন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে আমরা প্রথম প্রজন্ম বা প্রথম দফার সংস্কার কর্মসূচীরূপে অভিহিত করে থাকি। আমরা ২০০১ সালের গোড়ায় এসে দেখতে পাচ্ছি যে সমষ্টিগত অর্থনীতিতে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্তমানে অনেক স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে। বিশ্ববাণিজ্যে উদারীকরণ এবং বিনিয়োগ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমদানি উদারীকরণ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই বিদেশী প্রযুক্তি আমদানি করতে পারছে। বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলে স্বদেশী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের হার হ্রাস পেয়েছে যা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিপন্থী হতে পারে।

ভারতে কর ব্যবস্থার সংস্কার শুরু হলেও সরকারি খাতে ঘাটতির অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সরকারের ভোগ ব্যয় কমিয়ে ঘাটতি কমানোর পরিবর্তে মূলধনী ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের সামাজিক এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে। তাছাড়া দেখা গেছে যে এই সময়ের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্কার পদ্ধতির পরে আয়ের বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও আমদানি হ্রাস পায়নি। নব্বই এর দশকে সফ্‌টওয়ার রপ্তানির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে যে মূলধন আমদানি হয় তার মধ্যে ঋণের ভাগ কমে গেছে এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব কারণে বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব তথ্যের আলোকে আমরা বর্তমানের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ :

সরকারকে সামাজিক ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে; যার ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়, শিশু মৃত্যু, অপুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি হ্রাস পায়। সমগ্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করতে হবে। একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষাকে অবহেলা করলে চলবে না। কারণ উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষতার মাধ্যমে ভারত একবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনে নিজের স্থান খুঁজে নিতে পারবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হতে হবে এবং দেশে শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটাতে হবে এবং কম্প্যুটার শিক্ষাকে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে আবশ্যিক করে তোলা প্রয়োজন। এরই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক পরিকাঠামো যেমন রাস্তা, সড়ক, সেতু, বন্দর এগুলির জন্যও সরকারকে ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রমের বাজারের পরিবর্তন :

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করতে হবে যাতে সমাজের দরিদ্রতম মানুষেরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সংস্কার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে তার ফলে চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় শ্রম আইনে চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপিত হতো। দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার পদ্ধতিতে শ্রমের বাজারের উদারীকরণ সংক্রান্ত বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে চুক্তি শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকদের কর্মনাশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে সরকারকে সেইসব শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আঞ্চলিক বৈষম্য :

শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার ফলে সরকারের পক্ষে শিল্পে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নেই। এর ফলেই হয়তো সংস্কার পরবর্তী সময়ে আন্তঃরাজ্য আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারকে এই আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

বেসরকারিকরণ :

বেসরকারিকরণের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বেসরকারিকরণ বা বিলগ্নীকরণকে বাজেট ঘাটতি কমাবার পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয় এবং বেসরকারিকরণের পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা উচিত। বিভিন্ন সরকারি কোম্পানীর শেয়ার সরাসরি বিলগ্নীকরণের পরিবর্তে নীলামের মাধ্যমে বিক্রি করা যেতে পারে।

বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি :

ভারতে বর্তমানে যে বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের সুবিধা গ্রহণ করা। চীনের মতো বিদেশী বিনিয়োগকে রপ্তানি ক্ষেত্রের দিকে পরিচালিত করতে হবে এবং বিদেশী বিনিয়োগ যাতে আভ্যন্তরীণ উৎপাদকের স্বার্থ হানি না করে সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ণ সংক্রান্ত নীতি :

সংস্কার পরবর্তীকালে, দেশীয় সংস্থাগুলির নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পরিবর্তে সরাসরি বিদেশী প্রযুক্তি আমদানির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সংস্কার পদ্ধতির বিভিন্ন পদক্ষেপ বিদেশী প্রযুক্তিকে দেশীয় প্রযুক্তির তুলনায় শস্তা করে দিয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়ণের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং দেশীয় প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকিও দিতে হবে।

এই সমস্ত পদক্ষেপ ছাড়াও সরকারকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ

করতে হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বুদ্ধিবৃত্তি (Intellectual Property) সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী। এই কারণে সরকারকে পেটেন্ট সংক্রান্ত আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া Trims বা Trade Related Investment Measures-এর আওতায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমনকি সেবা ক্ষেত্রেও বিদেশী বিনিয়োগকে গ্রহণ করতে হবে। সেই কারণে বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতির সঠিক প্রণয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থার ভারতে আগমনের ফলে দেশীয় শিল্পের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতার ধারাকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

সংক্ষেপে উপরিউক্ত নীতিকে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কর্মসূচীর মূল বক্তব্য বলে মনে করা যায়।

৬৩.১০ সারাংশ

- কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীতে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়।
- এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উদারীকরণ, সরকারি বিধিনিষেধ হ্রাস এবং বিশ্বায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে অর্থনীতির বিস্তার ঘটানো।
- ভারতের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ক্ষেত্র, বিদেশী বিনিয়োগ ক্ষেত্র, ইত্যাদিতে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। আমদানির উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- আর্থিক ক্ষেত্রেও সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারি বিধিনিষেধ হ্রাস করা হচ্ছে ও এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সঞ্চার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বেসরকারি ও বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহ দান করা হচ্ছে।
- ভারতে প্রথম দফার সংস্কার কর্মসূচীর শেষে দ্বিতীয় দফার সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য আর্থিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ণ প্রসারিত করা।

৬৩.১১ অনুশীলনী

১। অর্থনৈতিক সংস্কার বলতে কি বোঝানো হয়?

২। ভারতের সাম্প্রতিকতম বাণিজ্য নীতির বিবরণ দিন।

৩। আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য কি কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার কর্মসূচী বলতে কি বোঝানো হয়?

৬৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Cassen. R and V. Joshi (1995), *'India — The Future of Economic Reform,* Oxford University Press.

২। Chadha, R (2000), *'Exim Policy Changes — Lets' Do, It Right This Time, EPW, April 15. 2000, Vol : XXXV No. 16, pp. 1343-1346.*

৩। Chelloah, R, (1996), *'Towards Sustainable Growth, Essays in Fiscal and Financial Sector Reform in India'* Oxford University Press.

৪। do (1991), *'Economic Reform Strategy for the Next Decade, EPW, Vol. XXXIV, No. 36, Sept. 4, 1999, pp. 2582-2587.*

৫। Dhar, P. K. (1999) *Indian Economy — Its growing Dimension,* Kalyani Publishers.

৬। Jalan Bimal (1991), *'India's Economic Crisis — The Way Ahead,'* Oxford University Press.

৭। do (1992), edited, *'The Indian Economy Problems and Prospects,'* Penguin Books.

(৮) Joshi, V and IMD Little, (1996), *'India's Economic Reforms, 1991-2001',* Oxford University Press.

(৯) Kumar N. (2000), *'Economic Reform and Their Macro Economic Prospects', EPW Vol.-XXXV, No. 10 pp. 803-812.*

(১০) Mehta R, (2000), *'Removal of QRS and Impact on Indian Import', EPW, Vol.-XXXV, No.-19, March-6, 2000. PP-1667-1671.*

(১১) Shome P and H. Mukhopadhyay (1998), 'Economic Liberalisation of the 1990s—Stabilisation and Structural Aspects and Sustainability of Results, EPW, Vol, XXXIII No. 29, 30. July 18, 1998, pp. 1925-1934

(১২) Srinivasan T. (2000), 'Eight Lectures on India's Economic Reform', Oxford Univerisity Press.

একক ৬৪ □ বেসরকারীকরণ

গঠন

৬৪০ উদ্দেশ্য

৬৪.১ প্রস্তাবনা

৬৪.২ বেসরকারিকরণের অর্থ

৬৪.৩ বেসরকারিকরণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ এবং নীতিসমূহ

৬৪.৩.১ সরকারি সংস্থার বিলগ্নীকরণ

৬৪.৪ বিলগ্নীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশন

৬৪.৪.১ রঙ্গারাজন কমিটি

৬৪.৪.২ বিলগ্নীকরণ কমিশন

৬৪.৪.৩ বিলগ্নীকরণ কমিশনের রিপোর্ট

৬৪.৫ বেসরকারিকরণ এবং বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা

৬৪.৫.১ রেলপথ

৬৪.৫.২ সড়ক পরিবহন

৬৪.৫.৩ টেলিযোগাযোগ

৬৪.৬ বেসকারিকরণ ও রাজ্য সরকারী সংস্থা

৬৪.৭ বেসরকারিকরণ ও কিছু প্রশ্ন

৬৪.৭.১ বেসরকারিকরণ ও নির্দেশকের ভূমিকা

৬৪.৭.২ বেসরকারিকরণ ও অতিরিক্ত শ্রমিকের সমস্যা

৬৪.৮ উপসংহার ও সারাংশ

৬৪.৯ অনুশীলনী

৬৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবো—

- বেসরকারিকরণ কাকে বলে?
- ভারতে বেসরকারিকরণের গুরুত্ব;
- বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ;
- বেসরকারিকরণের ফলে উদ্ভূত সমস্যা।

৬৪.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালের যোজনা কমিশন গঠনের আগে, ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে (যা ১৯৫৬ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল) শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়। এইসময় শিল্প কাঠামোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়—

তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহার অনুসারে (মূলধনী দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, ইন্টার মিডিয়েট দ্রব্য) মালিকানার প্রকৃতি অনুসারে (সরকারী ক্ষেত্র, সমবায় উদ্যোগ, বেসরকারী উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ) আয়তন ও কারিগরী পদ্ধতি অনুসারে (কটেজ, গ্রামীণ, ক্ষুদ্রশিল্প, সংগঠিত শিল্প) এই সময় কিছু শিল্পকে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলার জন্য বেছে নেওয়া হয়। কিছু শিল্প শুধুমাত্র বেসরকারী উদ্যোগের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্র সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার উদ্যোগের জন্য খোলা রাখা হয়। কিছু মুখ্য শিল্প যেমন রেলপথ, বিদ্যুৎ শিল্প, দূরসঞ্চার এবং যোগাযোগ (telecommunication) সরকারী ক্ষেত্রের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া যেসব শিল্প মুখ্য কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প যেমন ইস্পাত, খনিজ তৈল, ভারী মেশিন শিল্প ইত্যাদি সরকারী ক্ষেত্রের জন্য রাখা হয়েছিল। এছাড়া দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলি সরকারী উদ্যোগের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এর পিছনে যুক্তিস্বরূপ বলা হয় যে এই মুখ্য শিল্পগুলি যদি সরকারী উদ্যোগে বিস্তার করা যায় তবে দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়ণ সামাজিক চাহিদা অনুসারে গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ সরকারী উদ্যোগের শিল্প থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সরকারের আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং দেশবাসী অত্যধিক করের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

তৃতীয়তঃ বলা হয় যে সরকারী উদ্যোগে শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে অনুন্নত স্থানগুলিতে উন্নয়ণের গতি ত্বরান্বিত হবে।

চতুর্থতঃ সরকারী উদ্যোগের শিল্পে কর্মীদের কাজের পরিবেশ এবং মজুরি বেসরকারী ক্ষেত্রের কাছে এক উদাহরণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন যোজনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই বেসরকারী উদ্যোগকে সঠিক পথে চালনা করার পরিবর্তে তারা নির্দিষ্ট কাঁচামাল যোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পরিচালনগত দক্ষতা (Operational efficiency)

খুবই খারাপ। তাছাড়া বেশির ভাগ সরকারী উদ্যোগে চালিত সংস্থাগুলি রুগ্ন এবং মুনাফা অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তারা সরকারের আয় বাড়াবার পরিবর্তে সরকারী কোষাগারের বোঝা হিসাবে গণ্য হয়। এইসব কারণে ১৯৯১ সালে যখন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তখন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

৬৪.২ বেসরকারীকরণের অর্থ

বেসরকারীকরণ বলতে বোঝায় সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাগুলি মালিকানার সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া। এছাড়া বেসরকারীকরণের উদ্যোগের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার পরিচালন সক্ষমতা বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়াকে বোঝানো হয়।

ভারতবর্ষে বেসরকারীকরণ বলতে মূলতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণকে বোঝানো হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগের জন্য আলাদা করা হয়েছিল সেইসব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের প্রবেশের অনুমতি প্রদানকেও বোঝানো হয়। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংস্থা সতের থেকে আটে নামিয়ে এনেছে। বর্তমানে ছয়টি সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত ক্ষেত্রের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্র, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই সব ক্ষেত্রেও সরকার চাইলে বেসরকারী উদ্যোগকে আমন্ত্রণ করতে পারে।

ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্র যেমন খনি, রেল, পরিবহন, ব্যাঙ্ক, বীমা যোগাযোগ বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্র সরকারী উদ্যোগেই মূলতঃ পরিচালিত হয়। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষতার কথাও সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন সরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সরকারী ক্ষেত্রের মুনাফার হার সর্বোচ্চ বেশী। (সামগ্রিক মুনাফা অপচয় বাদ দিয়ে মূলধনের ২০ শতাংশ) অপেট্রোলিয়াম সরকারী ক্ষেত্রের জন্য এই অনুপাত ৯%। ভারতবর্ষে মোট বিনিয়োগের এক বৃহৎ অংশ সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। যেমন ১৯৮৬-৮৭ সালে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ৫০% ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ২৭% উৎপাদন করে। এছাড়া এক বৃহৎ সংখ্যক সরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগ মুনাফা অর্জনে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। ১৯৯২/৯৩ সালে ২৩৭টি কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগের মধ্যে ১০৪টিই মুনাফা অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। [Joshi and Little (1996)] বেসরকারীকরণের পিছনে মুল যুক্তি ছিল সরকারী উদ্যোগের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। এছাড়া বেসরকারীকরণের পিছনে আরও কিছু যুক্তি দেখানো হয়।

প্রথমতঃ বেসরকারী উদ্যোগকে আমন্ত্রণ করা হলে সরকারী ক্ষেত্রের পক্ষে বিনিয়োগের জন্য মূলধন আহরণ পদ্ধতি আরও সহজসাধ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ আশা করা হয় যে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে।

তৃতীয়তঃ বলা যায় যে সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য (যেমন বিদ্যুৎ, সার ইত্যাদি মূলতঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এইসব দ্রব্যের মূল্য আরও উৎপাদন ব্যয়ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত করা যাবে। ভারতবর্ষে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের মূল্য অত্যন্ত কম। যার ফলে বিদ্যুতের অপচয়ের হার অত্যন্ত বেশী। একইভাবে বলা যায় সারের মূল্যে অত্যধিক ভর্তুকি প্রদানের ফলে এর দাম অত্যন্ত কম যায়, ফলে সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অপচয়ের হার অত্যন্ত বেশী। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এইসব ক্ষেত্রে সম্পদের ব্যবহার আরও অর্থনৈতিকভাবে করা যাবে।

তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে শিল্পের প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে শিল্পক্ষেত্রকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ কিছু শিল্প আছে যাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করা সম্ভব। এরমধ্যে সমস্ত উৎপাদিত সামগ্রী ও খনিজ দ্রব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছু শিল্প আছে যাদের সামগ্রী বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা সম্ভব নয়,— যেমন বিদ্যুৎ, জল, পরিবহন যোগাযোগ ইত্যাদি। এইসব বাণিজ্যিক ভাবে অবিক্রীত দ্রব্য সামগ্রী মূলতঃ কেন্দ্রীয় বিভাগীয় উদ্যোগে (যেমন রেল পরিবহন, যোগাযোগ) এবং রাজ্য সরকারী উদ্যোগে (যেমন বিদ্যুৎ) পরিচালিত হয়ে থাকে।

এর মধ্যে প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিয়ে আসা অনেক সহজ কাজ, যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনও বাধা না থাকে। যার ফলে এদের বেসরকারীকরণ অনেক সহজসাধ্য কাজ।

৬৪.৩ বেসরকারীকরণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ এবং নীতিসমূহ

৬৪.৩.১ সরকারী সংস্থার বিলগ্নীকরণ

১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলি বেসরকারীকরণের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৯১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ পর্যন্ত ৩১টি শিল্পের ৩ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ শেয়ার বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা এবং মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের কাছে বিক্রী করা হয়েছিল। ১৯৯১-৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থার ৪% শেয়ার বিক্রি করে ৩০৩৮ কোটি টাকা সরকার অর্জন করে।

১৯৯২-৯৩ সালে ১৬টি সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থার শেয়ার বিক্রী করে ১৯৯২ কোটি টাকা পাওয়া যায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে সব মিলিয়ে ১১.৩৭ কোটি টাকার ৬টি সরকারী উদ্যোগের শেয়ার বিক্রি করা হয় এবং সরকার ২২৯৬ কোটি টাকা আয় করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সরকার ২২০০ কোটি টাকার সরকারী উদ্যোগের শেয়ার বিক্রি করেন।

১৯৫-৯৬ সালের ৬ই অক্টোবর শিল্প মন্ত্রকের সরকারী উদ্যোগ বিভাগে একটি নির্দেশনামা অনুসারে সরকারী উদ্যোগের শেয়ার ওভারসীস করপোরেট বডি (Overseas Corporate Bodies — OCB's) বিদেশী সংস্থাগত বিনিয়োগকারী (Foreign Institutional Investors — F, II's) দের বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয় যার মধ্যে উচ্চ মুনাফা অর্জনকারী সংস্থা (যেমন SAIL, ONGC, Indian Oil Corporation (IOC) Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), VSNL ইত্যাদি)।

১৯৯৫-৯৬ সালের প্রথম দফার বিলগ্নীকরণের জন্য চারটি সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ONGC, SAIL, MTNL এবং CCIL। কিন্তু এই দফায় সরকার মাত্র ১৬৮.৬২ কোটি টাকা লাভ করে, যেখানে ২০০০ কোটি টাকা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। ১৯৯৬-৯৭ সালে সরকার ৪৫৫ কোটি টাকা বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে অর্জন করেছিল। ১৯৯৭-৯৮ সালে ৯০৬ কোটি টাকা বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ১৯৯৮-৯৯ সালে সরকার বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে ১০,০০০ কোটি টাকা লাভ করে। ১৯৯৮-৯৯ সালে এই অর্থ পাওয়া যায় মূলতঃ JOC, ONGC এবং GAIL এই তিনটি সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে।

১৯৯২ সাল থেকে সরকার ৩৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করেছে। ১৯৯৮-৯৯ সাল অবধি সরকার মোট ১৮,৭০০ কোটি টাকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করেছে। ২০০১-২০০২-এর বাজেট অনুসারে সরকার কম পরিমাণে শেয়ার বিক্রির পরিবর্তে বেশি পরিমাণ শেয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০০১-২০০২ অনুসারে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিলগ্নীকরণ করা হবে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে আছে VSNL, Air India এবং Maruti Udyog Limited.

৬৪.৪ বিলগ্নীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশন

৬৪.৪.১ রঙ্গারাজন কমিটি

১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে সরকার Committee of Disinvestment of Share of Public Sector Undertakings গঠন করেন। এর সভাপতি ছিলেন সি. রঙ্গারাজন। এই কমিটির মূল সুপারিশগুলো হলো—

(১) বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা শিল্পনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সরকারী ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ৭৪ শতাংশ বিলগ্নীকরণ করা যাবে।

(২) বাৎসরিক বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার পরিবর্তে এ বিষয়ে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে পরিস্কার কর্মসূচী স্থির করতে হবে।

(৩) এছাড়া আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্থ যোগানের ব্যবস্থার পুণর্গঠন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এক স্বাধীন নির্দেশক কমিশন গঠনের কথা বলা হয়।

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের সময় শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দিক বিবেচনা না করে উক্ত সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও চিন্তা করা উচিত।

(৫) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিক এবং কর্মচারীদের কাছে ঐ সংস্থার শেয়ার বিক্রির জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(৬) বিলগ্নীকরণের থেকে প্রাপ্ত অর্থের দশ শতাংশ অর্থ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

(৭) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের জন্য এক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই কমিটি সংস্কার, পুণর্গঠন এবং বিলগ্নীকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচী গঠন এবং পর্যালোচনা করবে। সরকার এই কমিটির অনেক সুপারিশ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে রঙ্গারাজন কমিটির সুপারিশ অনুসারে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ারে মূল্য নির্ধারণ এবং বিলগ্নীকরণের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করবে।

৬৪.৪.২ বিলগ্নীকরণ কমিশন (Disinvestment Commission)

১৯৯৬ সালের ২৩শে আগস্ট সরকার এক নির্দেশনামা জারি করে বিলগ্নীকরণ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন G.V. Ramkrishna। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিলগ্নীকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মসূচী স্থির করা। এর মূল কাজ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় বিলগ্নীকরণের মাত্রা নির্ধারণ করা, বিক্রয় পদ্ধতি পরিচালনা, করা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নির্ধারণ, কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া এই কমিশন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সংক্রান্ত সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কাজ তত্ত্বাবধান করবে। তবে শেয়ার বিক্রির কাজ Department of Public Enterprise-এর মাধ্যমে করা হবে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে এই কমিশনের দায়িত্বভার অনেক সঙ্কুচিত করা হয়। বলা হয় যে এই কমিটি শুধুমাত্র উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া এই কমিটির শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতিতে যে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা ছিল তা প্রত্যাহৃত হয়।

এই কমিটি তার কার্যকালে বিভিন্ন রিপোর্ট পেশ করেছে। ১৯৯৬ সালের পর থেকে সরকার বিভিন্ন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার বিলগ্নীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ONGC, GAIL, SAIL, MTNL, IPCL, NTPC, BEML, Power Grid Corporation of India, IOC, Bongaigaon Refinieries ইত্যাদি। বিলগ্নীকরণ কমিশন এর মধ্যে কিছু শিল্পকে মুখ্যশিল্প বলে গণ্য করে। যাদের শেয়ার বিক্রীর ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশের কম যাতে বিদ্যুৎ টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারী একচেটিয়া সৃষ্টি না হয়। অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে ৭৯ শতাংশ বিলগ্নীকরণের কথা বলা হয়। তাছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিল্পের ক্ষেত্রের এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬৪.৪.৩ বিলগ্নীকরণ কমিশনের রিপোর্ট

বিলগ্নীকরণ কমিশনের প্রথম রিপোর্ট অনুসারে তিনটি সরকারী উদ্যোগের শেয়ার বিক্রির জন্য সুপারিশ করা হয়। এগুলি হল—GAIL (49%), Indian Tourism Development Corporation (ITDC ৭৯%), এবং Modern Foods (১০০%)। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে এই কমিশন তার দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করে। এতে ছয়টি সরকারী উদ্যোগের বিলগ্নীকরণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে এই কমিশন তার তৃতীয় দফার সিদ্ধান্ত পেশ করেছিল। এই দফায় মূলতঃ ১৫টি সরকারী উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে সরকার এককালীন ভাবে কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ এবং কিছু ক্ষেত্রে ৪৯%

শতাংশ শেয়ার বিলগ্নীকরণের কথা বলেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রের জন্য অবশ্য যৌথ উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া কিছু কিছু সংস্থা যেমন MTNL বা Container Corporation of India Ltd. এদের ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণের হার বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। তবে এই রিপোর্ট বিভিন্ন খনিজ তেল সংস্থা যেমন Oil India Ltd., Oil and Natural Gas Commission ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ পিছিয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করেছিল।

১৯৯৭ সালের ৬ই অগাস্ট এই কমিশন তার চতুর্থ রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট অনুসারে সরকার 'পবন হন্স হেলিকপ্টারস লিমিটেড' (Powan Hans Helicopters Limited) এর সম্পূর্ণ মালিকানা বিক্রির জন্য সুপারিশ করে। এছাড়া সরকার Shipping Corporation of India-র শেয়ার তৈলশোধনকারী কোম্পানীগুলোর কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব রাখে। 'পরন হন্স হেলিকপ্টারস লিমিটেড'কে এর মূল ব্যবহারকারী Oil and Natural Gas Commission (ONGC)-র সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়। এই রিপোর্টে অবশ্য Power Grid Corporation India-র বিলগ্নীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কমিশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিন্তু মুনাফা অর্জনে অক্ষম সংস্থাগুলির শেয়ার-এর মূল ব্যবহারকারী সরকারী সংস্থার কাছে বিক্রির জন্য সুপারিশ করে। যেমন Shipping Corporation of India Limited-এর শেয়ার সরকারী উদ্যোগের তেল কোম্পানীর কাছে বিক্রির কথা বলা হয়, এর ফলে পরোক্ষভাবে সংস্থাগুলি সরকারের অধীনে থাকে।

এই রিপোর্টে অবশ্য সরকারের কিছু সমালোচনাও করা হয়েছিল বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে। সরকারী সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ করা এবং এদের প্রতিযোগিতা সম্মুখীন করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সরকার বিলগ্নীকরণকে কোষাগারের ঘাটতি মেটাবার একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করছিলেন।

১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে এই কমিশন তার পঞ্চম রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কমিশন বিলগ্নীকরণ পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে না। কমিশন একটি "Standing Empowered Group" গঠনের কথা বলেছিল। এর মূল কাজ হবে বিলগ্নীকরণ পদ্ধতি, সময়, শেয়ারের মূল্য ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করা এবং বলা হয় এই কমিশন মূলতঃ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কমিশন তার ষষ্ঠ রিপোর্ট পেশ করে এবং তিনটি মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ সংস্থা বন্ধ করে দেবার জন্য সুপারিশ করা হয়। এই তিনটি সংস্থা হলো Electronic Trade and Technology Development Corporation, The Hindustan Vegetable Oil Limited, Rehabilitation Industries Corporation Limited, কমিশন এই তিনটি সংস্থার কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত অবসর ভাতা ও বীমা এবং স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প তৈরীর জন্য সরকারকে সুপারিশ করেছিল। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কমিশন তার সপ্তম রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে কমিশন আরও কিছু সরকারী উদ্যোগের বিলগ্নীকরণের কথা বলেন। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে এই কমিশন Air India Ltd., Central Electronic Ltd. ইত্যাদি সংস্থার শেয়ার বিক্রির সুপারিশ করেছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি ভারতে সংস্কার কর্মসূচী শুরু হবার পর অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ করা

হয়েছে। তবে সরকারের সমালোচনা করে বলা যায় বিলগ্নীকরণের থেকে প্রাপ্ত অর্থ মূলতঃ কোষাগার ঘাটতি মেটাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬৪.৫ বেসরকারীকরণ এবং বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা

আমরা আগেই বলেছি যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে যেগুলি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করে যেগুলির বেসরকারীকরণের কাজ অনেক সহজ। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্র যেগুলি মূলতঃ বাণিজ্যিকভাবে অবিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে এবং যেখানে একচেটিয়াকরণের সম্ভাবনা খুব বেশী সেখানে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা খুবই শক্ত কাজ। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে বিদ্যুৎশিল্প। বিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সম্ভব হলেও বিদ্যুৎ বণ্টন মূলতঃ একচেটিয়া শিল্প। রেল পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, জল এবং গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই সম্ভাবনা দেখা যায়। অবশ্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এইসব একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণের কাজ বিগত কয়েক দশক ধরেই চলছে। কিন্তু এইসব সংস্থার বেসরকারীকরণ করা হলেও এদের সরকারী নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রাখা হয়েছে।

ভারতে রেলপরিবহণ এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া আধিপত্য আছে। এগুলি বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরিকাঠামো ক্ষেত্রের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার কার্যপদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

৬৪.৫.১ রেলপথ

প্রথমে আমরা রেলপথের বর্তমান অবস্থা এবং এর বেসরকারীকরণ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবো। ভারতে সামগ্রিক পণ্যশুল্কে রেলের অংশ ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে তা ৩৮ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ১৯৮০-৮১ সালে ছিল ৬২ শতাংশ একই সঙ্গে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও রেলের অংশ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ভারতে রেলের এই অবস্থার অন্যতম কারণ অবৈজ্ঞানিক শুল্ক কাঠামো।

ভারতে রেলপরিবহনে যাত্রীভাড়ার হার অত্যন্ত কম। ১৯৯৬-৯৭ সালের রেলের সামগ্রিক আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ যাত্রীভাড়া বাবদ প্রাপ্ত হয়েছে। মূলতঃ অত্যধিক পণ্যমাসুলের দ্বারা রেল যাত্রী পরিবহন বাবদ ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করে। এছাড়া রেলের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে। যেমন বিভিন্ন দূরের অঞ্চলে অলাভজনক হলেও রেলচালানো, সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জিনিস পরিবহন। এসব সংক্রান্ত ব্যয়মূল্য মূলতঃ পণ্যমাসুলের দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এছাড়া রেলের পরিবহনের গুণগতমান ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এবং সম্পদের ব্যবহারের হারও খুব খারাপ। এইসব কারণে রেলব্যবস্থার সংস্কার ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। কিন্তু রেলের মতো সংস্থাকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ অসম্ভব ব্যাপার। সেই কারণে রেল পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু কাজ বেসরকারীকরণের কথা উঠছে। যেমন রেলে খাদ্য সরবরাহ (Catering Service), সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, রেলে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ইঞ্জিন ইত্যাদি উৎপাদন, স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

৬৪.৫.২ সড়ক পরিবহন

রেল পরিবহনের সঙ্গে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রেও রাস্তা সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের উন্নতি দেশের পরিবহন যোগাযোগ রাস্তা ইত্যাদির সুবিধার উপর নির্ভর করে। ভারতে সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব মূলতঃ Public Works Department (P.W.D.) এর উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু সরকারের ঘাটতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সড়ক নির্মাণ বা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ খুবই ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু রেলে পণ্যশুল্ক অত্যধিক বেশী হবার জন্য সড়ক পথে পরিবহনের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সড়কের উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণ সেই হারে হচ্ছে না। ভারতের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২০ শতাংশ জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এইসব কারণে ১৯৯৫ সালে জাতীয় সড়ক আইনেব সংশোধন করা হচ্ছে। এই সংশোধনী অনুসারে বেসরকারী ক্ষেত্র সড়ক নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে এবং এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিল Built, Operate and Transfer (BOT)। জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং Express Way নির্মাণের জন্য সরকার বেসরকারী এবং বিদেশী পুঁজি, BOT পদ্ধতিতে ৩০ বছরের জন্য ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে বেসরকারী ক্ষেত্রে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভারতে একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০,০০০ কিমি Express Way নির্মাণের প্রয়োজন আছে। এর জন্য ৮০,০০০ কোটি টাকা থেকে ১০০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এছাড়া আরও ৫২, ০০০ কোটি টাকা বর্তমান সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন। এইসব কারণে এই বেসরকারী বিনিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

৬৪.৫.৩ টেলিযোগাযোগ

ভারতে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারীকরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে সরকার নতুন টেলিযোগাযোগ নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতি অনুসারে সরকার কিছু মূল (Basic) এবং ভ্যালুঅ্যাডেড মূল্যযোগ (Value added) সেবার (Services) ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা মূল্যের বিনিময়ে অনুমতি পত্র (Licence) বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ বিভাগের (DOT)-এর কর্তৃত্ব খর্ব হবে। Public Mobile Ratio Trunked Service (PMRTS)-এর জন্য সরকার তিরিশটি শহরে ১৪টি কোম্পানীকে ৪৬টি অনুমতি পত্র বিতরণ করেছে। সেলুলার মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রেও সরকার বেসরকারী সংস্থাকে লাইসেন্স বিতরণ করেছে। ১৯৯৭ সালে Telcom Regulatory Authority of India (TRAI) নামে স্বাধীন এক নির্দেশক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে এই ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে।

৬৪.৬ বেসরকারীকরণ এবং রাজ্য সরকারী সংস্থা

বিভিন্ন রাজ্যসরকারী সংস্থার মধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির মূল সমস্যা অত্যধিক ক্ষতির হার। এর মূল কারণ ভারতে বিদ্যুতের মূল্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যধিক কম। (যেমন তামিলনাড়ুতে বিদ্যুৎ কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে) এছাড়া বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় চুরির মাত্রা অত্যন্ত

বেশী। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য সরকার নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রের নির্মাণের ভার বেসরকারী হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালের অগস্ট মাস অবধি সরকার বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ১৮৯টি প্রস্তাব পেয়েছিলেন। এর মধ্যে যদিও খুব কম সংখ্যক স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা যায় স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা যেমন ভারতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, তেমনি তারা কিছু নতুন সমস্যার সৃষ্টিও করে। বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা প্রথমতঃ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রের রূপায়ণের সময় অনেক বেশী লাগে এবং উৎপাদন ব্যয় পূরণের জন্য সময় অত্যন্ত বেশী লাগে। এছাড়া এইসব ক্ষেত্রে মুনাফার হারও কম। এইজন্য বিনিয়োগকারীদের স্বল্পসুদে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আর্থিক সংস্থাগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে মূলতঃ উচ্চসুদে স্বল্পকালীন ঋণ দিয়ে থাকে। যার ফলে এইসব প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির সম্ভাবনা অনেক বেশী। এছাড়া এইসব ক্ষেত্রেই রাজ্যসরকারগুলি অত্যন্ত বেশী মাত্রায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। যার ফলে প্রকল্প রূপায়ণের সময় আরও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ভারতবর্ষে যেহেতু, বিদ্যুৎ পরিবহন এবং বণ্টন (Transmission and Distribution) সম্পূর্ণভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির অন্তর্ভুক্ত। বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদককে সেজন্য উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাজ্য সরকারকেই বিক্রয় করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলি এই ঝুঁকি কখনই নিতে চায় না, কারণ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির আর্থিক দুরবস্থার জন্য তারা পাওনা মেটাতে দেরী করে থাকে। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে Counter Guarantee-র ব্যবস্থা করতে হয়। Enron Development Corporation কর্তৃক মহারাষ্ট্রের দাভোলে নির্মিত বিদ্যুৎকেন্দ্র, হিন্দুজাদের বিশাখাপত্তনমে নির্মিয়মান বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইত্যাদিতে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারী বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি কমানোর জন্য Counter guarantee-র ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া বেসরকারী বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির অন্যতম সমস্যা হলো এদের প্রকল্পে ব্যয় অত্যধিক হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। যেমন Enron এর দাভোল বিদ্যুৎক্ষেত্র বা Congentrix-এর ম্যাঙ্গালোর বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়েছিল। যার ফলে এদের ধার্য করা বিদ্যুতের হার অত্যধিক বেশী। যা বেশীর ভাগ ক্রেতার আয়ত্তের বাইরে। এইজন্য বলা যায়, বিদ্যুৎক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ করা হলেও বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায় বিদ্যুৎক্ষেত্রে কিছু বেসরকারী বিনিয়োগ হলেও মোট চাহিদার তুলনায় তা খুবই কম। তাছাড়া স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের দক্ষতা বাড়াবার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির পুণর্গঠন এবং দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

৬৪.৭ বেসরকারীকরণ ও কিছু প্রশ্ন

৬৪.৭.১ বেসরকারীকরণ ও নির্দেশকের ভূমিকা

আমরা উল্লেখ করেছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্র যা মূলতঃ সরকারী উদ্যোগের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে তাদের বেশীর

ভাগই স্বাভাবিক একচেটিয়া (Natural Monopoly) শিল্প। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সঞ্চার করলেও বেসরকারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পে এক স্বাধীন নির্দেশকের নিয়োগ অত্যন্ত জরুরী। এর ফলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অনেক কমানো যাবে। নির্দেশকের মূল কাজ হবে এই ক্ষেত্রের শিল্পগুলি যাতে লাইসেন্সের নিয়ম অনুসারে চলে যা সুনিশ্চিত করা এবং মূল্যনীতি নির্ধারণ করা যাতে বিনিয়োগকারীরা সঠিক পরিমাণ অর্থ ফিরে পেতে পারেন।

৬৪.৭.২ বেসরকারীকরণ ও অতিরিক্ত শ্রমিকের সমস্যা

ভারতবর্ষে সরকারী উদ্যোগের অন্যতম সমস্যা অতিরিক্ত শ্রমিকের বোঝা। বেকার সমস্যার উপযুক্ত সমাধানে অক্ষম হয়ে সরকারী উদ্যোগে অনুৎপাদনশীল শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ানো হয়েছিল। সরকারী উদ্যোগগুলির ক্ষতির অন্যতম কারণ এদের আয়ের এক বিশাল অংশ অনুৎপাদক শ্রমিকদের বেতন বাবদ ব্যয় করতে হয়। সংস্থার পূর্ণ বেসরকারীকরণ করা হলে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কর্মচ্যুত হবেন। এই সমস্যাটি বেসরকারীকরণের অন্যতম বাধা। সুতরাং সরকারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুণর্বাসন, বিভিন্ন অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে। এই সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে সরকার ১৯৯২ সালে National Renewal Fund সৃষ্টি করেছেন। শিল্পক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য যে সব শ্রমিক কর্মচ্যুত হবেন তাদের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয় তত্ত্বাবধান করার জন্য এই ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটে NRF এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এই ভাণ্ডার থেকে মূলতঃ সরকারী উদ্যোগে কর্মরত শ্রমিকদের স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পগুলিতে অর্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৪ সাল অবধি ৭৫,০০০ এদের বেশীর ভাগই বন্ধ হয়ে যাওয়া National Textile Corporation-এর বিভিন্ন মিলের শ্রমিক এই ভাবে অবসরগ্রহণ করেছে। সুতরাং বেসরকারীকরণের সঙ্গে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুণর্বাসনের ব্যাপারেও সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৬৪.৮ উপসংহার এবং সারাংশ

এই এককে আপনারা বেসরকারীকরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারলেন। এ প্রসঙ্গে মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ—

- স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিল্পোন্নয়নের সময়ে সরকারী ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
- সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলি আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ। কিন্তু অলাভজনক শিল্পগুলি মূলতঃ সরকারী কোষাগারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সঞ্চার করার জন্য বেসরকারীকরণ করার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

- বেসরকারীকরণ বলতে মূলতঃ সরকারীক্ষেত্রের শিল্পগুলির বিলগ্নীকরণ বোঝানো হচ্ছে এবং সরকারের জন্য সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত কিছু ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে রেল পরিবহণ, বিদ্যুৎক্ষেত্র, বেসরকারীকরণ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়।

৬৪.৯ অনুশীলনী

১। ভারতে বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিগুলি আলোচনা করুন।

২। পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রের জন্য বেসরকারীকরণ পদক্ষেপ কি পরিচলনগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১। বিলগ্নীকরণ কমিশন কি?

২। বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্য কি কি?

৬৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Dhar, P. K. (1999), *Indian Economy—Its Growing Dimensions, Kalyni Publishers*

২। Joshi and Little (1996), *India's Economics Reforms—1991-2000.* Oxford University Press.

৩। Srinivasan, T. N. (2000), *Eight Lectures on India's Economic Reform,* Oxford Univrsity Press.

৪। Matoo, Agita (2000), *Indian Railways, Agenda for Reform. EPW March 4-10, 2000, Vol XXV, No-10 pp 771-778.*

৫। Baijal P (1999) *Restucturing Power Sector in India A Base paper EPW Sept-25 Vol. XXXIV No.-39, pp. 2795-2803.*

৬। D. Sa, A Narasimha Marthy, A. K. N. Reddy (1999), *Indias Power Sector Liberalisation. An Overview EPW, June, 5, 1999 Vol. XXXIV. No. 23 pp. 1427-1434.*

একক ৬৫ ☐ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্কার

গঠন

৬৫.০ উদ্দেশ্য

৬৫.১ প্রস্তাবনা

৬৫.২ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্ম

৬৫.৩ উরুগুয়ে বৈঠক, ডাঙ্কেল প্রস্তাবনা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৬৫.৪ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৬৫.৪.১ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিবাদ মীমাংসা সংক্রান্ত পদ্ধতি

৬৫.৪.২ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বৈঠক

৬৫.৫ ভারত ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৬৫.৬ সারাংশ

৬৫.৭ অনুশীলনী

৬৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন

- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্ম ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এর গুরুত্ব;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আলোচনাধীন বিষয়সমূহ;
- ভারত ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৬৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে আলোচনা করবো। ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা [World Trade Organisation (WTO)]-র জন্ম হয়েছিল। ভারত আরও ১৩২টি দেশের মতো প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই সংস্থার সদস্য। এখনও

বহুদেশ যেমন চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া এই সংস্থার সদস্য হতে বাকি আছে। WTO বিশ্ববাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি, যা পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত হবে সেগুলির রক্ষার ব্যাপারে পরিচালকের আসন গ্রহণ করবে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন সদস্যদের আভ্যন্তরীণ বিতর্ক বিবাদ মীমাংসার জন্যও কাজ করবে। এই এককে আমরা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উৎপত্তি, তার বিভিন্ন আইন এবং ভারতের উপর এই সংস্থার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবো।

৬৫.২ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্ম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশগুলি বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। ১৯৪৭ সালে ২৩টি রাষ্ট্রের সমঝোতা ক্রমে General Agreement on Tariffs and Trade সংক্ষেপে GATT চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববাণিজ্যে বিভিন্ন বাধা হ্রাস করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। ভারত প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই GATT-এর সদস্য ছিল। GATT-র মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ জীবনধারণের মানের উন্নয়ণ।

দ্বিতীয়তঃ কর্মশক্তির পূর্ণ নিয়োগ এবং আয় ও চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধি।

তৃতীয়তঃ বিশ্বের বিভিন্ন সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার।

চতুর্থতঃ উৎপাদন এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসারণ।

GATT দ্বিপাক্ষিকতার পরিবর্তে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য প্রসারণের উপর দৃষ্টি দিতে বলেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন সদস্য দেশের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, কাস্টম ইউনিয়ন, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপনে কোনো বাধা ছিল না।

স্থাপিত হবার পর থেকে GATT-র সদস্যরা বিভিন্ন সভায় একত্রিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯৮৬-র উরুগুয়ে বৈঠক যা কৃষিজ দ্রব্য, বুদ্ধিবৃত্তিগত অধিকার সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল।

৬৫.৩ উরুগুয়ে বৈঠক, ডাঙ্কেল প্রস্তাবনা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত উরুগুয়ে বৈঠক ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুন্টা-ডেল-এস্টেট-এ শুরু হয়েছিল এবং এই বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা জেনেভাতে ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর শেষ হয়েছিল। এই চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা শুধুমাত্র প্রথাগত GATT-র বিষয়গুলি যেমন শুল্ক ও অশুল্ক এবং পরিমাণগত বিধিনিষেধ, ভর্তুকির উপর বিধিনিষেধ GATT-এর নিয়মাবলীর উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

নতুন নতুন বিষয় যেমন বাণিজ্য সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের অধিকার [Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)], বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিসমূহ [Trade Related Investment Measures (TIMES)], পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য, ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল এবং আট বছরের দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মরোক্কর মারাকেশ-এ বহুদেশীয় বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এরই ফলস্বরূপ ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে।

যদিও দেশগুলির মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা প্রথম চারবছরে সমাপ্ত হয়ে গেল। বিভিন্ন বিষয় যেমন কৃষি, বস্ত্রবয়ণ, TRIPS, অ্যান্টি ডাম্পিং ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মত পার্থক্য হবার জন্য এই চুক্তি সাক্ষরিত হতে অনেক সময় লেগেছিল। এই অচলাবস্থা দূর করার তৎকালীন GATT-র মুখ্য পরিচালক আর্থার ডাঙ্কেল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যাকে ডাঙ্কেল প্রস্তাব বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে সেই সময় পর্যন্ত যে সব বিষয়ে দেশগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিল তার পূর্ণ বিবরণ এবং যেসব বিষয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সম্পর্কে নতুন কিছু ধারণা পেশ করা হয়েছিল।

ডাঙ্কেল প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল :

(ক) **বাজারে প্রবেশের নীতি :** ডাঙ্কেল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক বাজারে প্রবেশের অধিকার থাকবে এবং ভারতের মতো দেশ যেখানে দারিদ্র্যের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া সদস্য দেশগুলিকে গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System) উঠিয়ে দিতে হবে।

(খ) **কৃষিজ ক্ষেত্র সংক্রান্ত নীতি :** কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত নীতিতে মূলতঃ এই ক্ষেত্রের উদারীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল যে, কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস করতে হবে। এই প্রস্তাব আন্তঃরাষ্ট্রীয় কৃষিপণ্যের দামের ব্যবধানকে হ্রাস করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ডাঙ্কেল প্রস্তাবে কৃষিক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন সরকার যে সুবিধা দিতে পারবে সে বিষয়ে পরিস্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নীতিসমূহকে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম নীতিসমূহকে বাণিজ্য বিকৃতকারী সহায়ক নীতি (Trade Distorting Support Policy) বলা হয় এবং দ্বিতীয় নীতিসমূহকে বলা হয় Green Box নীতিসমূহ। Green Box নীতিসমূহের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের জন্য নিম্নলিখিত সহায়ক নীতিসমূহকে ধরা হয়ে থাকে

(i) সরকারি সহায়তায় কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়;

(ii) রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যয়;

(iii) পরিকাঠামো প্রসারণের জন্য ব্যয়;

(iv) পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ব্যয়;

(v) খাদ্য সুরক্ষা (food security) সংক্রান্ত ব্যয়;

(vi) পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচীতে সরাসরি অর্থ প্রদান।

ডাঙ্কেল প্রস্তাবে উন্নয়ণশীল দেশগুলির জন্য প্রয়োজনীয় "Green Box" নীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নত দেশগুলি কৃষিক্ষেত্রে যে প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত ভর্তুকি দিয়ে থাকে তার অবসান ঘটিয়ে বাণিজ্যের উদারীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

(গ) বস্ত্রবয়ন শিল্পসংক্রান্ত নীতিসমূহ : ডাঙ্কেল প্রস্তাবে বস্ত্রবয়নে উন্নয়ণশীল দেশগুলির চাপে GATT-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বস্ত্রবয়নকে GATT-র নীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উন্নয়ণশীল দেশসমূহ মূলতঃ ছয় থেকে সাত বছর সময় চেয়েছিল। সে তুলনায় উন্নত দেশসমূহ অন্তর্ভুক্তি ও পরিবর্তনের জন্য পনেরো বছরের উপর সময় চেয়েছিল। GATT চুক্তিতে অবশ্য দশ বছরের সময় দেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে বস্ত্র আমদানির উপর যে বিধিনিষেধ বর্তমান রয়েছে তা উঠিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে TRIPS সংক্রান্ত নীতি : ডাঙ্কেল প্রস্তাবে বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদ (TRIPS) সংক্রান্ত নীতিতে পেটান্ট, কপিরাইট, শিল্প সংক্রান্ত কারিগরী নক্সা, অন্যান্য নক্সা, গোপন তথ্য, ভৌগলিক চিহ্ন, টেডমার্কস ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পেটান্ট সাধারণতঃ আবিষ্কৃত বস্তুর উপর নেওয়া হয়ে থাকে। আবিষ্কারক তার আবিষ্কৃত বস্তুর উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সত্ত্বাধিকারী হয়ে থাকে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুসারে যে দ্রব্য (যেমন বিশেষ কোনো গাছ) থেকে কোনো বস্তু তৈরী হবে। সেই দ্রব্যটিকেই পেটান্টের আওতায় আনা মূলতঃ এইখানে আবিস্কার পদ্ধতির উপর পেটান্টের পরিবর্তে আবিষ্কৃত দ্রব্যের উপাদানের উপর পেটান্ট নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুসারে পেটান্ট সত্ত্ব কুড়ি বছরের জন্য বজায় থাকবে। এছাড়া কপিরাইট, কম্প্যুটার সফ্টওয়ার, ট্রেড মার্কস্ ইত্যাদিকেও পেটান্ট আইনের আওতায় আনতে হবে। কপিরাইট মূলতঃ ৫০ বছরের জন্য বজায় থাকবে। ট্রেডমার্ককে ৯ বছরের জন্য সুরক্ষা দেওয়া হবে। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিষয় একটি বিশেষ সংসদ দেখাশুনা করবে। যেসব দেশে পেটান্ট আইন নেই তাদের আইনী ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য দশ বছর সময় দেওয়া হবে।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগসংক্রান্ত নীতি সমূহ [Trade Related Investment Measures (TRIMS)]

ডাঙ্কেল প্রস্তাবে, উন্নয়ণশীল দেশসমূহ, বিদেশী কোম্পানীর আগমনের উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে তা সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। এই প্রস্তাব অনুসারে বিদেশী মূলধন ও দেশীয় মূলধনকে সম মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দেশীয় বিনিয়োগকারীদের মতো সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া বিদেশী বিনিয়োগের উপর কোনো উর্ধ্বসীমা থাকবে না। তাছাড়া বিনিয়োগকারীরা অবাধে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানি করতে পারবে এবং স্থানীয় দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য তাদের বাধ্য করা যাবে না। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দ্রব্যের এক অংশ রপ্তানি করা সংক্রান্ত শর্ত আরোপ করা যাবে না। এই প্রস্তাব মূলতঃ উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে বহুজাতিক সংস্থার অবাধ প্রবেশকে সুনির্দিষ্ট করবে।

পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য : ডাঙ্কেল প্রস্তাবে পরিষেবা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম চলাচলের পথ উন্মুক্ত হবে এবং যার ফলে উন্নয়ণশীল রাষ্ট্রগুলি বিশেষ সুবিধা পাবে। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের এই ধারাগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরে ১৯৯৪ সালের ১৫ই এপ্রিল ১১০টি রাষ্ট্র একটি চুক্তি সাক্ষর করেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা [World Trade Organisation (WTO)] সৃষ্টি হয়।

৬৫.৪ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল এক বৈষম্যহীন পরিচ্ছন্ন নীতি নির্ভর; বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। এই বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থা স্বচ্ছ এবং অপক্ষপাতমূলক হবে। নতুন ব্যবস্থায় বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র বিশেষভাবে লাভবান হবে। বিভিন্ন রকম পরিমাণগত বিধিনিষেধ যেমন কোটা, আমদানি লাইসেন্স ইত্যাদি উঠিয়ে দিতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি শুধু আমদানি শুল্ক ধার্য করতে পারবে। এই আমদানি শুল্ক পারস্পরিক আলোচনা এবং WTO-এর অনুমতিক্রমে স্থির করা হবে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সবরকমে ভর্তুকি হ্রাস/ তুলে দিতে হবে। এর মধ্যে উন্নত দেশগুলিকে বেশী পরিমাণে ভর্তুকি হ্রাস করতে হবে। যাতে উন্নয়ণশীল দেশগুলি অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করতে পারে।

WTO-র চুক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে এই সংস্থার মূলনীতি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। দুটি বিশেষ পরিচিত নীতি, যেগুলির মাধ্যমে উন্নয়ণশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থ সুরক্ষা হয়ে থাকে, সেগুলি হলো বিশেষ পছন্দ রাষ্ট্র [Most Favoured Nation (MFN)] নীতি এবং জাতীয় পরিচলন নীতি (National Treatment Clause)। প্রথম নীতি অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করা চলবে না। কোনো একটি বিশেষ রাষ্ট্রকে যদি কোনো সুবিধা দেওয়া হয়। তবে WTO-র সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে সেই সুবিধা দিতে হবে। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে আমদানি দ্রব্য এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত দ্রব্যকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। আমদানি শুল্ক ব্যতীত দেশীয় দ্রব্যের উপর যা কর আরোপ করা হয় তার অতিরিক্ত কোনো কর আমদানি দ্রব্যের উপর চাপানো যাবে না। তাছড়া সমগ্র বাণিজ্য ব্যবস্থা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হবে। বিদেশী বিনিয়োগকারী কোম্পানী এবং বিদেশী সরকার অবশ্যই সুনিশ্চিত থাকবে যে কোনো রাষ্ট্র হঠাৎ করে বাণিজ্যের উপর স্বাভাবিক কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করবে না। সর্বশেষে এই নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থা অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে। অনুন্নত দেশগুলিকে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সময় দেওয়া হবে। এক কথায় বলা যায়, এই নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করলে উন্নয়ণশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির মতো সুবিধা লাভ করবে।

WTO-র চুক্তিতে সাক্ষরিত বিষয়গুলিকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— দ্রব্য, পরিষেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়।

প্রথমতঃ GATT চুক্তির পুণর্গঠন করে বিভিন্ন দ্রব্য সংক্রান্ত (যেমন কৃষিজাত এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য) বাণিজ্যের বিষয়গুলি এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় প্রকারের পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়কে যেমন ব্যবসাগত পরিষেবা, পেশাগত কম্প্যুটার সংক্রান্ত, যোগাযোগ, নির্মাণ এবং কারিগরী সহায়তা, বণ্টন, শিক্ষাগত এবং পরিবেশগত সহায়তা, আর্থিক পরিষেবা, যথা ব্যাঙ্ক, বীমা সংক্রান্ত পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভ্রমণ এবং পর্যটন সংক্রান্ত পরিষেবা, সংস্কৃতিগত, বিনোদনমূলক এবং ক্রীড়াসংক্রান্ত পরিষেবা যানবাহন পরিষেবা এবং পরামর্শগত পরিষেবা ইত্যাদিকে General Agreement on Trade in Services (GATS)-এর আওতায় আনা হয়েছিল। পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্যে মূলতঃ সারা বিশ্বে যে সকল প্রকারের পরিষেবা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সবকিছুই ধরা হয়। যেমন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যে পরিষেবা পাঠানো হয়, যেমন দূরভাষণ, অথবা ভোক্তারা বিদেশে যে পরিষেবা ক্রয় করে থাকে যথা পর্যটন অথবা বিদেশী কোনো কোম্পানী যদি দেশে শাখা প্রতিষ্ঠা করে, যেমন বিদেশী ব্যাঙ্ক অথবা দেশীয় নাগরিকরা,বিদেশে পরিষেবা যোগানের চুক্তিতে যে কাজ করে থাকে যেমন আমেরিকাতে সফ্‌টওয়ার উন্নয়ণ পরিষেবায় কর্মরত ভারতীয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের অধিকার ও বাণিজ্যে ও অন্তর্দেশীয় চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলি মূলতঃ Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। GATT এবং GATS ত্রিস্তরীয় কাঠামোতে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলি হলো সাধারণ নীতি (General Principal), বিশেষ বিষয় এবং ক্ষেত্র সংক্রান্ত চুক্তি এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির দায়বদ্ধতা। কিন্তু TRIPs সংক্রান্ত চুক্তি শুধুমাত্র সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এই সাধারণ নীতি অনুসরণ করতে হতো।

GATT চুক্তি ১৩টি চুক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। এই চুক্তিগুলির বিষয়গুলি হলো— শুল্কের মূল্য নির্ধারণ (Customs Valuation), মাল জাহাজে তোলার পূর্বে নিরীক্ষণ (Preshipment Inspection), বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত / কারিগরীগত বাধা [Technical Barriers to Trade (TBT)], বিভিন্ন জৈবিক ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের মাননির্ধারণ [Sanitary or Phyto Sanitary Measures (SPS)], আমদানি লাইসেন্স সংক্রান্ত পদ্ধতি, সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতি (Safe guard) ভর্তুকির সংক্রান্ত বিষয়, অ্যান্টি ডাম্পিং সংক্রান্ত নীতি, বাণিজ্য বিষয়ক বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় (Trade Related Investment Measures), বস্ত্রবয়ন শিল্প সংক্রান্ত নীতি, কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য বিষয়ক নীতি, বস্তুর উৎপত্তিস্থল সংক্রান্ত নীতি (rules of origin) ইত্যাদি।

বস্ত্রবয়ন সংক্রান্ত চুক্তি অনুসারে উন্নত দেশগুলিতে বস্ত্র, পোষাক ইত্যাদির আমদানির উপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা ২০০৫ সালের মধ্যে তুলে নিতে হবে। কৃষি সংক্রান্ত চুক্তি অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস করতে হবে। অ্যান্টি ডাম্পিং সংক্রান্ত নীতি অনুসারে কোনো দেশ যদি রপ্তানি পণ্য, দেশে ঐ দ্রব্যের যা দাম তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করে, বা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বিক্রি করে তবে অ্যান্টি ডাম্পিং সংক্রান্ত নীতি অনুসারে সেই দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রয়োগ করা যাবে।

পরিষেবা সংক্রান্ত চুক্তি অনুসারে (GATS) প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। সদস্য দেশগুলিকে পারস্পরিক বা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন গুণগত মান ইত্যাদি স্থির করতে

হবে। তাছাড়া বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া পরিষেবা যোগানদারদের প্রতিরোধ করার কথাও এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল।

TRIPs চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক দেশ তাদের দেশীয় বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সুফলের অধিকার সত্ত্ব নিজেরা ভোগ করতে পারবে। এই চুক্তিটি বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যোগসূত্রকে পরিষ্কারভাবে স্থাপন করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে পেটান্ট দেওয়া যাবে। সে বিষয়েও নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬৫.৪.১ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিবাদ মীমাংসা সক্রোন্ত পদ্ধতি (Dispute Settlement Mechanism of WTO)

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, সদস্য দেশগুলির ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবাদের মীমাংসা করে থাকে। এই পদ্ধতি পূর্বে GATT-এর গৃহীত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এই ব্যবস্থা, সদস্য দেশগুলি বিবাদের মীমাংসার জন্য WTO-র কাছে আবেদন অথবা নালিশ করতে পারে এবং এই পদ্ধতির ফলে উন্নয়ণশীল দেশগুলির খুবই সুবিধা হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির পক্ষে এই দেশগুলির উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৬৫.৪.২ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বৈঠক

১৯৯৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ১২৮টি সদস্য রাষ্ট্রের একটি বৈঠক সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে পুনরায় মুক্ত বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা [International Labour Organisation (ILO)]-র যে মূল শ্রমমান সংক্রান্ত নীতি আছে তা মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ শ্রমমানের দ্বারা বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টাকে কমানোর কথা বলা হয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি বাণিজ্যকে আরও অবাধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দ্বিতীয় বৈঠক জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯৯৮ সালের মে মাসে এবং এই বৈঠকে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলির সঠিক প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল। এই বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন সুবিধাগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সর্বশেষ বৈঠক ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে পরিবেশ সংক্রান্ত মান এবং শ্রমমানকে বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা উন্নয়ণশীল দেশগুলির বাধাদানের ফলে সম্ভব হয়নি। যার ফলে এই বৈঠক ভেস্তে যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে বর্তমান বিশ্বে প্রায় সর্ব প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল পরিচালক হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কাজ করে থাকে। এই সংস্থা স্বল্প এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে থাকে।

বিশ্ববাণিজ্যের এটি একমাত্র আইনী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় এক সংস্থা। এর নিয়মাবলী কোনো সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষেই অমান্য করা সম্ভব নয়। যার ফলে ক্রমশ এই সংস্থা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিচালকের আসন গ্রহণ করেছে।

৬৫.৫ ভারত ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে ভারতকে এই সংস্থার নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। এই কারণে ১৯৯৫ সালের পর থেকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে উদারীকরণের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া WTO-র অন্যান্য চুক্তিগুলি প্রণয়নের জন্যও ভারত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর পূর্ববর্তী এককে আমরা ভারতের বাণিজ্যনীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করার সময় দেখেছি যে ভারত ক্রমশ বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের শুল্ক ও পরিমাণগত বিধিনিষেধ ক্রমশ হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২৭১৪টি বস্তুর উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এইসব বিধিনিষেধ ক্রমান্বয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যেসব দ্রব্যের উপর বৈদেশিক লেনদেন খাতে ঘাটতির জন্য পরিমাণগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলির মুক্ত আমদানি বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত ৮১২টি দ্রব্যের মধ্যে ৫৭৬টি দ্রব্য মুক্ত সাধারণ লাইসেন্সের অধীনে আমদানি করা সম্ভব হবে।

আমদানি শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। বহুক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নির্ধারিত শুল্ক হারের চেয়ে অনেক কম ছিল। যেমন কৃষিজাত পণ্যের উপর শুল্কের হার ৩৪.৯% ধার্য করা হয়েছিল, যেখানে চুক্তিবদ্ধ হার ছিল ১১৪.৯%। লক্ষ্য করা গেছে যে উন্নত দেশগুলি অনেকক্ষেত্রেই এই শুল্কের হার অত্যধিক বেশী রেখেছে। যার ফলে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক উন্নত দেশগুলির বাণিজ্য বিস্তারে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাসের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত চুক্তি অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশে যদি দ্রব্য নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য সহায়তার মোট পরিমাণ (Aggregate Measurement) সমগ্র কৃষিজাত পণ্যের মোট মূল্যে ১০%-র মধ্যে হয় (উন্নত দেশের জন্য পাঁচ শতাংশ) তবে তাদের ভর্তুকি হ্রাসের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চুক্তি অনুসারে সামগ্রিক সহায়তার পরিমাণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। কোনো দ্রব্যের উৎপাদনে কতটা সহায়তা করা যাবে সে বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট ছিল না। উন্নত দেশগুলি পূর্ণভাবে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে। ১৯৯৭-৯৯ সালে যদি উৎপাদন ভর্তুকি ইত্যাদির ভিত্তিতে হিসাব করা যায়, তবে বিভিন্ন ইউরোপীয়ান দেশ যেমন নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, বিভিন্ন পূর্ব এশিয়ার দেশ যেমন জাপান, কোরিয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার পরিমাণ ছিল ৬০%। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ৯০-এর দশকে কৃষিক্ষেত্রে মোট সহায়তার পরিমাণ ছিল ঋণাত্মক। এই তথ্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত, যার ফলে কৃষিতে ভারতের ভর্তুকি হ্রাসে কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

পরিষেবা সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি অনুসারে ভারতকে ব্যবসা যোগাযোগ, নির্মাণ কার্য, আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিষেবা, পর্যটন পরিষেবা, ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা পালন করতে হবে। ভারতবর্ষ এখনও পর্যন্ত শিক্ষা, পরিবেশ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন করেননি। ভারতকে মূলতঃ ৩৩টি

পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপে বিধিনিষেধ হ্রাস করেছে। এছাড়া ভারত আরও ৪৩টি দেশের সঙ্গে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত-চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই চুক্তির মধ্যে আছে কম্প্যুটার, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সেমিকন্ডাক্টর এবং উপাদান, সফ্‌টওয়ার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতকে ২০০৫ সালের মধ্যে ২১৭টি যুক্তি সংক্রান্ত বস্তুর উপর থেকে শুল্ক হ্রাস করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ আছে। এই কারণে বাণিজ্য নীতিগুলিতেও বিভিন্ন পরিষেবা যেমন হিসাব পদ্ধতি, নির্মাণ ও স্থাপত্য ও কারিগরী সংক্রান্ত পরামর্শ, যন্ত্রপাতির হিসাব পদ্ধতি, নির্মাণ ও স্থাপত্য ও কারিগরী সংক্রান্ত পরামর্শ, যন্ত্রপাতির সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা, মুদ্রণ এবং প্রকাশনা, বীমা পরিষেবা, বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রপ্তানি সুযোগ সুবিধা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ এরই মধ্যে সফ্‌টওয়ার উন্নয়ণ সংক্রান্ত বাজারের একটি বৃহৎ অংশ দখল করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের বাজারে এই ক্ষেত্রে ভারতের অংশ ১৯৯১ সালে ১২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৯% গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

TRIPS চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তিগুলির মধ্যে এই চুক্তিটিই সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত চুক্তি বলে মনে করা যায়। এই চুক্তির মূল বক্তব্য ছিল দ্রব্যটির উপর পেটান্ট নিতে হবে, দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নয়। যার ফলে ভারতবর্ষকে ১৯৭০ সালের পেটান্ট আইনকে পরিবর্তন করতে হবে, এবং ভারতকে পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতির উপর পেটান্ট নেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল তা পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া কপিরাইট আইনকে সুদৃঢ় করতে হবে। ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জৈবিক এবং উদ্ভিদজাত দ্রব্যকে সম্পূর্ণভাবে সনাক্তকরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ঔষধ ও কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে পণ্যের উপর পেটান্ট ব্যবস্থা চালু করার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, 'Exclusive Marketing Rights (EMR) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আশা করা যায় পেটান্ট আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থাগুলি সুবিধা অর্জন করতে পারে।

৬৫.৬ সারাংশ

এই এককে আপনারা জানলেন যে ১৯৯৫ সালের পর থেকে বিশ্ববাণিজ্যে "বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা' পরিচালকের আসন গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

- ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থার মূল পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
- এই সংস্থার নিয়মাবলী ও গঠনতন্ত্র পূর্ববর্তী GATT চুক্তি অপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হলে চুক্তির ধারাগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

- এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পণ্য চলাচলের গতিকেই পরিচালন করেনা। এই ব্যবস্থার অধীনে পরিষেবা, বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পদ ইত্যাদির বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- ভারত এই সংস্থার সদস্য হিসেবে সাম্প্রতিককালে নিজের আর্থিক কাঠামোতে বিভিন্ন পরিবর্তন নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

৬৫.৭ অনুশীলনী

১। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গঠনতন্ত্র ও এর অধীনস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করুন।
২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।
৩। ভারত ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

৬৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Dhar, P. K. (1999), Indian Economy — Its Growing Dimensions, Kalyani Publishers.
২। Srinivasan, T. N. (2000), Eight Lectures on Indian Economic Reform. Oxford University Press.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata-700 020
and Printed at : SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006